অতল জলের দিকে

অতল জলের দিকে

প্রফুল্ল রায়

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০০৭৩

ATAL JALER DIKE

A Bengali Novel by Prafulla Roy

Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street Calcutta 700073
Rs 50/-

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

দাম : ৫০ টাকা

ISBN 81-7612-011 1

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩
বর্ণ-সংস্থাপনা : লেজার অ্যান্ড গ্রাফিকস
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০০৬
মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩

রত্না চক্রবর্তী

বিপ্লব চক্রবর্তী

স্নেহাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য বই

মন্দ মেয়ের উপাখ্যান
উত্তরার উপাখ্যান
আলোছায়াময়
দায়দায়িত্ব
হৃদয়ের ঘ্রাণ
বিন্দুমাত্র
আলোয় ফেরা
অন্ধকারে ফুলের গন্ধ
মানুষের জন্য
আকাশের নীচে মানুষ
দায়বদ্ধ
শ্রেষ্ঠ গল্প
চতুর্দিক
আমাকে দেখুন
(১ম ২য় ৩য় ৪র্থ পর্ব)
আমাকে দেখুন অখণ্ড সংস্করণ
রামচবিত্র
ধর্মান্তর
সত্যমিথ্যা
মাটি আর নেই
মোহানার দিকে
নোনা জল মিঠে মাটি
বাঘবন্দী
স্বর্গের ছবি
দুই দিগন্ত
মানুষের মহিমা
সম্পর্ক
জন্মভূমি
শীর্ষবিন্দু
সুখের পাখি অনেক দূরে
রৌদ্রঝলক
আক্রমণ
শঙ্খিনী
আমার নাম বকুল
নয়না
নিজের সঙ্গে দেখা
এক নাযিকাব উপাখ্যান
পূর্বপার্বতী
মহাযুদ্ধের ঘোড়া
(১ম ২য় পর্ব)
একাকী অরণ্যে
সিন্ধুপারের পাখি
যুদ্ধযাত্রা
স্বনির্বাচিত গল্প
শান্তিপর্ব
সাধ আহ্লাদ
হীরের টুকরো
তিন মূর্তির কীর্তি
সেনাপতি নিরুদ্দেশ
পাগল মামার চার ছেলে
অনুপ্রবেশ
রাবণ বধ পালা

অতল জলের দিকে

।। এক ।।

নরিম্যান পয়েন্টের এই আটাশ-তলা বাড়িটার নাম 'হরাইজন'। এর টপ ফ্লোরে প্রণবেশ মজুমদারের চার হাজার স্কোয়ার ফুটের অফিস 'ম্যাজিক ক্রিয়েশান'। পুরো অফিসটা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত, তার তিনদিক কাচ দিয়ে ঘেরা, মেঝেতে চার ইঞ্চি পুরু দামী পার্সিয়ান কার্পেট। ভেতরে কাচের দেওয়াল তুলে অগুনতি চেম্বার। সেগুলো দুর্লভ অর্কিড, ব্রোঞ্জ এবং পাথরের তৈরি ভারতীয় ফোক-আর্টের নানা মডেল আর সুদৃশ্য মুরাল দিয়ে সাজানো। চেয়ার, টেবল, সোফা, অন্যান্য ক্যাবিনেট এবং পর্দা—সব কিছু মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো। এমনিতে বেশির ভাগ অফিসই রসকষহীন, কাঠখোট্টা টাইপের। এখানে অর্থাৎ 'ম্যাজিক ক্রিয়েশান'-এ সুরুচির সঙ্গে শিল্পকে চমৎকার মেশানো হয়েছে।

এই অফিস থেকে পেছনে তাকালে ব্যাক বে রিক্লামেশনে বিরাট বিরাট হাই-রাইজের ছড়াছড়ি। আকাশের গায়ে বিচিত্র সব জ্যামিতিক নক্‌শা তৈরি করে তারা দাঁড়িয়ে আছে। ডানদিকে কোণাকুণি কুপারেজ, ওভাল আর আজাদ ময়দান ছাড়িয়ে দূর সঞ্চার নিগমের বত্রিশতলা বিল্ডিং। তারপর বম্বে ইউনিভার্সিটির উঁচু টাওয়ার। আরও দূরে ব্রিটিশ আমলে তৈরি ভিক্টোরিয়া টারমিনাস যার স্থাপত্য এবং বিশালতা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

প্রণবেশের অফিসের সামনের দিকে তাকালে মেরিন ড্রাইভ—যার পৃথিবী জুড়ে খ্যাতি। আধখানা বৃত্তের আকারে সেটা চৌপট্টি আর মেরিন লাইনসের ভেতর দিয়ে মালাবার হিলসের দিকে চলে গেছে। এর একধারে একই মাপের একই উচ্চতার পরমাশ্চর্য সব বিল্ডিং। সেগুলোর পেছনে ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়াম, চার্চ গেট স্টেশন, ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম পেরিয়ে চমকে দেবার মতো একটা ফ্লাই-ওভার। মেরিন ড্রাইভের আরেক ধারে, ঠিক মুখোমুখি আরব সাগর—একেবারে ধু ধু দিগন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে।

আগস্ট মাস শেষ হয়ে এল। জুনের গোড়ার দিকে এখানে মনসুন শুরু হয়েছিল। পাক্কা দুটো মাস একটানা ঝরার পর বম্বের ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি ক'দিন হল বন্ধ হয়েছে। ছিটেফোঁটা মেঘও এখন আর চোখে পড়ে না। আকাশ এত পরিষ্কার, এত ঝকঝকে,

মনে হয় তার নীল রঙের ওপর কেউ যেন বার্নিশ লাগিয়ে দিয়েছে।

এখন আটটার মতো বাজে। বম্বেতে সন্ধে নামে অনেক দেরি করে। ঘণ্টাখানেক আগে সূর্যাস্ত হলেও দিনের শেষ একটু আভা আকাশের গায়ে আবছাভাবে লেগে আছে।

'ম্যাজিক ক্রিয়েশান'-এ নিজের চেম্বারে প্রকাণ্ড গ্লাস-টপ টেবলের ওপর ঝুঁকে খুব মগ্ন হয়ে একটা আটচল্লিশতলা হাই-রাইজের নক্‌শা আঁকছিলেন প্রণবেশ। টেবলটার একধারে রয়েছে আঁকার নানা রকম সরঞ্জাম, কয়েকটা রাইটিং প্যাড, পেন স্ট্যান্ডে সাত-আটটা কলম, ডট পেন। এ ছাড়া সবুজ, মেরুন এবং ধবধবে সাদা রঙের তিনটে টেলিফোন।

প্রণবেশের বয়স পঞ্চান্ন ছাপান্ন। ছ ফুটের কাছাকাছি হাইট। গায়ের রং বাদামি। এই বয়সেও ত্বক বেশ মসৃণ। লম্বাটে মুখ তাঁর, নিখুঁত কামানো গাল। ব্যাকব্রাশ-করা চুলের বেশির ভাগটাই কালো, ফাঁকে ফাঁকে কিছু রুপোর তার। চেহারা এখনও টান টান, শরীরে অনাবশ্যক মেদ জমতে দেননি তিনি। চোখেমুখে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আশ্চর্য এক স্বপ্নময়তা মাখানো। পরনে কালো ট্রাউজারের ওপর হালকা ক্রিম কালারের বুশ শার্ট।

প্রণবেশ একজন দুর্ধর্ষ আর্কিটেক্ট। সারা দেশ জুড়ে তাঁর খ্যাতি। তাঁর চেম্বারটা ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যাবে দেওয়ালগুলোতে চোখ-বাঁধানো অগুনতি হাই-রাইজ আর ছ' সাতটা স্টেডিয়ামের রঙিন ছবি ভেলভেটের বোর্ডে পিন দিয়ে সাঁটা রয়েছে। প্রণবেশের নক্‌শা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী ওগুলো তৈরি করা হয়েছে। এইসব বাড়ি বম্বে দিল্লি কলকাতা মাদ্রাজ বা বাঙ্গালোরের স্কাইলাইন পালটে দিয়েছে। ভারতবর্ষের বাইরেও, যেমন কুয়ালালামপুর, দুবাই, ম্যানিলা, সিঙ্গাপুর অর্থাৎ ফার-ইস্ট আর মিডল-ইস্টের অজস্র অফিস বিল্ডিং এবং হাউসিং কমপ্লেক্সের ডিজাইনও তিনি করে দিয়েছেন। আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে রুচি আর কল্পনা মিশিয়ে যে সব বাড়ির নক্‌শা প্রণবেশ এখন পর্যন্ত করেছেন সেগুলোর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। স্থাপত্য সম্পর্কে পুরনো ধ্যানধারণা আগাগোড়া বদলে দিয়েছেন। অন্তত সাত আট বার 'আর্কিটেক্ট অফ দা ইয়ার' হয়েছেন। তা ছাড়া দেশ বিদেশের আরও কত সম্মান যে পেয়েছেন তাঁর নিজেরই মনে নেই। দক্ষিণ ভারতের একটা ইউনিভার্সিটি তাঁকে অনারারি ডক্টরেটও দিয়েছে। গৌহাটি থেকে গান্ধীনগর, লখনৌ থেকে তিরুবন্তপুরম পর্যন্ত অসংখ্য বড় বড় বিজনেস হাউস, গভর্নমেন্টের নানা দপ্তর বা রিয়েল এস্টেটের প্রোমোটাররা তাঁর ডিজাইনের জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করে থাকে।

সাড়ে পাঁচটায় অফিস ছুটি হওয়ার কথা। কিন্তু কাজের চাপ এত বেশি যে ন'টা

সাড়ে ন'টার আগে কোনওদিন এখান থেকে বেরুতে পারেন না প্রণবেশ। শুধু তিনিই নন, এই মুহূর্তে অন্য চেম্বারগুলোতে আরও দশজন আর্কিটেক্ট এবং পনের জন ড্রাফটসম্যান ঘাড় গুঁজে নানারকম নক্‌শা তৈরি করে চলেছে। প্রণবেশ তাঁর সহকর্মীদের মাসের শেষে যে পে-প্যাকেট দেন তাতে ন'টা সাড়ে ন'টা কেন, তেমন দরকার হলে সারা রাত তারা অফিসে থেকে যাবে।

সাড়ে তিনশ ফুট নিচে মেরিন ড্রাইভে এখন আজস্র আলো জ্বলে উঠেছে। মনে হয় লক্ষ কোটি হীরের দ্যুতি ঝলকে যাচ্ছে। রাতের অর্ধ বৃত্তাকার মেরিন ড্রাইভকে ব্রিটিশ আমলে বলা হতো 'কুইনস নেকলেস।' স্বাধীন ভারতেও তাই বলা হয়। এর চেয়ে যোগ্য উপমা আর হয় না। শুধু কি এই অঞ্চলটা ; দূরে চৌপট্টি, মেরিন লাইনস এবং মালাবার হিলস পর্যন্ত আলো আর আলো। উঁচু উঁচু বাড়ির মাথায় নানা রঙের বিশাল বিশাল নিওন সাইন জ্বলছে। রাতের বম্বে যেন পরমাশ্চর্য কোনও যাদুনগরী।

নিচে যত দূরে চোখ যায় গাড়ির স্রোত বয়ে চলেছে। সদাব্যস্ত এই শহর কখনও থেমে থাকে না, ঊর্ধ্বশ্বাসে দিনরাত সর্বক্ষণ ছুটেই চলেছে। দুরন্ত বেগবান এই জনপদে গতিই হচ্ছে শেষ কথা।

গাড়িটাড়ি ছাড়াও ফুটপাথে এখনও অজস্র মানুষ। মেরিন ড্রাইভের আলো গিয়ে পড়েছে অ্যারাবিয়ান সি'তে। ওখানে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে সাগর-পাখিরা। তারা তক্কে তক্কে আছে, সুযোগ পেলেই ছোঁ মেরে জল থেকে বাঁকানো ঠোঁটে মাছ গেঁথে উঠে আসছে।

কিন্তু কোনও দিকেই লক্ষ্য নেই প্রণবেশের। তাঁর হাত দ্রুত নানা ধরনের লাইন টেনে টেনে একটা বাড়ির চেহারা ফুটিয়ে তুলছে। জুহুতে ফরেন কোলাবরেশনে দেশের সবচেয়ে বড় হোটেল কমপ্লেক্স তৈরি হবে। এটা তারই নক্‌শা। দু-তিন দিনের ভেতর নক্‌শাটা শেষ করে ড্রাফটসম্যানদের হাতে তুলে দিতে হবে। সেটা থেকে ডিটেলে পুরো বাড়িটার ছবি অর্থাৎ কোন ফ্লোরে কত ঘর, স্যুইট, ক'টা ব্যাঙ্কোয়েট হল বা কনফারেন্স রুম থাকবে ; কোথায় থাকবে রেস্তোরাঁ, বার, কফি-শপ, বল-রুম, বেসমেন্টের চারটে ফ্লোরে কীভাবে কার পার্কিংয়ের বন্দোবস্ত করা হবে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগুন নেভানোর জন্য কী কী ব্যবস্থা থাকবে ইত্যাদি আঁকতে এবং ফাইবার গ্লাসে বাড়িটার মডেল তৈরি করতে ড্রাফটসম্যানদের কম করে মাস দুই লেগে যাবে। কিন্তু ক্লায়েন্ট চাপ দিচ্ছে সেপ্টেম্বরের পনের তারিখের ভেতর ড্রাফট প্ল্যানটা চাই। আজ আগস্টের একুশ তারিখ। এ মাস শেষ হতে ন'দিন বাকি। তার সঙ্গে পরের মাসের পনের দিন। সব মিলিয়ে একমাসেরও কম সময়ে এত কাজ শেষ করা অসম্ভব। ক্লায়েন্টকে নভেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে

বলবেন প্রণবেশ। যেমন তেমন করে কাজ করা তাঁর খুবই অপছন্দ। তা ছাড়া এর সঙ্গে তাঁর সুনামও জড়িয়ে আছে। ইন্ডিয়ার টপমোস্ট হোটেল কমপ্লেক্স তাঁর মডেল অনুযায়ী হতে চলেছে। সমস্ত দিক থেকে সেটাকে নিখুঁত করে তুলতে হবে, কেন-না দেশ-বিদেশের নানা মানুষ আসবেন এখানে—তাঁদের কেউ রাজনীতিবিদ, কেউ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, কেউ বিজনেসম্যান, কেউ কেউ বা বড় বড় কোম্পানির চেয়ারম্যান কিংবা ডিরেক্টর। আজকাল উদার অর্থনীতির কারণে কানাডা আমেরিকা ইংল্যান্ড কি জাপান থেকে রোজ গণ্ডা গণ্ডা ট্রেড ডেলিগেশন এসে হাজির হচ্ছে। হোটেলটা যদি তাঁদের ভাল লাগে সারা পৃথিবীতে প্রণবেশের নাম ছড়িয়ে যাবে। এটাই হবে তাঁর কাজের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন। ক্লায়েন্টের কাছে সময় চাইলে তারা খুশি হবে না কিন্তু এ ছাড়া কিছুই করার নেই প্রণবেশের।

ডানপাশের কাচের দরজায় হালকা আওয়াজ হতে টেবল থেকে মুখ তুলে তাকালেন প্রণবেশ। একটা ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে সুরেশ। সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় কোনও পদ্ধতিতে তাঁর চোখ চলে যায় বাঁ পাশেব ওয়াল ক্লকটার দিকে, এখন কাঁটায় কাঁটায় আটটা।

সুরেশের বয়স একুশ বাইশ। সে এই অফিসের বেয়ারা, কাজকর্মে তুখোড় এবং দারুণ চটপটে। তার মধ্যে কম্পিউটারের মতো এক ধরনের দক্ষতা আছে। সে জানে প্রণবেশ দশটায় অফিসে চলে আসেন, তারপর দু'ঘণ্টা পর পব অর্থাৎ বেলা বারোটা, দুটো, চারটে, ছ'টা এবং আটটায় তাঁর ব্ল্যাক কফি চাই। সুরেশকে ডাকতে হয় না। ঠিক সময়ে সে কফি নিয়ে প্রণবেশের চেম্বারে চলে আসে। এক মিনিটও তার এদিক ওদিক হয় না।

সুরেশ নিঃশব্দে টেবলেব একধারে ট্রে নামিয়ে রেখে চলে যায়। শুধু কফিই না, ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট আর পোর্সিলিনের গোল বাটিতে কয়েক টুকরো চিজও এনেছে সে। ক্রিম ক্র্যাকারেব সঙ্গে চিজ না হলে প্রণবেশের মনে হয় শুকনো কাঠ চিবোচ্ছেন।

হাতের স্কেচ পেন্সিলটা নামিয়ে রেখে সবে ট্রে থেকে কফির কাপটা তুলতে যাচ্ছেন প্রণবেশ, সেইসময় সবুজ বঙের টেলিফোনটা বেজে ওঠে। সেটা তুলে 'হ্যালো' বলতেই অন্য প্রান্ত থেকে কোনও মহিলার চাপা, আড়ষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আমি প্রণবেশ মজুমদারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

বম্বেতে একমাত্র মামাতো বোন রিনি ছাড়া আর কোনও আত্মীয়স্বজন নেই প্রণবেশের। তবে কুড়িটা বছর এই শহরে থাকার কারণে প্রচুর বাঙালি অবাঙালি অফিসার এবং তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে তাঁর। তা ছাড়া কাজের সূত্রে

বিভিন্ন কোম্পানি আর এজেন্সির রিসেপশানিস্ট, টেলিফোন অপারেটর থেকে টপ মহিলা একজিকিউটিভ, ডিরেক্টর বা চেয়ারম্যান পর্যন্ত অসংখ্য তরুণী এবং মধ্যবয়সিনীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কারণে অকারণে, অনেক সময় নেহাত গল্প করার জন্য এঁরা ফোন করে থাকেন। প্রণবেশের স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর। এঁদের সবার গলা তাঁর চেনা। কিন্তু যিনি এখন ফোন করেছেন তাঁর কণ্ঠস্বর আগে কখনও শুনেছেন কিনা মনে করতে পারলেন না। কিশোরী বা তরুণীদের গলায় সতেজ সুরেলা একটা ঝংকার থাকে। এটা সেরকম নয়, নিশ্চয়ই মধ্যবয়সিনী কেউ হবেন।

মহিলা ইংরেজিতে বলেছেন। তাই প্রণবেশ ইংরেজিতে উত্তর দিলেন, 'আমিই প্রণবেশ। আপনি কে বলেছেন?'

ওধার থেকে সাড়া পাওয়া গেল না।

বেশ অবাকই হলেন প্রণবেশ। এখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান বলতে টেবলের ওপর মাল্টিস্টোরিড হোটেল কমপ্লেক্সের নক্‌শাটা। নষ্ট করার মতো পর্যাপ্ত সময় তাঁর হাতে নেই। একবার মনে হল ফোনটা নামিয়ে রাখেন, পরক্ষণে ভাবেন সেটা ঠিক হবে না। হয়তো মহিলা জরুরি কোনও খবর দিতে চান কিংবা তাঁর অন্য কিছু প্রয়োজনও থাকতে পারে।

প্রণবেশ স্থির করলেন, আরেক বার চেষ্টা করবেন। তারপরও সাড়া না পেলে মহিলার চিন্তাটা মাথা থেকে বার করে দিতে হবে। বললেন, 'হ্যালো, লাইনটা কি কেটে গেল?'

ওধার থেকে অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এল। কিন্তু মহিলা কী বললেন বোঝা গেল না।

প্রণবেশ বিরক্ত হলেন। তবু নিজেকে যতটা সম্ভব সংযত রেখে বলেন, 'এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন কেন? কে আপনি? আমি ভীষণ ব্যস্ত, যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর গলা থেকে খানিকটা ঝাঁঝ বেরিয়ে আসে।

মহিলা এবার বাংলায় বললেন, 'আমি—আমি অনু—' তাঁর কণ্ঠস্বর এখন আরও চাপা, মনে হয় খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

বন্ধুপত্নী এবং অন্যান্য পরিচিতাদের মধ্যে অনু নামের কেউ আছে কিনা মনে পড়ল না। এই মহিলা পদবিসুদ্ধ পুরো নামটা না বলে শুধু ডাক-নামটাই জানিয়েছেন। এই নামে কখনও কাউকে চিনতেন কি প্রণবেশ? একটু কৌতূহলই বোধ করেন তিনি। বলেন, 'কোন অনু?'

'অনুরাধা— ভবানীপুর, হরিশ মুখার্জি রোডের—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যান মহিলা।

মুহূর্তে হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ খেলে যায় প্রণবেশের। কত—কত কাল পর, বুঝিবা ঝাপসা হয়ে আসা কোনও পূর্বজন্মের ওপার থেকে অনুরাধার কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছে। যার সঙ্গে কুড়ি বছর আগে চিরকালের মতো সব সম্পর্ক চুকে বুকে গেছে সে যে কোনওদিন তাঁকে ফোন করবে, কে ভাবতে পেরেছিল। নইলে অনু নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিতে কিছুটা ঝংকার ওঠার কথা। অবশ্য অনুরাধার চাপা, শিথিল এবং নার্ভাস গলার স্বরও সঠিকভাবে বুঝতে দেয়নি ফোনটা কে করেছে। তা ছাড়া নতুন হোটেল কমপ্লেক্সের নক্‌শাটা তাঁর মাথার এমন ফিক্সেশানের মতো আটকে আছে যে অন্য কোনও দিকে সেভাবে লক্ষ্য ছিল না।

পঞ্চান্ন বছর বয়সে আবেগের সব প্রস্রবণই নাকি শুকিয়ে যায়। অনুরাধার জন্য যা তাঁর মধ্যে থাকার কথা তা হল প্রবল বিতৃষ্ণা। একদিন দু'জনেই তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন জীবনে কেউ কারও মুখ দেখবেন না। অথচ আজ অনুরাধার জন্য, ঠিক বোঝানো যায় না—আশ্চর্য এক আকুলতা বোধ করতে থাকেন প্রণবেশ। টের পান বুকের ভেতর এলোপাথাড়ি ঢাকের বাজনার মতো কিছু একটা ঘটে চলেছে। আলোড়ন খানিকটা থিতিয়ে এলে বললেন, 'তুমি কি বম্বে এসেছ?'

অনুরাধা আগের স্বরেই বললেন, 'না, কলকাতা থেকে ফোন করছি।'

'এখানকার ফোন নাম্বার কোথায় পেলে?'

'তোমাদের কলকাতার বাড়িতে ফোন করে কেয়ারটেকারের কাছ থেকে জেনে নিয়েছি।'

রীতিমত অবাকই হলেন প্রণবেশ। বলেন, 'কলকাতার ফোন নাম্বার তোমার মনে ছিল?'

অনুরাধা বলেন, 'একসময় দশটা বছর ও বাড়িতে কাটিয়েছি। নাম্বারটা ভুলি কী করে?'

একটু চুপচাপ।

এত বছর বাদে অনুরাধা বম্বের ফোন নাম্বার জোগাড় করে কেন যোগাযোগ করলো বোঝা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটে থাকবে যাতে তাঁকে খুবই প্রয়োজন কিন্তু সরাসরি তা জিজ্ঞেস করা যায় না। প্রণবেশ শুধু বলেন, 'তোমরা কেমন আছ অনু?'

অনুরাধা আবছা গলায় বললেন, 'চলে যাচ্ছে।'

'রুমি?'

'এমনিতে ভাল আছে।'

'কী পড়ছে এখন?'

'মডার্ন হিস্ট্রি নিয়ে এম. এ। এক বছর ফাইনাল পরীক্ষাটা ড্রপ করেছে।'

রুমির কথা বলতেই অনুরাধার কণ্ঠস্বরে যে পরিবর্তন ঘটেছে এবং তাতে এক ধরনের চাপা উদ্বেগ যে মাখানো সেটা লক্ষ করেননি প্রণবেশ। রুমি তাঁর আর অনুরাধার একমাত্র সন্তান। তাঁর মেয়ে এম. এ পড়ছে, ভাবতেও অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করেন তিনি। বলেন, 'অনেক বড় হয়ে গেছে—না?'

অনুরাধা বলেন, 'হওয়ারই তো কথা। সময় বসে থাকে না।'

একটু ভেবে প্রণবেশ জিজ্ঞেস করেন, 'মা—মানে তোমার মা কেমন আছেন?' একসময় অনুরাধার মাকে মা বলতেন তিনি। পুরনো সম্পর্কের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই, তাই দ্রুত শুধরে নিয়ে বললেন, 'তোমার মা।'

অনুরাধা বললেন, 'মা নেই। সাত বছর আগে ক্যান্সারে মারা গেছে।'

ভেতরে ভেতরে সামান্য একটু ধাক্কা লাগে প্রণবেশের। বলেন, 'ও, জানতাম না।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করেন, 'আর তোমার দাদা?'

'দাদাও নেই। বছর চারেক আগে বাড়ির কাছে একটা বাস অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। দাদার মাথার ওপর দিয়ে চাকা চলে যায়। ইনস্ট্যান্ট ডেথ।'

প্রণবেশ এবার চমকে ওঠেন। রুমিকে বাদ দিলে মা এবং দাদা ছাড়া আর কেউ নেই অনুরাধার, অন্তত কুড়ি বছর আগে ছিল না। আবছাভাবে তিনি শুনেছেন, আলিপুব কোর্ট থেকে তাঁর সঙ্গে অনুরাধার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়াব পর ওর দাদা আর মা ওকে আর রুমিকে দশ হাতে আগলে রেখেছেন। ওর দাদা অবনীশ তো বোনের জন্য শেষ পর্যন্ত বিয়েও করেননি।

মা এবং দাদাব শোচনীয় মৃত্যু নিশ্চয়ই অনেকখানি ক্ষতি করে দিয়েছে অনুরাধার, মাথার ওপর থেকে আচমকা ছাদ ধসে পড়লে যেমন হয় অনেকটা সেইরকম। কিন্তু তারপরও তো অনেক সময় পার হয়ে গেছে। শোকের বিহ্বলতা এতদিনে কাটিয়ে ওঠার কথা।

হঠাৎ প্রণবেশের মনে হল, দাদার মৃত্যুর পর অনুরাধা আর্থিক কোনও সমস্যায় পড়েছেন কি? সেই কারণে এত বছর বাদে ফোন করেছেন? পরক্ষণে মনে পড়ল, ডিভোর্সের পর মাসে মাসে অনুরাধা এবং রুমিকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা দিতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীটি অত্যন্ত শক্ত মেরুদণ্ডের অধিকারিণী, প্রচণ্ড আত্মসম্মান বোধ অনুরাধার। যে স্বামীর সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্কই থাকছে না তাঁর সাহায্য নিয়ে জীবন ধারণ করার কথা তিনি ভাবতে পারেন না। এর চেয়ে গ্লানিকর আর কিছু হয় না।

প্রণবেশ তা সত্ত্বেও কয়েক বার মানি অর্ডারে টাকা পাঠিয়েছিলেন, প্রতি বারই

সেই টাকা ফেরত এসেছে।

টাকার জন্য নিশ্চয়ই ফোন করেননি অনুরাধা। তা হলে? প্রণবেশ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই অনুরাধার গলা ভেসে আসে, 'কয়েক দিনের জন্যে তুমি কি কলকাতায় আসতে পারো?'

এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না প্রণবেশ। তিনি হকচকিয়ে যান। বিমূঢ়ের মতো বলেন, 'কলকাতায়!'

'হ্যাঁ।'

'কেন বল তো?'

অনুরাধা বলেন, 'আমি ভীষণ বিপন্ন—' তিনি যে অত্যন্ত ভীত এবং উৎকণ্ঠিত, এবার স্পষ্ট বোঝা যায়।

প্রণবেশ টান টান হয়ে বসেন। টেলিফোনের মাউথপিসে মুখটা প্রায় ঠেকিয়ে রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করেন, 'কী হয়েছে অনু?'

'রুমি কিছুদিন হল কতগুলো ছেলের সঙ্গে মিশছে, যারা খুব নোটোরিয়াস। এমন কোনও বাজে, নোংরা কাজ নেই যা ওরা পারে না। এই করে একটা বছর নষ্ট করল। আগে ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস থাকলে সন্ধে সাতটার ভেতর বাড়ি ফিরে আসত। তারপর দশটা সাড়ে দশটা হতে লাগল। সেদিন এল রাত একটায়। কী যে করব, ভেবে উঠতে পারছি না।' অনুরাধার গলা কাঁপতে থাকে।

প্রণবেশ বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'রুমি বড় হয়েছে। নিজের ভালমন্দ বোঝার, নিজেকে প্রোটেক্ট করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে।'

'না—একেবারেই নেই। যেমন একগুঁয়ে তেমনি ইমপালসিভ। ওর কোনও কাজে বাধা দিলে সমানে চিৎকার করতে থাকে। সব সময় মাথায় যেন হিস্টিরিয়া চেপে আছে। তুমি কালকের কোনও ফ্লাইট ধরে চলে এসো।'

'কিন্তু—'

'কী?'

প্রণবেশ একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'এখানে আমার মারাত্মক কাজের প্রেসার চলছে। আর্জেন্ট অনেকগুলো ডিজাইন কয়েকদিনের ভেতর করে দিতে হবে। কাল কী করে যাই?'

অনুরাধা ব্যাকুলভাবে বলেন, 'রুমির প্রবলেমটা অনেক বেশি আর্জেন্ট। ও শুধু আমারই নয়, তোমারও মেয়ে।'

কথাগুলো ভেতরে ভেতরে ঝাঁকুনি দিয়ে যায় প্রণবেশকে। জন্মদাতা হিসেবে রুমির প্রতি তাঁর যে কর্তব্য রয়েছে সেটা মনে করিয়ে দিয়েছেন অনুরাধা। অথচ

একদিন স্বেচ্ছায় তা পালন করতেই চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অনুরাধা মেয়ের সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক রাখতে দেননি। সেই সব পুরনো তিক্ততার কথা তুলে উৎকণ্ঠিত এক মহিলাকে বিব্রত করতে চাইলেন না প্রণবেশ। রুমিকে তিনি শেষবার দেখেছিলেন যখন তার বয়স মাত্র পাঁচ। তার মুখটা স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে গেছে। তবু তাঁর রক্ত নিঃশব্দে যে মেয়েটির শরীরে বয়ে চলেছে তার প্রতি অনিবার্য এক টান অনুভব করতে থাকেন। কিন্তু অনুরাধাকে তিনি যা বলেছেন তার একটি শব্দও মিথ্যে নয়। যে হোটেল কমপ্লেক্সের অর্ধসমাপ্ত স্কেচ তাঁর টেবলে পড়ে আছে সেটা শেষ করেই বাঙ্গালোরের একটা মাল্টি-স্টোরিড সুপার মার্কেট, পুনের একটা ইনডোর স্টেডিয়াম আর নাগপুরের একটা বড় কোম্পানির হেড অফিস বিল্ডিংয়ের নক্‌শায় হাত দিতে হবে। এই কাজগুলোও ভীষণ জরুরি। নভেম্বরেব দশ বারো তারিখের ভেতর সব কমপ্লিট করে ফেলতে হবে।

প্রণবেশ বললেন, 'নিশ্চয়ই আমার মেয়ে। বিশ্বাস কর, সম্ভব হলে কালই কলকাতায় চলে যেতাম। কিন্তু—'

অনুরাধা বলেন, 'তুমি তো প্রতি বছর নভেম্বরে কলকাতায় এসে দু'মাস থেকে যাও। এবার না হয় রুমির জন্য ক'দিন আগেই এলে।'

প্রণবেশ চমকে ওঠেন। ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতেও তাঁর কাজের প্রচুর চাহিদা। সেই কারণে নভেম্বরের মাঝামাঝি কলকাতায় এসে জানুয়ারির শেষাশেষি অর্থাৎ দু'মাসেরও বেশি থেকে ওখানকার কাজগুলো শেষ করে যান। কলকাতায়, কেয়াতলাব বাড়িতে তাঁর মাঝারি মাপের একটা অফিস রয়েছে। অবশ্য বছরের দশ মাস সেটা বন্ধ থাকে, তিনি এলে খোলা হয়। রীতিমত অবাক হয়েই প্রণবেশ জিজ্ঞেস করেন, 'আমি যে কলকাতায় আসি তুমি জানলে কী করে?'

অনুরাধা বলেন, 'শুনেছি।'

প্রণবেশ ভাবতে চেষ্টা করলেন, তবে কি এত বছর ধরে গোপনে তাঁর সব খবরই রেখে আসছেন অনুরাধা? কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, তার আগেই টেলিফোনের ওধার থেকে অনুরাধার গলা ফের ভেসে আসে, 'কুড়ি বছর আমরা আলাদা হয়ে গেছি। আগে কখনও তোমার কাছে কিছু চাইনি। দয়া করে আমার এই কথাটা তোমাকে রাখতে হবে।'

'নভেম্বরের তো খুব বেশি দেরি নেই। এই ক'টা দিন তুমি রুমিকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাখো।'

'অসম্ভব। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে যে কোনওদিন বিশ্রী ব্যাপার ঘটে যেতে পারে। মেয়েটার জীবন তো ধ্বংস হয়ে যাবেই, আমারও আত্মহত্যা করা ছাড়া পথ থাকবে না।'

অনুরাধার ব্যাকুলতা এবং উৎকণ্ঠা ক্রমশ প্রণবেশের মধ্যে চারিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তিনি মনস্থির করে ফেলেন। বলেন, 'ঠিক আছে, আমি কলকাতায় যাচ্ছি। কাল না হলেও পরশুর ফ্লাইট ধরব।' পরক্ষণে একটা সম্ভাবনা তাঁকে কিছুটা অন্যমনস্ক করে ফেলে। ডিভোর্সের পর বম্বে এসে তিনি আবার বিয়ে করেছেন। কুড়ি বছর তো কম সময় নয়। এর ভেতর অনুরাধার জীবনেও কি দ্বিতীয় কোনও পুরুষ আসেনি? এমনও হতে পারে, তাঁরও বিয়ে হয়েছে। যদি হয়েই থাকে, তা হলে মেয়েকে শোধরানোর জন্য প্রণবেশকে ডাকছেন কেন অনুরাধা? তবে কি তাঁর এই দ্বিতীয় স্বামীটি স্ত্রীর প্রথম পক্ষের সন্তানের কোনও দায়িত্ব পালন করতে চান না? ব্যাপারটা প্রণবেশের কাছে অস্পষ্ট রয়ে গেল।

প্রাক্তন স্ত্রী ফের বিয়ে করেছে কিনা, তা সরাসরি জিজ্ঞেস করা গেল না। তাই কৌশলে প্রণবেশ জানতে চাইলেন, 'কলকাতায় তুমি কোথায় আছ?'

অনুরাধা বলেন, 'কোথায় আর থাকব? হরিশ মুখার্জি রোডে আমাদের সেই বাড়িতেই—'

'আর কে কে আছে ওখানে?'

'মা আর দাদার কথা তো বললাম, রুমি আর আমি ছাড়া অন্য কেউ নেই।'

হরিশ মুখার্জি রোডে অনুরাধার বাপের বাড়ি। প্রণবেশ মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেলেন, মেয়েকে নিয়ে অনুরাধা যখন ওখানে আছেন তখন নতুন করে বিয়ে করেননি। বললেন, 'কলকাতায় গিয়ে পরশু তোমাকে ফোন করব। তারপর কী করা যায় তখন ঠিক করা যাবে।'

অনুরাধা বলেন, 'আমাদের বাড়ির ফোন নাম্বারটা মনে আছে?'

এবার সূক্ষ্ম একটু খোঁচাই দিলেন প্রণবেশ, 'দশ বছর কেয়াতলায় কাটিয়ে তুমি আমাদের ফোন নাম্বার ভুলে যাওনি। আমিও তো সেই দশ বছর হরিশ মুখার্জি রোডে প্রায়ই গেছি। ওখানকার ফোন নাম্বারটা ভুলে যাব, আমার স্মৃতিশক্তি এতটা খারাপ ভেবো না।'

তক্ষুনি উত্তর দেন না অনুরাধা। অনেকটা সময় পর বলেন, 'একটা ব্যাপারে আমার খুব ভয় হচ্ছে।'

প্রণবেশ জিজ্ঞেস করেন, 'কী সেটা?'

'আমি যে তোমাকে কলকাতায় আসতে বলেছি তোমার বাড়িতে সেটা যদি জানতে পারে—' কথা শেষ না করে থেমে যান অনুরাধা।

প্রণবেশ চকিত হয়ে ওঠেন। তিনি যে ফের বিয়ে করেছেন সেটা তা হলে অনুরাধার অজানা নেই! তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী অমলা খুবই উচ্চশিক্ষিত, প্রায় সব বিষয়েই

উদার, মানুষ হিসেবে চমৎকার কিন্তু স্বামী সম্পর্কে ভয়ঙ্কর সন্দেহপরায়ণ। প্রণবেশের প্রথম স্ত্রীর নাম শুনলে খেপে ওঠেন। স্বামীকে সারাক্ষণই প্রায় চোখে চোখে রাখেন। এমনকি নরিম্যান পয়েন্টের এই অফিসে প্রণবেশের সঙ্গে সকালে চলে আসেন। প্রণবেশ বাড়িটাড়ির ডিজাইন, মডেল, স্কেচ—এসব নিয়ে ডুবে থাকেন। ব্যবসায়িক দিকটা পুরো সামলান অমলা। সেই সঙ্গে স্বামীর ওপর নজরদারিও চলে। ক'দিন হল তাঁর জ্বর, তাই অফিসে আসছেন না। তিনি এখন থাকলে অনুরাধার সঙ্গে কথা বলতে পারতেন না প্রণবেশ।

অমলার চরিত্রের এই সন্দেহপ্রবণ দিকটা নিশ্চয়ই জানা নেই অনুরাধার। কেন-না তিনি বা অমলা কেউ কাউকে আজ পর্যন্ত চোখেও দেখেননি। তবে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে গেলেও স্বামীর আগের স্ত্রীর প্রতি মেয়েদের স্বাভাবিক মনোভাব কী হতে পারে, সেটা আন্দাজ করেই হয়তো কথাটা বলেছেন অনুরাধা। ভেতরে ভেতরে বেশ গুটিয়ে যান প্রণবেশ। হুট করে নভেম্বরের আগে কলকাতায় যাচ্ছেন, এটা জানলে অমলার কাছে কতটা জবাবদিহি যে করতে হবে ভাবতেও অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। কিন্তু অনুরাধাকে কথা দেওয়া হয়ে গেছে, এখন আর তা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। তা ছাড়া রুমি নামে যে সন্তানটির স্মৃতি প্রায় ঝাপসা হয়ে এসেছে তার প্রতি কর্তব্য পালন না করলেই নয়। কলকাতায় অসময়ে যাওয়ার জন্য কী অজুহাত তিনি তৈরি কববেন এখনও ভাবেননি। মনে মনে স্থির করলেন, অমলার সঙ্গে যখন কথা হবে তখন দেখা যাবে।

প্রণবেশ বললেন, 'ও নিয়ে তুমি ভেবো না।'

অনুরাধা বললেন, 'আচ্ছা—' খানিক চুপ করে থেকে ফের বলেন, 'বম্বে থেকে কলকাতার অনেকগুলো ফ্লাইট আছে। একেকটার অ্যারাইভাল একেক সময়। তুমি কোন ফ্লাইটে কখন আসছ?'

প্রণবেশ বলেন, 'বলতে পারছি না। সব ডিপেন্ড কবছে কোন এয়ারলাইনসের টিকেট পাব তার ওপর।'

অনুরাধা বলেন, 'পরশু সারাদিন আমি তোমাব জন্যে বাড়িতে অপেক্ষা করব। এখন ছাড়ি?'

'ঠিক আছে।' ফোনটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন প্রণবেশ। এতদিন, সেই বিবাহ বিচ্ছেদের পর জীবনটাকে গুছিয়ে একটা নির্দিষ্ট সুশৃঙ্খল ছকের ভেতর নিয়ে এসেছিলেন তিনি। অবশ্য অমলাকে না পেলে এটা কোনওভাবে সম্ভব হত না। নিজেব প্রফেশন, নতুন পারিবারিক জীবন, ভবিষ্যতের যাবতীয় পরিকল্পনা—সব কিছু এই ছক ধরেই মসৃণ নিয়মে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু

অনুরাধার এই ফোনটা আচমকা প্রবল ধাক্কায় বাইরের দিকটা না হলেও, ভেতরের অনেক কিছুই এলোমেলো করে দিচ্ছে। নতুন করে অনুরাধা আর রুমির সঙ্গে যোগাযোগ কী ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে, বুঝতে পারছেন না। কিন্তু বন্দুকের গুলি একবার ব্যারেল থেকে বেরিয়ে গেলে তা আর ফেরানো যায় না। যা-ই ঘটুক, কলকাতায় তাঁকে যেতেই হবে। তার আগে এখানকার সব ব্যবস্থা করে যাওয়া দরকার।

ইন্টারকমে মহেশকে নিজের চেম্বারে আসতে বললেন প্রণবেশ। মহেশ, অর্থাৎ মহেশ চাপেকর একজন নাম-করা আর্কিটেক্ট। পদমর্যাদার দিক থেকে এই অফিসে সে হচ্ছে 'নাম্বার টু', প্রণবেশের ঠিক পরের জায়গাটাই তার।

বয়স পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ। পেটানো স্বাস্থ্য। মাঝারি হাইট, গায়ের রং তামাটে। মাথার ডান ধারে সিঁথি, চোখে পুরু লেন্সের চশমা, মুখ চৌকো ধরনের। চেহারায়, পোশাক আশাকে এতটুকু পরিপাট্য নেই। উষ্কখুষ্ক চুল অবহেলায় পেছন দিকে উলটে দেওয়া। গালে চার-পাঁচ দিনের খাপচা খাপচা দাড়ি। পরনে দলা-পাকানো জিনস আর ঢোলা শার্ট যার একটা বোতাম নেই, অন্য দুটো ভাঙা। পায়ের জুতোয় কতকাল যে পালিশ পড়েনি। সব মিলিয়ে এই হল মহেশ। বিয়ে করেনি, নিজের কাজটি ছাড়া পৃথিবীর আর সমস্ত ব্যাপারেই উদাসীন।

'ম্যাজিক ক্রিয়েশান'-এর শুরু থেকেই রয়েছে মহেশ। প্রণবেশের প্রতি তাব আনুগত্যের তুলনা নেই। ওর খুব দুঃসময়ে প্রণবেশ তাকে চাকরি দিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতা ভোলেনি সে। পরে অনেক বড় বড় ফার্মে অনেক বেশি টাকা দিয়ে ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছে, মহেশ যায়নি। প্রণবেশকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না।

মহেশদের বাড়ি নাগপুরে। ওর মা-বাবা ভাই-বোনেরা সেখানেই আছে। বছরে একবার, গণপতি উৎসবেব সময় বাড়ি যায় সে। বম্বেতে মহেশ থাকে প্রণবেশদেরই কাছে, তাঁদের হিল রোডের বাংলোয়।

প্রণবেশ বলেন, 'বসো—'

তাঁর মুখোমুখি একটা চেয়ারে মহেশ বসল।

প্রণবেশ এবার বলেন, 'খুব আর্জেন্ট কাজে পরশু আমাকে কলকাতায় যেতে হচ্ছে।'

বাংলাতেই কথাগুলো বলেছেন প্রণবেশ। বহু বছর মহেশ তাঁদের কাছে আছে। তা ছাড়া বম্বেতে কয়েক লাখ বাঙালির বসবাস। এদের অনেকেই ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাদের সঙ্গে মিশে বাংলাটা চমৎকাব রপ্ত করে ফেলেছে সে। আসলে ভাষা শেখার ব্যাপারে মহেশের দারুণ ঝোঁক। মাতৃভাষা মারাঠি ছাড়া ইংরেজি, হিন্দি, গুজরাটি,

বাংলা, ফ্রেঞ্চ এবং কিছু কিছু স্প্যানিশ আর জার্মানও জানে। তার যে ধরনের কাজ তাতে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকতে হয়। এর ফাঁকে ফাঁকে একটু সময় পেলেই নানা কনসুলেটের ল্যাংগুয়েজ ক্লাসে হাজিরা দিতে ছোটে।

প্রণবেশের কথাগুলো মহেশকে অবাক করে দেয়। কেননা তাদের এই অফিসে জানুয়ারির গোড়াতেই সারা বছরের শিডিউল মোটামুটি ঠিক করে ফেলা হয়। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে মাস দুই কলকাতায় থাকেন প্রণবেশ। আর দুটো মাস দিল্লি মাদ্রাজ বাঙ্গালোর কিংবা দেশের বাইরে ফার-ইস্ট বা মিডল-ইস্টে কাজের ব্যাপারে তাঁকে ছোটাছুটি করতে হয়। বাকি আটমাস বম্বেতেই কাটান। অবশ্য হঠাৎ দূরের কোনও শহর থেকে জরুরি ডাক এলে এই ছকে হেরফের ঘটাতে হয়।

রোজ সাড়ে দশটায়, কাজ শুরু হওয়াব আগে সিনিয়র আর্কিটেক্ট, কো-অর্ডিনেটব এবং ম্যানেজারদের নিয়ে মিটিং করাটা এই অফিসের নিয়ম। সাবাদিনের কর্মসূচি তখনই স্থির হয়ে যায়। হাতে যে সব কাজকর্ম আছে সেগুলোর অগ্রগতি কতটা হয়েছে তা নিয়ে চুলচেরা রিভিয়্যু করা হয়। নতুন কাজের দায়িত্ব কোন আর্কিটেক্টকে দেওয়া হবে, বিজনেস যেভাবে বাড়ছে তাতে কলকাতা ছাড়াও দিল্লি এবং বাঙ্গালোরে ব্রাঞ্চ অফিস খোলা প্রয়োজন কিনা, ইত্যাদি নানা বিষয়ে সবাই মতামত দিয়ে থাকেন।

অন্যদিনের মতো আজও যথারীতি মিটিং হয়েছিল। কিন্তু তখন প্রণবেশ কলকাতায় যাওয়ার কথা ঘুণাক্ষরেও জানাননি। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ভেতর কী এমন ঘটল যে তাঁকে সেখানে ছুটতে হচ্ছে!

মহেশ কোনও প্রশ্ন না করে তাকিয়ে থাকে। সে জানে, হঠাৎ কলকাতায় যাওয়ার কারণ নিশ্চয়ই প্রণবেশ জানাবেন। কিন্তু সেটা বাদ দিয়ে শুধু বললেন, 'সবাইকে যে সব অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া আছে সেগুলো যাতে ঠিক সময়ে কমপ্লিট হয়, লক্ষ রেখো।' একটু থেমে, ভেবে বললেন, 'অফিসে বেরোবার সময় তো দেখে এসেছ, তোমার বউদির জ্বরটা ছেড়েছে।'

আস্তে মাথা নাড়ে মহেশ, 'হ্যাঁ।'

প্রণবেশের স্ত্রী অমলা 'ম্যাজিক ক্রিয়েশান'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং কো-অর্ডিনেটব। ব্যবসার দিক ছাড়াও কোম্পানির সবগুলো ডিপার্টমেন্টের মধ্যে সমন্বয় বা যোগাযোগ রাখার কাজটা তিনি করে থাকেন।

প্রণবেশ বলেন, 'আশা করি দু-চারদিনের ভেতর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে অমলা অফিস অ্যাটেন্ড করতে পারবে। ততদিন তোমাকেই কিন্তু সব সামলাতে হবে।'

প্রণবেশ ব্যক্তিগত কোনও প্রয়োজন কিংবা অফিস-সংক্রান্ত কাজে কলকাতায়

যাচ্ছেন কিনা জানা গেল না। ব্যাপারটা মহেশের কাছে ধোঁয়াটে হয়েই রইল 'প্রণবেশ যখন নিজে থেকে বলেননি তখন এ নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করাটা অভব্যতা। সে শুধু বলে, 'ঠিক আছে। আপনি কলকাতায় ক'দিনের জন্যে যাচ্ছেন?'

'সেটা ওখানে না পৌঁছে বলতে পারব না। হয়তো এক উইকের ভেতর কাজ হয়ে যাবে। নইলে আরও কয়েকটা দিন বেশি থাকতে হতে পারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসতে চেষ্টা করব।'

মহেশ উত্তর দিল না।

প্রণবেশ এবার বলেন, 'আমি রোজ দু'বার কলকাতা থেকে তোমাদের ফোন করব। তেমন কোনও প্রবলেম হলে তক্ষুনি আমাকে জানিও।'

মহেশ বলে, 'আচ্ছা।' একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করে, 'আর কোনও ইনস্ট্রাকশন আছে?'

'না।'

'আমি তা হলে উঠি। ড্রইং করতে করতে চলে এসেছি।'

ব্যস্তভাবে প্রণবেশ বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও।' মহেশ চলে গেলে কোম্পানির ম্যানেজার মিসেস স্টেলা ডিসুজাকে ফোনে বলে দিলেন, পরশু কলকাতাগামী যে কোনও এয়ারলাইনসের যে কোনও ফ্লাইটে একখানা টিকেট চাই। কালই টিকেটটা যাতে পাওয়া যায় তিনি যেন তার ব্যবস্থা করেন।

মিসেস ডিসুজা গোয়াঞ্চি পিদ্রু অর্থাৎ গোয়ার ক্রিশ্চান। মধ্যবয়সী এই মহিলা মহেশের মতোই 'ম্যাজিক ক্রিয়েশান' শুরু হওয়ার দিন থেকে প্রণবেশদের সঙ্গে আছেন। সবসময় হাসিমুখ, প্রখর বুদ্ধির অধিকারিণী মিসেস ডিসুজার মাথা খুব ঠাণ্ডা। কোনও কাবণেই তিনি উত্তেজিত হন না, চড়া গলায় তাঁকে কথা বলতে কেউ কখনও শোনেনি। 'ম্যাজিক ক্রিয়েশান'কে সবাই বলে 'হ্যাপি ফ্যামিলি' বা সুখী পরিবার। এই পরিবারের তিনি একজন অত্যন্ত সম্মানিত মেম্বার। এবং অপরিহার্যও।

ডিসুজা বললেন, 'ব্যবস্থা হয়ে যাবে স্যার।'

প্রণবেশ বলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

।। দুই ।।

রোজ মহেশকে নিয়ে প্রণবেশ তাঁদের 'মারুতি থাউজেন্ড'-এ করে অফিসে আসেন, ফিরেও যান একই সঙ্গে। আজ কিন্তু তিনি আগেই বেরিয়ে পড়লেন। কেন-না আচমকা কলকাতায় যাওয়া নিয়ে অমলার সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে হবে। এ জন্য কত রকম কৈফিয়ৎ যে দিতে হবে, কে জানে। পৃথিবীর অন্য কোনও শহরে

গেলে এত জবাবদিহি করতে হয় না। কিন্তু কলকাতার ব্যাপার অদ্ভুত বিদ্বেষ আমলার, খুব সম্ভব অনুরাধা ওখানে থাকেন বলেই। পারলে পূর্ব ভারতের ওই মেট্রোপলিসে প্রণবেশের যাতায়াত বন্ধ করে দিতেন, স্বামীকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে ছাড়তেন শহরটা তাঁদের পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ। কিন্তু পাবেননি দু'টি কারণে। প্রথমত, ওখানে প্রণবেশের জন্ম এবং উত্তরাধিকার সূত্রে একটা চমৎকার বাড়িও আছে তাঁর। এর চেয়েও জোরালো কারণ হল কলকাতা থেকে তাঁদের কোম্পানির ভাল বিজনেস হয়। অবশ্য যে দুটো মাস প্রণবেশ ওখানে গিয়ে থাকেন, দিনে তাঁকে তিন চার বার করে ফোন করেন অমলা। আগে থেকে না জানিয়ে হঠাৎ হঠাৎ চলেও যান। বারো শ মাইল দূরে আরব সাগরের পারে বসেও অদৃশ্য লাগামটা শক্ত হাতে ধরে থাকেন তিনি। অথচ প্রণবেশের চেয়ে কে আব ভাল জানে, গত কুড়ি বছরে তাঁব সঙ্গে আদৌ কোনও সম্পর্ক ছিল না অনুরাধার। এমনকি চোখে পর্যন্ত দেখেননি তাঁকে।

কলকাতার কথা বললে অমলা কী ধরনের বিস্ফোরণ ঘটাতে পারেন, জানা নেই। মহেশের সামনে চেঁচামেচি বা অশান্তি হোক, এটা কোনওভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। তাই একাই বাড়ি ফিরছেন।

লিফটে করে নিচে নেমে বেসমেন্ট থেকে মারুতি থাউজেন্ড বার করে রাস্তায় চলে এলেন প্রণবেশ। আবও কয়েকটা গাড়ি আছে কোম্পানির—ফিয়াট, অ্যামবাসাডর, মারুতি ওমনি, টোয়োটা ইত্যাদি। সেগুলো থেকে একটা নিয়ে পরে চলে আসবে মহেশ।

মেবিন ড্রাইভের 'কুইনস নেকলেস' পেছনে ফেলে চৌপট্টি, মেবিন লাইনস, কাম্বালা হিলস, পেডার রোড, ওবলি, হাজি আলি, সেঞ্চুরি বাজারের আকাশ-ছোঁয়া অফুরন্ত হাই-রাইজের মাঝখান দিয়ে দূবমনস্কর মতো কখন যে মাহিম ক্রিকও পেরিয়ে বান্দ্রায় চলে এসেছেন, খেয়াল ছিল না প্রণবেশের। তারপব নিজের প্রায় অজান্তে, খানিকটা অভ্যাসবশেই বুঝিবা, গাড়িটা বাঁ দিকে হিল রোডে নিয়ে এলেন। এতটা পথ ড্রাইভ করতে করতে পঞ্চাশ ভাগ সত্যেব সঙ্গে পঞ্চাশ ভাগ মিথ্যে মিশিয়ে কলকাতায় যাওয়াব মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য একটা অজুহাত খাড়া করে ফেলেছেন। টেনসন থেকে আপাতত তিনি খানিকটা মুক্ত। আশা করা যায়, সব শোনার পর অমলার দিক থেকে আপত্তি হবে না।

হিল বোডটা বান্দ্রা পুলিশ স্টেশন ডাইনে রেখে, ছোট বড় অনেকগুলো পার্ক আর জিমখানা পার হয়ে যেখানে দু ভাগ হয়ে দু ধারে চলে গেছে, ঠিক সেইখানটায় একটা মাঝারি টিলার মাথায় প্রণবেশদের ছিমছাম দোতলা বাংলো। এখান থেকে

বাঁয়ের রাস্তাটা গেছে মাউন্ট মেরি চার্চের দিকে। ডাইনের পথটা অনেকখানি নিচে নেমে সমুদ্রের ধারে ব্যান্ড স্ট্যান্ডে গিয়ে মিশেছে।

বাংলোটার চারপাশ পাথরের কমপাউন্ড ওয়াল দিয়ে ঘেরা। একতলায় মোট চারখানা ঘরের একটায় কিচেন এবং খাওয়ার ব্যবস্থা, একটা ড্রইংরুম, একটা গেস্টরুম, একটায় থাকে মহেশ। এছাড়া কমপাউন্ড ওয়ালের ধার ঘেঁষে গ্যারাজ এবং সারভেন্টস কোয়ার্টার্স। দোতলাতেও চারখানা ঘর। একটা অমলা আর প্রণবেশের। ওঁদের এক ছেলে, এক মেয়ে—সন্দীপ আর রণিতা। ডাকনাম শুভ এবং তোড়া। শুভর বয়স আঠার, এ বছর সেন্ট জেভিয়ার্সে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে। তোড়ার ষোল চলছে, একটা কনভেন্ট স্কুলে তার এবার ক্লাস টেন। দোতলায় দুই ভাইবোনের জন্য আলাদা আলাদা বেডরুম। বাকি ঘরটা লাইব্রেরি। স্থাপত্য-সংক্রান্ত যত বই দেশ বিদেশে বেরিয়েছে তার বেশির ভাগই ওখানে রয়েছে। তা ছাড়া পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ের দুর্লভ সব গ্রন্থ লাইব্রেরিটার আকর্ষণ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

দোতলার সামনে এবং পেছনে দুটো ব্যালকনি। সামনেরটা দিয়ে হিল রোডটা অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। আর পেছনে বসলে ব্যান্ড স্ট্যান্ডের ওধারে ধু ধু আরব সাগর।

রান্না, বাসনমাজা, কাপড়কাচা, নানা ফরমাস খাটা, গাড়ি ধোয়া, গেটে পাহারাদারি—এ সবের জন্য কাজের লোক আছে চারজন। তারা বাড়িতেই সারভেন্টস কোয়ার্টার্সে থাকে।

দূর থেকে প্রণবেশের চোখে পড়েছিল, অন্যদিনের মতোই সারা বাড়ির প্রতিটি ঘরে আলো জ্বলছে। এধারের ব্যালকনিতে একটা ইজিচেয়ারে আধশোয়ার মতো করে আছেন অমলা। তিনিও প্রণবেশকে দেখতে পেয়েছিলেন, আস্তে আস্তে উঠে বসলেন।

কাছাকাছি আসতেই উর্দিপরা নেপালি দারোয়ান ধাতব শব্দ করে লোহার গেট খুলে দিল। গাড়ি ভেতরে এনে নিচে নেমে প্রথমে 'লক' করলেন প্রণবেশ। তারপর স্ত্রীর উদ্দেশে হাত নেড়ে সোজা চলে এলেন ড্রইংরুমে। এখানে একধারে ওপরে ওঠার সিঁড়ি।

দোতলায় উঠলে প্রথমে পর পর শুভ আর তোড়ার ঘর। তারপর লাইব্রেরি, সেটা পেরুলে প্রণবেশদের বেডরুম এবং তার গায়েই ব্যালকনি।

ওপরে এসে প্রণবেশ দেখলেন ছেলে এবং মেয়ে খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করছে। দু'জনেই বইয়ের পোকা, লেখাপড়া ছাড়া আর কিচ্ছু জানে না। প্রতিটি পরীক্ষায়

দু'জনেরই রেজাল্ট এক কথায় ব্রিলিয়ান্ট।

শুভরা প্রণবেশকে লক্ষ করেনি, তিনিও তাদের ডাকলেন না, সোজা চলে গেলেন ব্যালকনিতে, স্ত্রীর কাছে। এখানে অনেকগুলো গদি-মোড়া গুজরাতি কুশন ছড়িয়ে আছে। একটা টেনে এনে অমলার মুখোমুখি বসে জিজ্ঞেস করনে, 'এ বেলা কেমন লাগছে?'

অমলার বয়স সাতচল্লিশ আটচল্লিশ। কিন্তু স্বাস্থ্য এখনও অটুট। শরীরের কোথাও এতটুকু শিথিলতার চিহ্ন নেই। কে বলবে এই মহিলা আঠার বছরের এক যুবক এবং ষোল বছরের এক তরুণীর মা? অনায়াসেই তাঁকে বত্রিশ তেত্রিশ বছরের বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। গায়ের রং ততটা টকটকে না হলেও অমলা যথেষ্ট সুন্দরী। কিন্তু সৌন্দর্যের চাইতেও বেশি করে যা চোখে পড়ে তা হল ব্যক্তিত্ব। তাঁর ডিম্বাকৃতি মুখে, বড় বড় চোখের গভীব দৃষ্টিতে, চিবুকের দৃঢ় গড়নে সেটা স্পষ্ট হযে আছে। ক'দিন জ্বরে ভুগছেন। তাই চোখেমুখে পাতলা সরের মতো ক্লান্তির একটা ছাপ পড়েছে। বেশ দুর্বলও দেখাচ্ছে তাঁকে। এই মুহূর্তে তাঁর পরনে ঢিলেঢালা হাউস কোট।

অমলা বললেন, 'অনেকটা ভাল। কিন্তু তুমি একলা চলে এলে? মহেশ কোথায়?'

'অফিসে কাজ করছে। তোমার সঙ্গে একটা জরুরি ডিসকাসন আছে। তাই আগেই চলে এলাম।' একটু থেমে কথাটা সামান্য শুধরে নিয়ে বললেন, 'ডিসকাসন ঠিক নয়, তোমার পরামর্শ চাই।'

অমলা বলেন, 'কিসের পরামর্শ?' তাঁর কণ্ঠস্বরে ঔৎসুক্য ফুটে বেরোয়।

প্রণবেশ মনে মনে কৌশল বা হুক আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন। বললেন, 'আজ কলকাতা থেকে একটা ফোন এসেছিল—'

কলকাতার নাম শুনেই চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে অমলার। কোনও উত্তর না দিয়ে তিনি তাকিয়ে থাকেন।

প্রণবেশ স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে ফের বলতে শুরু করেন, 'তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে মাসকয়েক আগে ওখানে চারটে বড় পার্ক আর তিনটে বড় ট্যাঙ্কের তলায় আন্ডার-ওয়াটার শপিং সেন্টার আর কার পার্কিং-এর ডিজাইন করে দেওয়ার জন্যে অফার এসেছিল।'

অমলার মনে পড়ে গেল। বলেন, 'কিন্তু তার পর তো ওরা আর কনট্যাক্ট করেনি।'

'আজ করেছে। বলল, মাঝখানে কিছু প্রবলেম দেখা দিয়েছিল, তাই যোগাযোগ করেনি। এখন আর কোনও সমস্যা নেই।'

'গুড নিউজ। তোমাকে কী করতে হবে?'

'কাল, তা না হলে পরশুর কোনও ফ্লাইট ধরে কলকাতায় যেতে বলেছে। এত

তাড়া দিচ্ছিল যে আমি হ্যাঁ বলে দিয়েছি। প্রায় চার পাঁচশ কোটি টাকার প্রোজেক্ট, আর্কিটেক্ট হিসেবে আমরা ভাল ফি পাব। অবশ্য তুমি না বললে ওদের জানিয়ে দেব—যাচ্ছি না।'

'না না, একবার কথা যখন দিয়েছ তখন যেতেই হবে। এত বড় একটা অফার হাতছাড়া করা যায় না। কিন্তু—'

'কী?'

'এখানেও তো প্রচুর কাজ। জুহুর সেই হোটেল কমপ্লেক্সটার কী হবে?'

'ভাবছি, ওটা কলকাতায় নিয়ে যাব। ওখানেই ফিনিশ করে ক্যুরিয়ারে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।'

'হ্যাঁ, তাই করো। এয়ার টিকেটের ব্যবস্থা হয়েছে?'

'মিসেস ডিসুজাকে বলে দিয়েছি। মনে হয়, হয়ে যাবে।'

এত মসৃণভাবে, হাজারটা জবাবদিহি না করে কলকাতায় যাওয়া যে সম্ভব হবে, ভাবতে পারেননি প্রণবেশ। আসলে অমলা প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অনেকটা তাঁরই মতো। কলকাতার প্রোজেক্টগুলোর দায়িত্ব নিলে প্রচুর টাকা পাওয়া যাবে, সে জন্য প্রণবেশকে বাধা দিচ্ছেন না, এমন ভাবার কারণ নেই। ফিক্সড ডিপোজিট, ইউনিট ট্রাস্ট আর ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেটে লক্ষ লক্ষ টাকা জমিয়েছেন তাঁরা। বড় বড় ব্লু-চিপ কোম্পানির শেয়ারে কত টাকা ইনভেস্ট করেছেন, নিজেদের খেয়াল নেই। বছরের শেষে কোম্পানিগুলো যে বিশাল অঙ্কের ডিভিডেন্ড পাঠায় তা মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। হিল রোডের এই বাংলো ছাড়া সান্তাক্রুজ এবং খার-এ আরও দুটো দেড় হাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট আছে। বম্বে থেকে পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরে লোনাউলিতে রয়েছে দেড়শ একরের ফার্ম হাউস। টাকার জন্য নয়, কলকাতার জলের তলায় বাজার বা গাড়ি রাখার ব্যবস্থা হলে তা হবে ভারতবর্ষে প্রথম আন্ডার-ওয়াটার পার্কিং কমপ্লেক্স আর প্লাজা। আর্কিটেক্ট হিসেবে 'ম্যাজিক ক্রিয়েশান'-এর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে যাবে। অমলার প্রখর ব্যবসায়িক বুদ্ধি। এই গুড উইলটাকে তিনি ভবিষ্যতে অঙ্ক কষে কাজে লাগাবেন।

মহেশ অফিসে যা জিজ্ঞেস করেছিল, এবার অমলাও তাই করলেন, 'কলকাতায় ক'দিন থাকতে হবে?'

প্রণবেশ মহেশকে যে উত্তরটা দিয়েছিলেন, এখনও তাই দিলেন, 'ওখানে গেলে বলতে পারব। মনে হয় এক উইকের ভেতর কাজ হয়ে যাবে। ফোনে তোমাকে সব জানিয়ে দেব।'

অমলা বলেন, 'ঠিক আছে। যাও, স্নান করে পোশাক পালটে নাও। সাড়ে

এগারোটার আগে তো ডিনার খাও না। পার্বতীকে লাইট কিছু করে দিতে বলব?'
পার্বতী ও বাড়িতে রান্নার কাজ করে।

'না না, এখন আর কিছু খাব না। শুধু এক কাপ চা দিতে বল—' বলতে বলতে উঠে পড়েন প্রণবেশ। নিজেদের বেডরুমে এসে অ্যাটাচড বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে ভাবলেন, সাত আট মাস আগে কলকাতা থেকে আন্ডার-গ্রাউন্ড আর আন্ডার-ওয়াটার প্রোজেক্টের জন্য যে ফোন এসেছিল তা সত্যি, অমলা তা জানেনও। তিনি কলকাতায় গিয়ে প্রোমোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, এটাও সত্যি। এই সব সত্যের সঙ্গে মিথ্যের যে খাদটুকু মিশিয়েছেন তাতে কারও কোনও ক্ষতি হবে না। শুভ, তোড়া এবং অমলাকে নিয়ে তাঁর যে সুখী পরিতৃপ্ত জীবন সেখানে এতটুকু আঁচড় লাগার সম্ভাবনা নেই। তিনি অনুগত স্বামী, দায়িত্বশীল বাবা। প্রণবেশ ঈশ্বরবিশ্বাসী নন, আবার অবিশ্বাসও করেন না। এই মুহূর্তে মনে মনে বললেন, হে ঈশ্বর, যে মিথ্যাচারটুকু করলাম তা নিজের অন্য এক সন্তানকে ধ্বংসের মুখ থেকে ফেরাবার জন্য। এর মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্ন নেই। বিবেকের কাছে আমি পরিষ্কার।

।। তিন ।।

মর্নিং ফ্লাইটের টিকেট পেয়ে গিয়েছিলেন প্রণবেশ। মিসেস ডিসুজা অত্যন্ত করিৎকর্মা অফিসার, কোম্পানির সর্বময় কর্তাটির পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটা সর্বক্ষণ তাঁর মাথায় থাকে। প্লেনে উঠলে জানালার ধারের একটি সিট যে প্রণবেশের চাই-ই সেটা তিনি জানেন। এয়ারলাইনস অফিসের বুকিং কাউন্টারে কাল ছোটাছুটি করে তেমন একখানা টিকেট জোগাড় করে দিয়েছেন।

কিছুক্ষণ আগে পাইলট ক্যাপ্টেন মালহোত্রার কেবিন থেকে অডিও সিস্টেমে জানানো হয়েছিল, প্লেনটা পঁয়ত্রিশ হাজার ফিট ওপর দিয়ে চলেছে। ঘোষণাটা আবছাভাবে প্রণবেশের কানে এসেছিল। জানালার পাশে বসে অন্যমনস্কর মতো বাইরে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। ঝকঝকে আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছে। যেন কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই তাদের—এমনই মন্থর, গন্তব্যহীন, আলস্যমাখানো। অনেক নিচে ছোটবড় পাহাড় বা টিলা, চাপ-বাঁধা সবুজ জঙ্গল, চাষের টুকরো টুকরো জমি, রুপোলি ফিতের মতো নদী—সব বুঝিবা অন্য কোনও আধ-চেনা গ্রহের দৃশ্যাবলী।

বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রণবেশের মনে হল, ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের প্লেনে তিনি কলকাতায় যাচ্ছেন না, অলৌকিক এক টাইম মেশিন সময়ের স্তর ঠেলে

ঠেলে তাঁকে যেন বহু বছর আগের অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে।

প্রণবেশের পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ডটি এইরকম। বংশলতিকা ধরে পিছিয়ে গেলে প্রথমেই যাঁর মুখ মনে পড়ে তিনি হলেন তাঁর ঠাকুরদা বেণীমাধব মজুমদার। এই ভদ্রলোকটি ছিলেন ধুরন্ধর বিজনেসম্যান। বিল্ডিং মেটিরিয়াল অর্থাৎ বাড়ি তৈরির মালমশলা, যেমন ইট সিমেন্ট বালি সুরকির কারবার করে অঢেল পয়সা করেছিলেন আর কলকাতায় একটার পর একটা বাড়ি কিনেছিলেন।

বেণীমাধবের ছিল প্রচণ্ড ফুলের শখ, সেটাকে একরকম প্যাসানই বলা যায়। প্রতিটি বাড়ির সামনের দিকে বিস্তর খরচ করে তৈরি করেছিলেন চমৎকার একেকটি বাগান। ফুলের সঙ্গে ইট সিমেন্টকে মেলানো অভাবনীয় ব্যাপার। তবু এই দুরূহ কাজটি তিনি বেশ সুচারুভাবেই করতে পেরেছেন। যে সব বাড়ি কিনেছিলেন সেগুলোর নাম দিয়েছিলেন 'অতসী', 'মল্লিকা', 'সূর্যমুখী', 'অপরাজিতা' আর 'রজনীগন্ধা'। তাঁর চার ছেলে, তিন মেয়ে। বাড়িগুলোর মতো মেয়েদেরও তিনি নামকরণ করেছিলেন ফুলের নামে। তবে বকুল, কমল, চম্পক ইত্যাদি নামগুলো তাঁর মতে পৌরুষ ফুটিয়ে তোলার সঙ্গে যথেষ্ট নয়, তাই ছেলেরা রেহাই পেয়ে গিয়েছিল।

বেণীমাধব ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী মানুষ। বহুকাল আগেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জয়েন্ট ফ্যামিলির দিন শেষ হয়ে আসছে। মেয়েরা ছিল বড়, তারা একে একে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে, ছেলেদের বিয়ে দিয়েছিলেন। একেকটি ছেলের বিয়ে হয়েছে আর তিনি তাদের প্রত্যেককে একখানা করে বাড়ি লিখে দিয়ে নতুন বউসুদ্ধ সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আলাদা আলাদা থাকলে পরস্পরের সম্পর্ক ভাল থাকবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। অন্য ছেলেদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তই নিন, ছোট ছেলে অর্থাৎ প্রণবেশের বাবা চারুমাধবের বেলা কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটেছিল।

বেণীমাধব থাকতেন দক্ষিণ কলকাতার বনেদি পাড়া কেয়াতলার বাড়িতে, যার নাম 'রজনীগন্ধা'। শেষ বয়সে যখন তিনি স্ত্রীকে হারান তার কিছুদিন বাদে চারুমাধবের বিয়ে দিয়ে তাঁকে এবং নতুন পুত্রবধূ সুলেখাকে নিজের কাছেই রেখে দেন। বিয়ের তিন বছরের মাথায় প্রণবেশের জন্ম দিতে হাসপাতালে গিয়ে আর ফিরে আসেননি সুলেখা। তাঁর মৃত্যুর ছ'মাসের মাথায় মাত্র কয়েকদিনের জ্বরে চারুমাধবও মারা যান। তারপব তেইশ বছর পর্যন্ত প্রণবেশকে দু হাতে আগলে আগলে রেখেছেন বেণীমাধব। মৃত্যুর আগেই সব দিক দিয়ে নাতির ভবিষ্যৎ এমন সুরক্ষিত করে রেখেছিলেন যে পরে কোনওরকম অসুবিধাই হয়নি প্রণবেশের। কেয়াতলার বাড়িটাও নাতিকে লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন।

বেণীমাধব ব্যবসা করলেও ছেলেরা কিংবা তাদের ছেলেরা কিন্তু সে লাইনে যায়নি। গদিতে বসে ইট বালি চুন সুরকি বেচা তাদের কাছে সম্মানজনক মনে হত না। লেখাপড়া শিখে তারা চাকরিবাকরিকেই জীবনের ধ্যানজ্ঞান করে নিয়েছিল। এজন্য খুবই আপসোস ছিল বেণীমাধবের কিন্তু জোর করে কাউকে নিজের ব্যবসায় টেনে আনেননি। যা করেছেন সবটা একাই। তবে শেষ বয়সে সুলেখা এবং চারুমাধবের মৃত্যুতে এতটাই ভেঙে পড়েন যে কাজে মন দিতে পারতেন না, লাভের কারবারটা জলের দরে বেচে দিতে হয়েছিল।

বেণীমাধব যখন মারা যান, তেইশ বছরের প্রণবেশ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্কিটেকচারের ছাত্র। স্থাপত্যবিদ্যার দিকে তাঁর ঝোঁক ঠাকুরদার কারণেই।

বেণীমাধব খুব বেশি পডাশোনা কবতে পারেননি। বাড়িতে এত অভাব যে ক্লাস নাইনে উঠেই স্কুল ছাড়তে হয়েছিল। তারপর নানারকম উঞ্ছবৃত্তির পর বিল্ডিং মেটিরিয়ালের ব্যবসা শুরু করেন। তাঁর গো-ডাউন থেকে যে বালি-সিমেন্ট-ইট লোকে নিয়ে যায় সেগুলো দিযে গড়ে ওঠে চমৎকার চমৎকার বাড়ি, অফিস বিল্ডিং, মার্কেট কমপ্লেক্স। আর্কিটেক্টদের যে নক্‌শা বা ব্লু-প্রিন্ট থেকে এসব তৈরি হয়, সেগুলো তাঁকে অবাক করে দিত। ভাবতেন, তিনিও যদি এমন সব ডিজাইন করতে পারতেন। কিন্তু তা আব এ জীবনে সম্ভব নয়। ইচ্ছাপূরণটা শেষ পর্যন্ত করতে চেয়েছিলেন নাতিকে দিয়ে। প্রণবেশের কম বয়সে স্কুল-কলেজের ছুটি পড়লে তাঁকে নিয়ে দেশের নানা প্রান্তে বেরিয়ে পড়তেন বেণীমাধব। এক বছর যদি যেতেন উত্তব ভারতে, পরের বার সাউথ ইন্ডিয়ায়। হিন্দু, মুঘল বা ব্রিটিশ আমলের বিস্ময়কর সব ইমারত, মন্দির. গির্জা, মসজিদ বা বিখ্যাত রাজাবাদশাদের স্মৃতিসৌধ দেখিয়ে আনতেন। বড় বড মেট্রোপলিসে নিযে দেখাতেন মডার্ন আর্কিটেকচারের নমুনা বিশাল বিশাল সব হাই-রাইজ। বলতেন, 'এসব বাড়ির নক্‌শা যারা কল্পনা করেছে তাদেব ক্রিয়েটিভ পাওয়ার কতটা ভাবতে পার! তোমাকেও এদের মতো হতে হবে দাদাভাই।' এইভাবে ধীবে ধীরে, সযত্নে নিজের স্বপ্নটাকে নাতির মধ্যে চারিয়ে দিয়েছেন তিনি।

ফলে বি. এসসি পাস করার পর আর্কিটেকচার নিয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন প্রণবেশ তখন তাঁব জীবনেব একমাত্র লক্ষ্য দেশের সবচেয়ে সেরা স্থপতি হওয়া। কিন্তু তা আর দেখে যেতে পারেননি বেণীমাধব। প্রণবেশ থার্ড ইয়ারে সবে উঠেছেন সেই সময় ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে মারা যান তিনি।

জন্মের পব থেকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন ঠাকুরদা। তাঁব মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই প্রণবেশকে আমূল ঝাঁকিয়ে দিয়ে

গিয়েছিল। বেশ কিছুদিন তিনি বাড়ি থেকে বেরোননি, তারপর প্রবল মৃত্যুশোক অনেকখানি সামলে উঠে আবার ক্লাস শুরু করলেন।

একবছর বাদে প্রণবেশের যখন ফোর্থ ইয়ার, সেই সময় জীবনে চমকে দেওয়ার মতো একটা ঘটনা ঘটল। অনুরাধাকে সেই প্রথম তিনি দেখলেন।

ইউনিভার্সিটির বিশাল ক্যাম্পাসের এক মাথায় আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্ট, অন্য প্রান্তে বাংলা বিভাগ। স্থাপত্যবিদ্যার ছাত্রের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী অনুরাধা মুখার্জির যোগাযোগ কখনই ঘটত না, যদি না ইউনিভার্সিটির অ্যানুয়াল সোসাল ফাংশানে অনুরাধার গলায় তিনি রবীন্দ্রনাথের আকুল-করা প্রেমের গান শুনতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অজস্র মেয়ের ছড়াছড়ি। তাঁদের আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টেও অর্ধেকের বেশিই হল মেয়ে। এদের সবার সঙ্গেই ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। হই-হুল্লোড়, মজা—সবই করতেন প্রণবেশ কিন্তু তার বেশি কিছু না। মেয়েদের ব্যাপারে তাঁর আলাদা কোনওরকম আগ্রহ ছিল না। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করা। এক বগ্‌গা ধাবমান অশ্বের মতো তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে সেদিকে ছুটছিলেন। কিন্তু অনুরাধা তাঁর ছকটা একেবারে ওলট-পালট করে দিয়েছিল।

অ্যানুয়াল ফাংশনটা হয়েছিল কলামন্দির-এর বিশাল অডিটোরিয়াম ভাড়া নিয়ে। ইউনিভার্সিটির সব ছাত্রছাত্রী, তাদের অভিভাবকরা, অধ্যাপক অধ্যাপিকা, উপাচার্য থেকে আরও অনেক বিশিষ্ট অতিথি, সব মিলিয়ে তিনতলা হলটা ছিল জমজমাট।

দু'দিনের অনুষ্ঠান। প্রথম দিন ছিল বিখ্যাত গ্রুপ থিয়েটারের নাম-করা একটা নাটক আর আবৃত্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আবৃত্তিতে অংশ তো নিয়েছিলই, বাইরে থেকেও খ্যাতিমান আবৃত্তিকারদের আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল। দ্বিতীয় দিন শুধুই গান। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে আধুনিক—সব রকম গানের জমকালো আসর বসেছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, অখিলবন্ধু ঘোষ থেকে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলা সেন থেকে নির্মলেন্দু চৌধুরী পর্যন্ত বাংলা গানের উজ্জ্বল নক্ষত্রেরা এসে মাতিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গে গাইবার জন্য কয়েকজন ছাত্র ছাত্রীকেও সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

এতকাল পরেও প্রণবেশের স্পষ্ট মনে আছে, একজন আধুনিক গানের শিল্পীর গাওয়া শেষ হলে ঘোষণা করা হয়েছিল বাংলা বিভাগের ছাত্রী অনুরাধা মুখার্জি এবার রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনাবেন। সেদিন যে নক্ষত্রমালার সমাবেশ ঘটেছিল সেখানে বি. এ সেকেন্ড ইয়ারের একজন ছাত্রী কী আর এমন গাইবে! নেহাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে বলে গাইতে ডাকা হয়েছে—শ্রোতাদের এমন একটা মনোভাব।

তাঁদের অনুরাধা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না, নিজেদের মধ্যে তাঁরা গল্প জুড়ে দিয়েছিলেন। একসঙ্গে হাজার মাছির ঝাঁক ভনভনানি শুরু করলে যেমন শোনায় গোটা অডিটোরিয়াম জুড়ে সেইরকম আওয়াজ হচ্ছিল।

কিন্তু অনুরাধা যখন মঞ্চে এলেন, মনে হয়েছিল চারপাশের জোরালো আলোর দ্যুতি কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। অডিটোরিয়ামের গুঞ্জন মুহূর্তে থেমে গেল।

পানপাতার মত মুখ অনুরাধার, গায়ের রং স্বর্ণাভ, ঘন পালকে ঘেরা বড় বড় টানা দুই চোখের মণিতে আশ্চর্য স্বপ্নময়তা। কাঁধ পর্যন্ত নিবিড় কালো চুল, ছোট কপাল, সোনার ফুলদানির মতো গলা, নিটোল দু'টি হাত কাঁধ থেকে নেমে এসেছে। সব মিলিয়ে মায়াকাননের পরীর মতো অলৌকিক মনে হচ্ছিল অনুরাধাকে।

তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন এক পরমাশ্চর্য তরুণী পড়ে, আগে কখনও লক্ষ করেননি প্রণবেশ। অবাক বিস্ময়ে তিনি মঞ্চের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অনুরাধা যখন গান শুরু করলেন গোটা অডিটোরিয়াম জুড়ে ম্যাজিকের মতো কিছু ঘটে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের যে রাগাশ্রয়ী প্রেমের গানটি তিনি বেছে নিয়েছিলেন তার মধ্যে মেশানো ছিল গোপন, অপার্থিব মাধুর্য। তাঁর মোহময়, সতেজ কণ্ঠস্বর এবং গাওয়ার স্টাইলে সেই মাধুর্য যেন চারিদিকে হাজারটা ফুল হয়ে ফুটে উঠেছিল।

অনুরাধা যখন শেষ করলেন, শ্রোতাদের হাততালি থামতেই চায় না। তাদের অনুরোধে আরও পাঁচখানা গান গাইতে হয়েছিল তাঁকে। প্রতিটি গানই বিখ্যাত, অনেক বড় বড় শিল্পী সেগুলো আগেই রেকর্ড করেছিলেন। সেই সব রেকর্ড হাজার হাজার কপি বিক্রিও হয়েছে। যে শ্রোতারা সেদিন কলামন্দির-এ এসেছিলেন তাঁদের ব্যক্তিগত কালেকশানে তার দু-একটা নিশ্চয়ই ছিল, তা সত্ত্বেও অনুরাধার মতো একটি আনকোরা মেয়ের গান ওঁদের মুগ্ধ করেছে। শোনা যায়, তিনি যখন গাইছিলেন তখন গ্রিনরুমে বসে শুনেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর সুচিত্রা মিত্র। তাঁরা খুশি হয়েছিলেন, পরে অনুরাধাকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন।

মাঝরাতে অনুষ্ঠান শেষ হলে অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে বাড়ি ফিরেছিলেন প্রণবেশ। এতজন বিখ্যাত প্রিয় শিল্পী তাঁদের সেরা সাত-আটখানা করে গান ফাংশানে গেয়েছেন কিন্তু এঁদের কাউকেই মনে পড়ছিল না তাঁর। অদৃশ্য কোনও টিভি পর্দায় বার বার অনুরাধার মুখ ফুটে উঠেছিল যেন, আর তাঁর সুরের ঝংকার পৃথিবীর সব শব্দ ছাপিয়ে অনবরত কানে বেজে যাচ্ছিল। প্রণবেশের মনে হয়েছিল, আর্কিটেকচারের বাইরেও এমন কিছু আছে যার আকর্ষণ অনেক বেশি তীব্র। সেই প্রথম টের পেলেন, তাঁর মধ্যে অদম্য এক প্যাসান কোনও একটা খাপে আটকানো ছিল, আচমকা সেটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যেন বেরিয়ে পড়েছে।

বাকি বাতটুকু আব ঘুম আসেনি প্রণবেশেব। বিছানায শুযে অন্ধকাবে সিলিংযেব দিকে তাকিযে থাকতে একসময তাঁব মনে হয়েছিল অনুবাধাকে পেতেই হবে। প্রায অলৌকিক এই নাবীটিকে না পাওযা গেলে বেঁচে থাকাব কোনও মানে হয না।

অ্যানুযাল সোসালেব পব ইউনিভার্সিটি দু'দিন বন্ধ ছিল। এব মধ্যে অনুবাধাব সঙ্গে দেখা হওযাব সম্ভাবনা নেই। অথচ তাঁব জন্য বুকেব ভেতব সাবাক্ষণ তোলপাড হযে যাচ্ছিল। অনুবাধাবা কোথায থাকেন, তাঁব জানা নেই। জানলে এক মুহূর্তও দেবি কবতেন না, সেখানে ছুটে যেতেন।

বাংলা নিযে সেকেন্ড ইযাবে পডছে এমন কোনও ছেলেমেযেব সঙ্গে পবিচয নেই প্রণবেশেব। থাকলে তাদেব কাবও কাছ থেকে অনুবাধাব ঠিকানা জোগাড কবে নেওযা যেত। হঠাৎ তাঁব মনে পডেছিল, ইউনিভার্সিটিতে একই বিল্ডিং-এ বাংলা বিভাগেব ঠিক পাশে হিস্ট্রি, কম্পাবেটিভ লিটাবেচাব আব ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট। এই সব সাবজেক্ট নিযে যাবা পডে তাদেব অনেকেবই সঙ্গে তাঁব বন্ধুত্ব বযেছে। এবা অনুবাধাব ঠিকানা জানলেও জানতে পাবে। প্রণবেশ এই বন্ধুদেব অনেকেব বাডি চলে গেছেন, কাউকে কাউকে ফোন কবেছেন কিন্তু ঠিকানা পাওযা যাযনি।

দু'দিন পব ইউনিভার্সিটি খুললে প্রথমে তিনি নিজেব ডিপার্টমেন্টে যাননি সোজা চলে গিযেছিলেন বাংলা বিভাগে। পাক্কা দু ঘন্টা খাডা দাঁডিযে থাকাব পবও যখন অনুবাধা এলেন না তুখোড গোযেন্দাদেব মতো খোঁজাখুঁজি কবে তিনি সেকেন্ড ইযাবেব ছেলেমেযেদেব গিযে ধবলেন এবং একজনেব কাছে শেষ পযন্ত ঠিকানাটা পাওযা গেল। কিন্তু জানা গেল না, বিশ্ববিদ্যালয খুলে গেলেও কেন অনুবাধা সেদিন আসেননি।

তখন প্রায দেডটাব মতো বাজে। যাব সঙ্গে আলাপ হযনি, দুপুববেলা এমন কোনও তরুণীব বাডি যাওযা যায না। বাংলা ডিপার্টমেন্টেব বিল্ডিংটা থেকে দুটো বড খেলাব মাঠ পাব হযে দূবমনস্কব মতো নিজেদেব ডিপার্টমেন্টে ফিবতে ফিবতে প্রণবেশ ঠিক কবলেন, বিকেলে অনুবাধাদেব বাডি যাবেন। মাঝখানে পবপব তিনটে ক্লাস ছিল তাব। অধ্যাপকবা একটানা কী যে বলে গেলেন তাব একটি বর্ণও মাথায ঢোকেনি, একটা লাইনও নোট নিতে পাবেননি তিনি।

বিকেলে ইউনিভার্সিটি থেকে বেবিযে প্রণবেশ সোজা এসেছিলেন লেক মার্কেটে। সেখান থেকে চাব ডজন তাজা বজনীগন্ধা আব লাল গোলাপেব তোডা কিনে চলে গিযেছিলেন হবিশ মুখার্জি বোডে। এত ফুল নিযে যাওযাব পেছনে সূক্ষ্ম সুদূবপ্রসাবী উদ্দেশ্যও ছিল।

হবিশ পার্কেব উলটো দিকে অনুবাধাদেব পুবনো আমলেব দোতলা বাডিটা খুঁজে

বার করতে অসুবিধা হয়নি। কলিং বেল বাজাতে যিনি দরজা খুলে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন তাঁকে বেশ সুপুরুষ বলা যায়। বয়স তিরিশ বত্রিশ। চেহারায় অনুরাধার আদলটি বসানো। অনায়াসে শনাক্ত করা গেছে অনুরাধার দাদা টাদা হবেন। বেশ অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কাকে চান?'

ঠিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হলেও প্রণবেশ বলেছিলেন 'এটা কি অনুরাধা মুখার্জিদের বাড়ি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।'

নিজের নাম জানিয়ে প্রণবেশ বলেছেন, 'অনুরাধাদেবী আর আমি একই ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। আমার সাবজেক্ট আর্কিটেকচার। একটু থেমে বলেছেন, আপনার চেহারার সঙ্গে অনুরাধাদেবীর ভীষণ মিল। আপনি কি—'

তার কথা শেষ হতে না হতেই ভদ্রলোক বলেছেন, 'আমি ওর দাদা। আমার নাম অবনীশ।

প্রণবেশ বলেছেন, সেইরকমই মনে হয়েছিল। অনুরাধাদেবী কি বাড়িতে আছেন?

একটু চুপ করে থেকে অবনীশ বলেছেন, 'আছে।'

আমি তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।'

'কোনও দরকার আছে?'

তেমন কিছু নয়। ওঁর সঙ্গে মানে আপনাদের সবার সঙ্গেই আলাপ করার ইচ্ছে। প্লিজ—'

প্রণবেশের চমৎকার চেহারা, কথা বলার স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি ভাল লেগেছিল অবনীশের। তাছাড়া একই ইউনিভার্সিটিতে অনুরাধা আর এই অচেনা ছেলেটি পড়ে। যদিও বলেছে আলাপ করাই উদ্দেশ্য, তবু কোথায় যেন একটা দ্বিধা কাজ করছিল। বাড়ির ভেতর হুট করে প্রণবেশকে ঢোকানো ঠিক হবে কিনা, বুঝতে পারছিলেন না অবনীশ।

প্রণবেশ তাঁর মনোভাব আন্দাজ করে নিয়ে বলেছিলেন. 'সেদিন কলামন্দির-এ অনুরাধা দেবীর গান শুনে ভীষণ ভাল লেগেছিল। ভেবেছিলাম আজ ইউনিভার্সিটিতে কনগ্র্যাচুলেট করব। কিন্তু ওঁকে পেলাম না। তাই ঠিকানা জোগাড় করে বাড়িতেই চলে এলাম।'

অবনীশ এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ করেননি, এবার তাঁর চোখে পড়ল প্রণবেশের হাতে তোড়ায় বাঁধা অজস্র ফুল। একটু চিন্তা করে এবার বলেছেন, 'আচ্ছা, আসুন—'

একতলায় ড্রইংরুম। সাদামাঠা সোফা টোফা দিয়ে সাজানো। সামনের দিকে সস্তা

ছিটের পর্দা। অবনীশের সঙ্গে সেখানে আসতে আসতে প্রণবেশের চোখে পড়েছিল, সাধারণ মধ্যবিত্তের বাড়ি যেমন হয় চারপাশে তার অভ্রান্ত ছাপ মারা। বহুদিন দেওয়ালে রং পড়েনি, রেন পাইপ অনেক জায়গায় ফাটা, বাঁধানো উঠোনের সিমেন্ট উঠে উঠে তলার ইট বেরিয়ে পড়েছে। ছাদে কার্নিসের কোণে কোণে অশ্বত্থের চারা গজিয়ে উঠেছে, সেগুলো দেওয়ালের ভেতর শেকড় চালিয়ে চালিয়ে বাড়িটার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে।

ড্রইংরুমে এসে অবনীশ বলেছিলেন, 'আপনি একটু বসুন। আমি অনুকে খবর দিচ্ছি।'

প্রায় পনের মিনিট পর অনুরাধা এলেন। একাই নন, তাঁর সঙ্গে অবনীশ ছাড়াও আরও দু'জনকে দেখা গিয়েছিল। একজন বর্ষীয়সী বিধবা মহিলা, যাঁকে দেখেই বোঝা গেছে অনুরাধার মা। ছেলে এবং মেয়ে মায়ের মুখশ্রী পেয়েছে। দ্বিতীয় জন মধ্যবয়সী পুরুষ। রোগা ক্ষয়াটে চেহারা, তোবড়ানো গাল, মাথায় পাঁশুটে রঙের চুল, নাকের তলায় খাড়া গোঁফ, পাকা ভুরু, বাইফোকাল চশমার ওধারে সন্দিগ্ধ, ধারালো চোখ। দেখেই টের পাওয়া গিয়েছিল, পৃথিবীর কাউকে তিনি বিশ্বাস করেন না।

প্রণবেশ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বয়স্ক লোকটি তাঁকে বলেছেন, 'বসুন—'

প্রণবেশ সবার উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে ফের বসে পড়েছিলেন। তাঁর মুখোমুখি বসেছিলেন অনুরাধা এবং অনুরাধার পাশে সতর্ক পাহারাদারের মতো মধ্যবয়সী লোকটি। বয়স্কা মহিলাটি বসেছিলেন ডানধারের একটা সোফায়। তাঁর মুখচোখ দেখে মনে হয়েছিল খুবই সাদাসিধে, ভালমানুষ। আচমকা অচেনা একটি যুবক এভাবে আগে না জানিয়ে এসে পড়ায় তাঁকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। অবনীশ বসেননি, অনুরাধার পেছনে সোফার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সবাইকে একপলক দেখবার পর প্রণবেশের দুই চোখ স্থির হয়ে অনুরাধার মুখের ওপর আটকে গিয়েছিল। দু'দিন আগে কলামন্দির-এর মঞ্চে হাজার ওয়াটের রঙিন আলোর ফোয়ারার ভেতর মায়াকাননের পরী হয়ে উঠেছিলেন তিনি। আর এখন, বেলাশেষের মায়াবী আলোয় ঘরোয়া সাজেও তাঁকে অলৌকিক মনে হচ্ছিল।

প্রণবেশ কিছু বলার আগেই সেই বয়স্ক লোকটি হঠাৎ বলে উঠেছিলেন, 'আপনার পরিচয়টা ডালুর মুখে শুনেছি। আপনাদের সারনেম তো মজুমদার?'

ডালু যে অবনীশের ডাক-নাম সেটা আন্দাজ করে নিয়েছিলেন প্রণবেশ। কিন্তু বর্ষীয়ান লোকটার কণ্ঠস্বর এমন [illegible] আর কর্কশ যে ভীষণ অস্বস্তি হয়। প্রণবেশ হকচকিয়ে গেছেন। অনুরাধার দিক [illegible] চোখ সরিয়ে তাঁকে লক্ষ করতে থাকেন।

অনুবাধার সঙ্গে তাঁব কী সম্পর্ক বোঝা যাচ্ছিল না। প্রণবেশ বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, মজুমদাব।'

লোকটি এবাব জিজ্ঞেস কবেছেন, 'মজুমদাব পদবি তো বামুন কাযেত বদ্যি—সবাবই হতে পাবে। আপনাবা কী?'

প্রথম আলাপেই কেউ যে জাতপাতেব ব্যাপাব টেনে আনতে পাবে আগে কখনও ভাবেননি প্রণবেশ। বীতিমত অবাক হযেই তিনি বলেছেন, 'আমবা কাযস্থ।'

'আমবা কিন্তু ব্রাহ্মণ—কুলীন।'

মুখার্জিবা যে কুলীন বামুন হয তা কে না জানে। কিন্তু বিশেষভাবে সেটা মনে কবিযে দেওযাব কী কাবণ থাকতে পাবে? হঠাৎ প্রণবেশেব মাথায বিদ্যুৎচমকেব মতো কিছু ঘটে গিযেছিল। কাযস্থ হযে ব্রাহ্মণেব মেযেব সঙ্গে যাতে বেশি মাখামাখি কবাব চেষ্টা না কবেন সেই জন্যই কি আগেভাগে সতর্ক কবে দেওযা হল? বিমূঢেব মতো তাকিযে ছিলেন প্রণবেশ।

ভদ্রলোক থামেননি। একটানা বলে যাচ্ছিলেন, 'আমাব নাম গোপাল মুখার্জি। গোডাতেই জানিযে দেওযা ভাল, আমি কিন্তু বাচ্চাদেব বইযেব সেই গোপালেব মতো সুবোধ বালক নই। আলিপুবে ওকালতি কবি। লোকে বলে বাঘ। আমাব মতো ক্রিমিনাল লইযাব নাকি ওযেস্ট বেঙ্গলে দু-চাবটে [illegible] বেশি নেই [illegible] কোর্টে ঘাঘী বদমাযেশদেব পেলে তাদেব [illegible] কবে দিই [illegible] আমি অন্য মানে আপনাদেব অনুবাধা মুখার্জিব [illegible] আমাব বাডিতে [illegible] থাকি' [illegible] মহিলাটিকে দেখিযে বলেছিলেন [illegible] আমাব [illegible] ভাল [illegible]।'

গোপাল মুখার্জি যেভাবে [illegible] পবিচয দিযেছেন তা প্রণবেশেব বক্তচাপ বাডিযে দিচ্ছিল [illegible] ভদ্র কিন্তু কেউ খুঁচিযে দিলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিযে দিতে [illegible] প্রথম দিন [illegible] বাডিতে এসেছেন, তাই নিজেকে সামলে [illegible] ভালমানুষেব মতো মুখ কবে বলেছিলেন, 'আমি কি ভুল [illegible] চলে এসেছি?'

গোপাল মুখার্জি [illegible]। প্রণবেশেব মতো ইউনিভার্সিটিব পডুযা এক ছাত্রেব [illegible] প্রশ্ন তিনি আশা কবেননি। কযেক পলক চুপচাপ তাকিযে থেকে [illegible] ভাবতে চেষ্টা কবেছিলেন, এই যে ছোকবা তাকে সূক্ষ্ম একটি খোঁচা দিল তাব কাবণ কী হতে পাবে? তাঁব নিজেব আচবণ বা কথাবার্তায কোনও [illegible] হযে গেছে কি? অবশ্য কিছুক্ষণেব মধ্যেই গোপাল মুখার্জিব ভেতবকাব ঝানু উকিলটি ফেব পুবোদস্তুব সক্রিয হযে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন [illegible] না, তা আসেননি। তবে একটা কথা জেনে বাখা ভাল, আদালতে

যাওয়াটা কিন্তু খুব সুখের ব্যাপার নয়।' একটু থেমে কিছু ভেবে আবার বলেছেন, 'কোর্ট খুব জঘন্য জায়গা। কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আদালত ছুঁলে কিন্তু তার ডবল—ছত্রিশ ঘা।'

লোকটা পরিষ্কার ভয় দেখাচ্ছিল। পারলে এক্ষুনি বুঝিবা তাঁকে টানতে টানতে আসামীর কাঠগড়ায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে। উত্তর না দিয়ে পলকহীন তাকিয়ে থেকেছেন প্রণবেশ।

গোপাল মুখার্জি এবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, ঝানু ক্রিমিনালদের জেরা করার স্টাইলে প্রণবেশের পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড, আত্মীয়স্বজনরা কে কী করে, কে কোথায় থাকে, সব জেনে নিয়ে বেশ মোলায়েম করে বলেছিলেন, 'আমরা টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত। বাড়িঘর, পরিবেশ দেখে নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারছেন। আপনার জানা উচিত মিডল ক্লাস ফ্যামিলির লোকেরা খুব কনজারভেটিভ হয়—মানে রক্ষণশীল। আগে থেকে কেউ না জানিয়ে হুট করে বাড়ি চলে এলে আমরা ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে যাই।'

প্রণবেশ লক্ষ করেছিলেন প্রথম দিকে গোপাল মুখার্জির ব্যবহার রূঢ়, অভদ্র হলেও ক্রমশ তা বদলে যাচ্ছিল। অমায়িক মুখ করে লোকটা পরের দিকে মসৃণভাবে ছুরি চালিয়ে গেছে। খুব সম্ভব এটা চতুব উকিলি কৌশল—কখনও নরম কখনও গরম। অস্পষ্টভাবে কিছু একটা জবাব দিয়েছিলেন প্রণবেশ, সেটা বোধহয় কেউ শুনতে পায়নি।

গোপাল মুখার্জি বলেছিলেন, 'ফুল টুল খুব ভাল জিনিস। অতি পবিত্র। তবে সে সব নিয়ে কোনও অচেনা যুবক একটি অবিবাহিতা তরুণী মেয়ের কাছে হুট করে চলে আসবে—এজাতীয় বিলিতি কেতায় আমরা এখনও রপ্ত হতে পারিনি। সে যাক, এখন যে জন্যে এসেছেন সেটা চট করে সেরে ফেলুন।' অনুরাধার দিকে ফিরে বলেছেন, 'অনু, এই যুবকটি তোকে কনগ্র্যাচুলেট করতে চায়।'

এমন একটা ধুরন্ধর কাকা পাহারাদার হয়ে সারাক্ষণ অনুরাধার পাশে বসে থাকবে, আগে ভাবা যায়নি। ঘুণাক্ষরেও টের পেলে নিশ্চয়ই এ বাড়িতে আসতেন না প্রণবেশ। অসহ্য রাগে মাথার ভেতর আগুন ধরে গিয়েছিল তাঁর। তবু যতটা সম্ভব মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে অনুরাধার দিকে তাকিয়েছিলেন। বলেছেন, 'সেদিন কলামন্দির-এ আপনার গান শুনে দারুণ ভাল লেগেছিল। সেটাই জানাতে এসেছিলাম।' অবনীশের সঙ্গে ড্রইংরুমে ঢুকে ফুলের তোড়াগুলো আগেই টেবলের একধারে রেখে দিয়েছিলেন। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে বলেছেন, 'এগুলো আপনার জন্যে এনেছি। নিজের হাতে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু দিলে আপনার মধ্যবিত্ত উকিল কাকা হয়তো কোমরে দড়ি দিয়ে আমাকে আলিপুরে কোর্টে নিয়ে তুলবেন। দয়া করে যদি নেন

খুশি হব, নইলে ফেলে দেবেন। আচ্ছা চলি—' বলতে বলতে উঠে পড়েছেন।

অনেকক্ষণ একটানা, এলোপাথাড়ি মার খাওয়ার পর একটা বুলেট সঠিক টার্গেটে লাগাতে পেরেছিলেন প্রণবেশ। তাঁর চোখে পড়েছিল আলিপুরের দুর্ধর্ষ উকিলটির চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে আর হাত বার বার মুঠো পাকিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল চশমার আড়ালে তাঁব দুই চোখ থেকে আগুন ঠিকরে পড়বে।

অনুরাধার মা বা অবনীশ কেউ একজন শশব্যস্ত, নিচু গলায় বলে উঠেছিলেন, 'আমাদের বাড়ি এই প্রথম আসা হল। একটু চা না খেয়ে গেলে—'

বাকিটা আর শুনতে পাননি প্রণবেশ। কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা দরজার বাইরে চলে গিয়েছিলেন। অবনীশ কি তাঁর পেছন পেছন ছুটে এসেছিলেন? এতকাল পর আর মনে পড়ে না। তবে যা ভুলে যাননি তা হল গোপাল মুখার্জি মুখ বুজে প্রণবেশের আক্রমণ সহ্য করেননি, ড্রইংরুম থেকে পালটা একটা বুলেট তিনিও ছুঁড়েছিলেন, 'আর কখনও এ বাড়িতে অনুর সঙ্গে দেখা করতে আসবে না। রাসকেল, নচ্ছার, পাজির পা ঝাড়া—'

রাস্তায় এসে উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাঁটতে শুরু করেছিলেন প্রণবেশ। কোথায়, কোন দিকে যাচ্ছেন জানেন না. একসময় লক্ষ করলেন, ময়দানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে চলে এসেছেন।

কলকাতার ফুসফুসের মতো এই বিশাল মাঠের যেদিকে যতদূর চোখ যায় ঘন সবুজ ঘাসের ভেলভেট বিছানো। ফেব্রুয়ারি শেষ হয়ে এসেছে, ঠাণ্ডাটা হঠাৎ খুব কমে গিয়েছিল। বোঝা যাচ্ছিল সেবারের মতো শীত বিদায় নিচ্ছে। ময়দানের ওপর দিয়ে উতরোল হাওয়া বয়ে যেতে যেতে জানিয়ে দিচ্ছিল ষষ্ঠ ঋতু আসতে দেরি নেই।

পশ্চিম দিকে গঙ্গাব ওপারে সূর্যাস্তের তোড়জোড় চলছিল তখন। আকাশ জুড়ে পাখি উড়ছিল ঝাঁকে ঝাঁকে।

ময়দানে তখন প্রচুর লোকজন। ডালহৌসি, পার্ক স্ট্রিট কি ক্যামাক স্ট্রিটের বিজনেস ডিস্ট্রিক্টগুলোতে যত অফিস, সব ছুটি হয়ে গেছে। চারপাশেব রাস্তাগুলো দিয়ে স্রোতের মতো গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল।

ভিড়টিড় হইচই একেবারেই ভাল লাগছিল না প্রণবেশের। ভিক্টোরিয়াব পাশ দিয়ে রেসকোর্সের কাছে এসে একটু ফাঁকায় গিয়ে বসেছিলেন তিনি। মাথার ভেতরটা তখনও ঝাঁ ঝাঁ করছে, মনে হচ্ছিল ফেটে চৌচিব হয়ে যাবে। জীবনে এমন লাঞ্ছিত আর কখনও হননি। গোপাল মুখার্জি যেন জামা প্যান্ট খুলে উলঙ্গ করে সারা গায়ে কালি মাখিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। প্রতিটি মুহূর্তে টের পাইয়ে দিচ্ছিল তিনি বদ, লুচ্চা,

দুশ্চরিত্র। অভিনন্দন জানাতে যাওয়াটা তাঁর বাজে অজুহাত মাত্র, মাথায় দুরভিসন্ধি পুরে তিনি হরিশ মুখার্জি রোডে হানা দিয়েছিলেন। লোকটা চাপা হুমকি দিয়েছিল, তেমনি বুঝলে প্রণবেশকে ক্রিমিনালদের মতো আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ছাড়বে। অনুরাধা, তাঁর মা এবং ভাইয়ের কাছে কী চমৎকার একখানা ইমেজই না তৈরি করে দিয়েছিল লোকটা!

অবশ্য বিশেষ একটি উদ্দেশ্য নিয়েই প্রণবেশ হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িটায় গিয়েছিলেন। তাই বলে তিনি ক্রিমিনাল? ময়দানের পুরু ঘাসের ওপর বসে থাকতে থাকতে একবার ভেবেছিলেন অনুরাধার চিন্তাটা মাথা থেকে বের করে দেওয়াই ভাল। পরক্ষণেই মনে হয়েছিল, গোপাল মুখার্জির মতো একটা বটতলার উকিলের হুমকিতে তিনি পিছিয়ে যাবেন? সেদিন কলামন্দির-এ গান শোনার পর অদ্ভুত এক আচ্ছন্নতা তাঁকে যেন পেয়ে বসেছিল। অনুরাধাকে তাঁর চাই, নইলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। ময়দানে বসেও তার প্রতিধ্বনিই যেন শোনা গিয়েছিল বুকের ভেতর। অনুরাধাকে যেভাবে হোক পেতেই হবে। অন্তত গোপাল মুখার্জির গালে ভাল রকম একটা থাপ্পড় কষাবার জন্যও এটা জরুরি।

আসলে ছোটবেলা থেকেই ঠাকুরদা বেণীমাধব প্রণবেশের মধ্যে নিজের ইচ্ছা আর স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে একটা একগুঁয়ে, বেপরোয়া জেদও প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। যখনই যা চেয়েছেন তাই পেয়েছেন। মা-বাপ মরা ছেলেটিকে কখনও না বলেননি। অনবরত পেয়ে পেয়ে প্রণবেশের মনে হয়েছে পৃথিবীর অপ্রাপ্য তাঁর কিছু নেই। প্রথম দিনই যেটুকু বোঝা গেছে তাতে এটা পরিষ্কার, অনুরাধাকে পাওয়া সহজ হবে না। তবে যে বাধাই আসুক তিনি চুরমার করে দেবেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে কোনও কিছুই একতরফা হয় না, তাঁর সম্পর্কে অনুরাধারও আগ্রহ থাকা চাই। প্রায় ঘন্টাখানেক ওঁদের বাড়িতে তাঁরা মুখোমুখি বসে থেকেছেন কিন্তু গোপাল মুখার্জির জন্য কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায়নি। ভাইঝিটিরও মাথায় যদি তাঁর কাকার মতো দুশো বছর আগের পর্দানশীন যুগের আত্মা ভর করে থাকে এবং আচমকা বাড়িতে হাজির হওয়ার জন্য যদি তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন? এবার খুব হতাশা বোধ করেছেন প্রণবেশ। অবশ্য বেশিক্ষণ নৈরাশ্যে ডুবে থাকার ধাত তাঁর নয়। তিনি তক্ষুনি স্থির করে ফেলেছিলেন পরদিন ইউনিভার্সিটিতে অনুরাধার সঙ্গে দেখা করবেন। যদি অনুরাধা সেদিন না আসেন, তার পরের দিন, নইলে তারও পরের দিন ধরতে চেষ্টা করবেন। যদি এই ইউনিভার্সিটি থেকে নাম কাটিয়ে তিনি অন্য কোথাও চলে না যান, একদিন না একদিন দেখা হবেই।

পরদিন প্রথম ক্লাসটা ছিল সকালের দিকে, ঠিক দশটায়। তারপর দু পিরিয়ড

অফ। প্রণবেশ ভেবেছিলেন প্রথম ক্লাসটা করেই বাংলা ডিপার্টমেন্টে চলে যাবেন। কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে এসে নিজেদের ডিপার্টমেন্টে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। জীবনের সবচেয়ে পরমাশ্চর্য ঘটনাটি ঘটেছিল সেদিন। তাঁদের বিল্ডিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন অনুরাধা।

কতক্ষণ যে বুকের ভেতর জোরালো কোনও অর্কেস্ট্রা ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটিয়ে গিয়েছিল এতকাল পর আর মনে পড়ে না প্রণবেশের। তাঁর মতো স্মার্ট, ঝকঝকে যুবক কয়েক মিনিট একটি কথাও বলতে পারেননি, শুধু পলকহীন তাকিয়ে ছিলেন।

অনুরাধা ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। হাতজোড় করে বলেছেন, 'নমস্কার। আপনার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছি। আজ যদি ইউনিভার্সিটিতে না আসতেন, আপনার ঠিকানা জোগাড় করে আপনাদের বাড়ি যেতে হত। যাক, দেখাটা হয়ে গেল।'

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে প্রণবেশ বলেছেন, 'কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন?'

'বেশিক্ষণ নয়, মিনিট পনের। আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টে ফোন করে জেনে নিয়েছিলাম আজ আপনাদের ফোর্থ ইয়ারের প্রথম ক্লাসটা রয়েছে আর্লি আওয়ারে। ভাবলাম ক্লাস শুরুর আগেই আপনাকে ধরে ফেলব।'

প্রণবেশ এবার আর কিছু বলেননি। অনুরাধা এরপর কী বলবেন শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলেন।

অনুরাধা বলেছেন, 'কালকের ঘটনার জন্যে আমি ভীষণ লজ্জিত। দয়া করে ক্ষমা করবেন।' তাঁকে খুব কুণ্ঠিত দেখাচ্ছিল।

প্রণবেশ বিব্রত বোধ করেছিলেন। বলেছেন, 'প্লিজ, ক্ষমার কথা বলবেন না। আপনি তো আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি।'

এদিকে আর্কিটেকচারের ছাত্রছাত্রীরা আসতে শুরু করেছিল কলামন্দির-এ দারুণ গাওয়ার কারণে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন অনুরাধা। প্রণবেশের সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে দেখে সবাই উৎসুক চোখে তাকাতে তাকাতে ডিপার্টমেন্টের ভেতরে চলে যাচ্ছিল, শুধু শৈবাল ছাড়া। তার এই সহপাঠীটি মারাত্মক ফাজিল। তার মাথায় সারাক্ষণ হাজার রকমের বজ্জাতির চাষ চলে। সঙ্কোচ টঙ্কোচ বলে কোনও ব্যাপার তার স্বভাবে নেই। একেবারে দু-কান কাটা, মুখে কিছুই আটকায় না। মেয়েদের সম্বন্ধে এমন সব চটকদার কথা বলে, যেগুলোর ভেতর দিয়ে সেক্সের ঝাঁঝ বেরিয়ে আসে। শুনলে কান ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে একচোখ টিপে নিঃশব্দে শৈবাল এমন ইঙ্গিত করছিল যা

প্রায় অশ্লীলতার কাছাকাছি। অনুরাধার নজরে যাতে না পড়ে সেজন্য তাঁকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন প্রণবেশ কিন্তু শৈবালকে বিশ্বাস নেই, যে কোনও মুহূর্তে সে এমন বাড়াবাড়ি বাধিয়ে দিতে পারে যাতে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। এ ধরনের একটা বাজে টাইপের ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণে অনুরাধা হয়তো জীবনে কখনও তাঁর মুখদর্শন করতে চাইবেন না।

বিপন্ন প্রণবেশ চোখের কোণ দিয়ে শৈবালের দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন। অনুরাধা আবার কী যেন বলতে যাবেন, তার আগেই হঠাৎ চাপা গলায় তিনি বলেছেন, 'কিছু যদি মনে না করেন, একটা অনুরোধ করব।'

'কী অনুরোধ?'

'এখানে দাঁড়িয়ে কথা না বলে, অন্য কোথাও যদি—' বলতে বলতে থেমে গেছেন প্রণবেশ।

অনুরাধার ঠোঁটের প্রান্তে আবছা একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, সেই ভাল। আপনার এক বন্ধু আমাদের ওপর বোধহয় নজর রাখছে।'

অস্বস্তি বেড়ে গিয়েছিল প্রণবেশের। সমস্ত শরীর দিয়েও শৈবালকে আড়াল করা যায়নি। অনুরাধা তাকে ঠিকই দেখে ফেলেছিলেন। প্রণবেশ কোনওরকমে বলেছিলেন, 'চলুন, ওই মাঠে গিয়ে বসা যাক। অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে—'

ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের ভেতর পাশাপাশি যে একজোড়া খেলার মাঠ আছে, সকালের দিকে সেগুলো ফাঁকাই পড়ে থাকে। কেননা এ সময়টা খুব কম ডিপার্টমেন্টের ক্লাস শুরু হয়। যে ছেলেমেয়েরা এখন আসে তারা সোজাসুজি নিজেদের ক্লাসরুমে চলে যায়। অবশ্য বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়কে আর চেনা যায় না, চারদিক গম গম করতে থাকে। তখন সব ডিপার্টমেন্টেই পড়াশোনা শুরু হয়ে যায়। তবে সমস্ত বিভাগের ক্লাস তো একসঙ্গে পর পর হয় না, মাঝে মাঝে একটা দুটো অফ পিরিয়ড সবারই থাকে। তখন ছেলেমেয়েরা ঝাঁকে ঝাঁকে স্টুডেন্টস কমন রুম, ক্যান্টিন বা স্পোর্টস গ্রাউন্ডে চলে যায়। নিরিবিলিতে বসার মতো ফাঁকা জায়গা কোথাও পড়ে থাকে না।

অনুরাধা বেশ অবাক হয়ে বলেছেন, 'এখন মাঠে যাবেন! আপনার ক্লাস আছে না?'

প্রণবেশ বলেছিলেন, 'একটা ক্লাস না করলেও অসুবিধে হবে না। পরে বন্ধুদের কাছ থেকে প্রফেসর যে নোট দেবেন, নিয়ে নেব।'

'প্লিজ—'

'কী?'

'ক্লাস না করাটা ঠিক নয়। আমি ফুটবল গ্রাউন্ডের কাছে আপনার জন্যে ওয়েট করব। যান, ক্লাসে যান—' বলে আর দাঁড়াননি অনুরাধা, সোজা জোড়া মাঠের দিকে চলে গিয়েছিলেন।

অনুরাধাকে দেখে বা তাঁর সঙ্গে কথা বলে প্রথমে যা মনে হবে তা হল মেয়েটা ভারি নরম। তাঁর স্নিগ্ধ, অনুচ্চ কণ্ঠস্বর কখনও একটা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে ওপরে ওঠে না। কিন্তু বাইরে এই কোমলতার কয়েক স্তর নিচে কোথায় যেন অনমনীয় একটা দৃঢ়তা রয়েছে যা অমান্য করা অসম্ভব। কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে প্রণবেশ তাঁদের ডিপার্টমেন্টের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

শৈবাল তখনও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। প্রণবেশ কাছাকাছি আসতেই তাঁকে আর অনুরাধাকে জড়িয়ে মুখের ওপর একটা চটচটে টিপ্পনী ছুঁড়ে দিয়েছিল। তার উত্তরে তিনি কী বলেছিলেন, এতকাল বাদে আর মনে নেই।

প্রথম ক্লাসটা সেদিন তিনি করেছিলেন ঠিকই কিন্তু অধ্যাপক স্থাপত্যের সূক্ষ্ম-জটিল তত্ত্ব সম্পর্কে একটানা কী বলে গিয়েছিলেন, তার একটি বর্ণও তাঁর মাথায় ঢোকেনি।

ক্লাসটা শেষ হওয়া মাত্র প্রণবেশ ছুটেছিলেন ফুটবল গ্রাউন্ডের দিকে। সেখানে একধারে একটা ঝাড়ালো রেন-ট্রির তলায় তাঁর জন্য বসে ছিলেন অনুরাধা। প্রণবেশকে দেখে বলেছিলেন, 'বসুন—'

মাঝখানে খানিকটা দূরত্ব রেখে ধীরে ধীরে বসে পড়েছেন প্রণবেশ।

অনুরাধা এবার বলেছেন, 'কাল প্রথম দিন আমাদের বাড়িতে গেলেন, কাকা যে ওরকম বিশ্রী কাণ্ড করে বসবে, ভাবতে পারিনি। আপনার নিশ্চয়ই ধারণা হয়েছে আমরা খুব অভদ্র।'

অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন প্রণবেশ। বিব্রতভাবে বলেছেন, 'না না, তা কেন? আমি কি সে কথা একবারও বলেছি?'

অনুরাধা যেন শুনতে পাননি, নিজের ঝোঁকেই বলে গেছেন, 'আসলে পাশাপাশি থাকলেও কাকা রোজ আমাদের বাড়ি আসে না। সেদিন হঠাৎ একটা বিশেষ দরকারে চলে এসেছিল, আর আপনিও সেই সময় গেছেন। ফলে—'

প্রণবেশ বলেছেন, 'দেখুন, আপনাদের বাড়ি যাওয়ার চিন্তাটা আগে আমার মাথায় ছিল না। পরশু গান শোনার পর মনে হয়েছিল আপনার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। কাল ইউনিভার্সিটিতে এসে অনেক খোঁজ করলাম কিন্তু আপনাকে পাওয়া

গেল না। অথচ—'

প্রণবেশের কথার মধ্যে অনুরাধা বলে উঠেছেন, 'কাল আমার শরীরটা ভাল ছিল না, তাই ইউনিভার্সিটিতে আসিনি।'

প্রণবেশ এবার বলেছেন, 'আপনাকে অভিনন্দন জানাবার ইচ্ছাটা হঠাৎ এমন পেয়ে বসল যে একজনের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে হরিশ মুখার্জি রোডে ছুটলাম। আপনার কাকাকে দেখার পর মনে হয়েছিল যাওয়াটা ঠিক হয়নি। কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না।'

অনুরাধা উত্তর দেননি।

প্রণবেশ জিজ্ঞেস করেছেন, 'গোপালবাবু কি আপনাদের গার্ডিয়ান?'

অনুরাধা একটু চুপ করে থেকে বলেছেন, 'অনেকটা তাই। আমাদের বাবা নেই তো।'

তাঁদের ডিপার্টমেন্টের সামনে অনুরাধার সঙ্গে কথা বলার পর প্রণবেশ ভেবেছিলেন আগের দিনের অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা আর তুলবেন না। কিন্তু গোপাল মুখার্জির হুমকি আর খোঁচা-মারা কথাগুলো একেবারেই ভুলতে পারছিলেন না, ভেতরে ভেতরে সেগুলো সমানে উসকে যাচ্ছিল। খানিকটা নিজের অজান্তেই তিনি বলেছেন, 'রাগ করবেন না, আপনার কাকা বোধহয় নাইনটিনথ সেঞ্চুরির পর্দাপ্রথা ট্রথা আবার ফিরিয়ে আনতে চান।'

অনুরাধা খুব শান্ত গলায় বলেছেন, 'সবাই তো একরকম হয় না। কেউ কেউ একটু বেশি রক্ষণশীল হতেই পারে।'

নিজেব কাকা সম্বন্ধে, তা তিনি যেমনই হন, বাইরের কেউ কটু মন্তব্য করে, সেটা বোধহয় চাননি অনুরাধা। বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলেন প্রণবেশ। বলেছেন, 'না না, আমি এমনই মজা করছিলাম। লেট আস ফরগেট দ্যাট চ্যাপ্টার।'

তিনি ভুলে যেতে চাইলে কী হবে, অনুরাধা কিন্তু আগের দিনের ব্যাপারটা সহজে ছেড়ে দেননি। বলেছেন, 'কাল আপনি অসম্মানিত হয়ে আমাদের বাড়ি থেকে চলে এসেছিলেন। মায়ের, দাদার আর আমার কী খারাপ যে লেগেছে বলে বোঝাতে পারব না। মা আর দাদা কাল বলে রেখেছিল, আজ ইউনিভার্সিটিতে এসেই যেন আপনার সঙ্গে দেখা করে আমাদের ফ্যামিলির পক্ষ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিই। আশা করি, আপনি মনে কোনও ক্ষোভ রাখবেন না।'

দুই হাতের তালু উলটে দিয়ে, মুখেচোখে নিরুপায় ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলেছিলেন প্রণবেশ। বলেছেন, 'প্লিজ, এই আলোচনাটা বন্ধ থাক। বিশ্বাস করুন, আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। এবার আপনার কথা শুনব—'

রীতিমত অবাক হয়ে অনুরাধা বলেছেন, 'আমার আবার কী কথা!'

'এই যে পরশু কলামন্দির-এ এত সুন্দর গাইলেন, নিশ্চয়ই বড় কোনও রবীন্দ্রসঙ্গীত ট্রেনারের কাছে গান শিখেছেন।'

'একেবারেই না।'

'মানে?'

'গানের জগতে আমার আইডল হচ্ছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর সুচিত্রা মিত্র। তাঁদের গান শুনে শুনে যেটুকু পেরেছি শিখেছি। সেলফ-টট, মনে স্বয়ং-শিক্ষিত বলতে পারেন।' বলে একটু হেসেছেন অনুরাধা।

অপার বিস্ময়ে অনেকক্ষণ অনুরাধাব দিকে তাকিয়ে থেকেছেন প্রণবেশ। তারপর বলেছেন, 'শুনে শুনে এরকম শেখা যায়! আমি তো ভেবেছিলাম অনেক বছর ট্রেনিং নেওয়ার পর ফাংশানে গাইতে উঠেছেন। রিয়ালি আপনি জিনিয়াস।'

মুখ লাল হয়ে উঠেছিল অনুরাধার। চোখ নামিয়ে বলেছেন, 'দয়া করে এসব বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না।' পরক্ষণে বাঁ হাতের ঘড়িটার দিকে নজর পড়তেই ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়েছেন, 'আচ্ছা, এবার আমি চলি—'

আগে অনুরাধার মতো বিস্ময়কর কোনও তরুণীর এত কাছে বসে এতটা সময় কথা বলেননি প্রণবেশ। এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে একবার খানিকটা রাম খেয়েছিলেন, নেশার ঘোরে কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো লেগেছিল তাঁব। অনুরাধার সামনে সেদিন ঠিক তেমনিই মনে হচ্ছিল। তীব্র নিখাদে মাথার ভেতর কোথায় যেন তারসানাই বেজে যাচ্ছিল একটানা। বলেছিলেন, 'এখনই যাবেন? বসুন না আরেকটু—'

অনুরাধা বলেছিলেন, 'না না, আমার ক্লাসের সময় হয়ে গেছে। নমস্কার—' বলতে বলতে মাঠের ধারেব রাস্তা দিযে বেঙ্গলি ডিপার্টমেন্টের দিকে হাঁটতে শুরু করেছিলেন।

প্রণবেশও উঠে পড়েছিলেন। অনুরাধার পাশাপাশি চলতে চলতে বলেছেন, 'একটা কথা জানার ইচ্ছা হচ্ছে—'

'বলুন—'

'গোপাল মুখার্জির ভাইঝিটি কি তাঁর কাকার মতোই কনজারভেটিভ?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

'ধরুন নির্দোষ কৌতূহল।'

কিছু একটা আন্দাজ করে নিয়ে অনুরাধা নিচু গলায় বলেছিলেন, 'নির্দোষ বোধ হয় নয়।' একটু থেমে বলেছেন, 'কাকার মতো হলে কি ইউনিভার্সিটিতে ছেলেদের সঙ্গে ক্লাস করতে আসতাম? তবে—'

প্রণবেশ জিজ্ঞেস করেছেন, 'তবে কী?'

'আমাদের পারিবারিক কিছু 'ডুজ' আর 'ডোন্টস' আছে। আমার অভিভাবকরা অনাত্মীয় ছেলেদের সঙ্গে অকারণে মেলামেশা একেবারেই পছন্দ করেন না। মিশলেও একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত। এখনকার দিনে সোসাইটির অনেক পুরনো দেওয়াল যখন ভেঙে পড়ছে তখন এটাকে কেউ কেউ বাজে সংস্কার মনে করতে পারে। কিন্তু—'

'কী?'

'পারিবারিক এই ব্যাপারটা আমার মধ্যেও অনেকখানি রয়ে গেছে। এর জন্যে অনেকেই হয়তো বলবেন আমি খুব মডার্ন বা প্রোগ্রেসিভ নই, কনজারভেটিজমের বাতিক আমার কাঁধে চেপে আছে। যে যা খুশি বলুক, আমি লজ্জিত নই।'

মরিয়া হয়ে প্রণবেশ বলেছেন, 'আর কি আমাদের দেখা হবে না?'

অনুরাধা বলেছেন, 'একই ক্যাম্পাসে রোজ দু'জনকে আসতে হয়। দেখা তো হতেই পারে। কিন্তু আলাদাভাবে দেখা হওয়ার প্রয়োজন নেই।'

ওঁরা বেঙ্গলি ডিপার্টমেন্টের কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। প্রণবেশকে উত্তর দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে আচমকা চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছেন অনুরাধা এবং তাঁদের বিভাগের চারতলা বিল্ডিংটার ভেতর দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

বিমূঢ়ের মতো বাইরের রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন প্রণবেশ। তাঁর মধ্যে হঠাৎ একটা বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল যেন। অনুরাধাকে পেতে গেলে ওঁদের ফ্যামিলি, বিশেষ করে আলিপুরের সেই দুর্ধর্ষ ঘাঘী উকিলটিব সঙ্গে কয়েক রাউন্ড লড়াই যে চালাতে হবে, তা তিনি জানতেন। সে জন্য নিখুঁত রণকৌশল তৈরির কথাও আবছাভাবে ভেবেছিলেন কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বড় বাধাটা আসতে পারে অনুরাধাব দিক থেকে। রক্ষণশীলতার যে উত্তরাধিকার তাঁর রক্তে শিকড় ছড়িয়ে রেখেছে তা টেনে তোলা আদৌ সহজ নয়। ক্লান্ত, হতাশ, প্রায় বিপর্যস্ত প্রণবেশ এলোমেলো পা ফেলে এক সময় তাঁদের ডিপার্টমেন্টে ফিরে গিয়েছিলেন সেদিন।

অনুরাধা জানিয়ে দিয়েছিলেন আলাদা করে দেখা হওয়ার প্রয়োজন নেই। অযাচিতভাবে প্রণবেশ তাঁদের বাড়ি গিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছেন, সে জন্য বিব্রত অনুরাধা তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। এখানেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু যৌবন এমন এক ম্যাজিক যা প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনের ধাব ধারে না, পুরনো সব সংস্কার তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়। কাজেই আবার তাঁদের দেখা হয়েছিল। ক্যাম্পাসের ভেতরে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখা নয়, অনুরাধার ক্লাস কখন শেষ হবে, আগে থেকে খবর নিয়ে ওদের বিল্ডিংটার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন প্রণবেশ। এমনকি তখন

নিজের ক্লাস থাকলেও করতেন না।

প্রথম দিকে প্রণবেশকে দেখেও দেখতেন না অনুরাধা, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে ঝাঁক বেঁধে বড় রাস্তায় গিয়ে মিনিবাস টাসে উঠে পড়তেন। এভাবে দেড় দু'মাস কাটার পর হঠাৎ একদিন কাছে এসে অনুরাধা চাপা গলায় বলেছিলেন, 'রোজ আপনি এখানে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন?'

প্রণবেশ হেসে হেসে বলেছেন, 'আমাব ধৈর্য কতটা তার টেস্ট নিচ্ছি।'

'আমার ভীষণ অস্বস্তি হয়। বন্ধুবা আজে বাজে কমেন্ট করে—'

'আমি এখানে দাঁড়াতে চাই না, যদি—'

'যদি কী?'

'ইউনিভার্সিটিব বাইবে কোথাও আমাদেব দেখা হয়।'

'অসম্ভব।'

অনুরাধার আপত্তিও কিন্তু খুব বেশিদিন বজায় থাকেনি, কবে যে তাঁর সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে গিয়েছিল, আর পুবনো রক্ষণশীলতা ফিকে হতে হতে রক্তের প্রবাহ থেকে একেবাবে মুছে গেছে, দু'জনেব কেউ টেব পাননি। গোড়ার দিকে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে তাঁবা খুব বেশি দূব যেতেন না। চেনা লোকজনের চোখে যাতে পড়ে না যান তাই ভরদুপুরে খুব সাদামাঠা রেস্তোরাঁর পর্দা-ঢাকা কেবিনে বা ছোটখাটো অখ্যাত পার্কে কিংবা নির্জন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের মাঝখানে গিয়ে বসতেন। গঙ্গাব ধার, লেক, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, অর্থাৎ যে সব জায়গায় ভিড় টিড় বেশি, পাবতপক্ষে সে সব দিকের পথ মাড়াতেন না। ঠাকুরদার আমলের একটা পুরনো অস্টিন ছিল প্রণবেশের। সাহস কিঞ্চিৎ বাড়লে অনুরাধাকে সেটায় তুলে ডাযমণ্ডহাববার রোড বা বিটি বোড ধবে অনেকদূর ঘুরে আসতেন।

দু'জনের এই বোমান্সেব পর্বটা খুবই মামুলি, বৈচিত্র্যহীন, এর ভেতর উদ্ভাবনী ব্যাপার কিছু ছিল না। তাঁদেব আগে বা পবে লক্ষ লক্ষ প্রেমিক-প্রেমিকা বাঁধা ফর্মুলায় লুকিয়ে-চুবিয়ে যেভাবে এগিয়ে গেছে তাঁবাও তা-ই তা-ই করেছেন।

এব ভেতব অনুরাধাদেব বাড়িব কথা জানা হয়ে গিয়েছিল প্রণবেশের। অত্যন্ত সাধারণ ইতিহাস। মা, দাদা আব অনুবাধাকে নিয়ে তাঁদের ছোট সংসার। তাঁর যখন তেরো বছব তখন এক স্টিভেডোর কোম্পানিব বড়বাবু বাবা মাত্র একান্ন বছব বয়সে খুব খারাপ ধরনের জন্ডিসে মারা যান। সতেব বছবেব দাদা অবনীশ সেবাব স্কুল ফাইনাল সবে পাস করেছে। হবিশ মুখার্জি বোডেব পুবনো বাড়িটা ছিল বলে বাস্তায় গিয়ে আব দাঁড়াতে হয়নি। বাবার অফিস থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটি বাবদ যে কয়েক হাজার টাকা পাওযা গিয়েছিল তাই দিয়ে পবের চারটে বছর কোনওরকমে

টিকে ছিলেন তাঁরা। পাশের বাড়িতে কাকা গোপাল মুখার্জিরা বরাবরই আছেন। তিনি অনুরাধাদের কোনও দায়দায়িত্ব কখনও নেননি, তবে খবরদারি মাতব্বরি সব সময় করে গেছেন। অনুরাধাদের সঞ্চয় যখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, গোটা সংসার নিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যতের মুখে, সেই সময় বি. এ পাস করে, কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে ক্লার্কের চাকরি পেয়ে গেছেন অবনীশ। সংসারটা মুখ থুবড়ে পড়ার আগেই ফের খাড়া হয়ে গিয়েছিল। প্রচুর পয়সাও যেমন তাঁদের নেই, আবার অভাবও নেই। দাদার সরকারি চাকরি তাঁদের একশ ভাগ নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়েছিল। মিডল ক্লাস পরিবারে যেমন হয়, মাঝারি মাপের সুখ এবং আনন্দ নিয়ে তাঁরা মোটামুটি খুশিই ছিলেন।

কলামন্দির-এ যে গান শুনে প্রণবেশ অনুরাধার কাছে ছুটে গিয়েছিলেন তা নিয়েও অনেক কথা হয়েছে। প্রণবেশ চেয়েছিলেন, গানটা আরও ভাল করে শিখুন অনুরাধা। এটা নিছক শখের ব্যাপার নয়, তাঁর গলায় যে অপার্থিব জাদু রয়েছে সেটা সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে সারা দেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে ছ'মাসও লাগবে না। গায়িকা হিসেবে চমকে দেওয়ার মতো কেরিয়ারও তৈরি হয়ে যাবে।

কিন্তু গানের ব্যাপারে আদৌ উচ্চাশা ছিল না অনুরাধার। তিনি জানিয়েছিলেন, বন্ধুরা জোরজার করেছে বলেই ঝোঁকের মাথায় কলামন্দির-এ গাইতে উঠেছিলেন। আসলে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য বি. এ এবং তারপর এম. এ-তে ভাল রেজাল্ট করা।

এভাবে দুটো বছর কেটে গিয়েছিল। তার মধ্যে বি. এ'টা মোটামুটি ভালভাবেই পাস করেছিলেন অনুরাধা— সেকেন্ড ক্লাস থার্ড। প্রণবেশেরও ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছিল। চোখ-ধাঁধানো রেজাল্ট করেছিলেন তিনি—ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।

এই সময় একদিন প্রণবেশ বলেছিলেন, 'লাস্ট দু বছরে কলকাতার সব রাস্তা, পার্ক আর রেস্তোরাঁর অ্যাড্রেস মুখস্ত হয়ে গেছে। ডায়মণ্ডহারবার আর ব্যারাকপুরের গঙ্গার ঘাটে যত বার গেছি, অ্যাড করলে দশ হাজার কিলোমিটার হয়ে যাবে। এবার আমাদের একটা ডিসিসন নেওয়া দরকার।'

ইঙ্গিতটা যে অনুরাধা বোঝেননি তা নয়। তবু জিজ্ঞেস করেছেন, 'কিসের ডিসিসন?'

'সে তো তুমি জানোই। ভাবছি দু-চারদিনের ভেতর তোমাদের বাড়ি যাব।'

সেই যে কলামন্দির-এ গান শুনে অভিনন্দন জানাতে প্রণবেশ হরিশ মুখার্জি রোডে ছুটে গিয়েছিলেন, তারপর আর ওধার মাড়াননি। অনুরাধা চমকে উঠে বলেছেন, 'না না, যেতে হবে না।'

অবাক হয়ে প্রণবেশ বলেছেন, 'বা রে, আমরা বিয়ে করব। তোমার মা আর

দাদাকে জানাতে হবে না? তাঁদের তো সব অ্যারেঞ্জ করার জন্যে সময় দিতে হবে।'

'ইম্পসিবল—'

'মানে?'

'মা বা দাদা কেউ এ বিয়েতে রাজি হবে না। তা ছাড়া আত্মীয়স্বজনরা রয়েছে। তারা—'

'তারা কী?'

অনুরাধা উত্তর দেননি।

হঠাৎ প্রণবেশের মনে হয়েছে অনুরাধারা মুখার্জি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আর তাঁরা কায়স্থ। আজকাল এ সব নিয়ে খুব একটা কড়াকড়ি নেই, জাতটাতের ব্যাপারে লোকে তেমন মাথা ঘামায় না কিন্তু তিরিশ বছর আগে সোসাইটি এত উদার হয়ে যায়নি, বামুন-কায়েতের বিয়েটা সামাজিক ট্যাবু হিসেবে ধরা হত, বিশেষ করে অনুরাধাদের মতো গোঁড়া রক্ষণশীল পরিবারে। প্রণবেশ বলেছেন, 'আমরা নন-ব্রাহ্মিণ, সেই জন্যে নিশ্চয়ই?'

আস্তে মাথা হেলিয়েছেন অনুরাধা। বলেছেন, 'হ্যাঁ। সেটা খুব বড় প্রবলেম।' একটু চুপ করে থেকে কী ভেবে আবার বলেছেন, 'এত তাড়া কিসের? পরে ও সব ভাবা যাবে। আমি এম. এ টা পাস করি, তুমি চাকরি বাকরি পাও—'

'চাকরি মানে তো পরের স্লেভারি। ও আমার ধাতে পোষাবে না। আমি নিজের ফার্ম খুলব।'

'বেশ তো, তাই খোল। এর মধ্যে দেখা যাক সলিউসান কিছু বার করা যায় কিনা—'

প্রণবেশ জানতেন, এ বিয়েতে একশ ভাগ রাজি অনুরাধা। সে জন্য দু বছর ধরে মনে মনে প্রস্তুতিও নিয়েছেন। নিজের দিক থেকে বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকলে তাঁর সঙ্গে কিছুতেই এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন না। কিন্তু অনুরাধা ভীষণ নরম, দুর্বল এবং ভীরু। পারিবারিক বিপ্লব ঘটানোর মতো জোর বা সাহস তাঁর মধ্যে কোনওটাই নেই। আরও দু চার বছর কেন, সারা জীবন অপেক্ষা করলেও মুখ ফুটে মা বা দাদার কাছে বিয়ের কথাটা কোনওদিনই বলতে পারবেন না। কাজেই যা করার প্রণবেশকেই করতে হবে। তিনি বলেছিলেন, 'আমার কাছে এখন টপ প্রায়োরিটি হল তোমাকে বিয়ে করা।'

অনুরাধা বলেছেন, 'কিন্তু—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে প্রণবেশ বলেছিলেন, 'গ্র্যাজুয়েট যখন হয়েছ তখন নিশ্চয় তুমি অ্যাডাল্ট—আই মিন সাবালিকা। তোমার একজাক্ট বয়েস কত?'

বিমূঢ়ের মতো অনুরাধা বলেছেন, 'তেইশ। কেন?'

'ফাইন। নিজের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার রাইট তোমার হয়ে গেছে। এবার আমি যা বলব চুপচাপ তাই করে যাবে।'

'কী করতে বলবে?'

'কয়েকটা দিন ওয়েট কর—'

ঠিক দু সপ্তাহের মাথায় প্রণবেশ একটা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে নিয়ে গিয়েছিলেন অনুরাধাকে। হতচকিত অনুবাধা শ্বাসরুদ্ধের মতো জিজ্ঞেস করেছেন, 'এখানে কেন?'

হেসে হেসে প্রণবেশ বলেছেন, 'ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে কেউ পক্সের টিকা নিতে আসে না। যে জন্যে আসে ঠিক সেই কারণে আমরাও এসেছি।' একটু থেমে আবার বলেছিলেন, 'তোমার মধ্যে সোসাল রিবেল হওয়ার মতো বেসিক ইনস্টিংক্ট নেই, তাই ধরে নিয়ে আসতে হল।'

এরপর বিয়ের নোটিশ দিয়েছিলেন প্রণবেশ। পাশে দাঁড়িয়ে গল গল করে ঘামতে ঘামতে আচ্ছন্নের মতো শুধু তাকিয়ে থেকেছেন অনুরাধা। ঘটনাটা এমনই আকস্মিক এবং অভাবনীয় যে বাধা দেওয়ার মতো শক্তি তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি, কিন্তু গলায় স্বর ফোটেনি।

তারপর একমাসের মধ্যে বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল। ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে বেবিয়ে প্রণবেশ বলেছিলেন, 'চল, এবার তোমাদের বাড়ি যাওয়া যাক।'

অনুরাধা আঁতকে উঠেছেন। শঙ্কাতুর গলায় বলেছেন, 'কেন?'

'বা রে, আমাদের বিয়ে হল। অন্তত এটুকু তো তোমার দাদা, মা আর আত্মীয় স্বজনদের জানা উচিত।'

'এখন জানাজানির দবকার নেই।'

'না জানলে আমবা একসঙ্গে থাকব কী করে?'

অনুরাধা হকচকিযে গিয়েছিলেন, 'একসঙ্গে থাকব মানে?'

প্রণবেশ বলেছেন, 'বা, আমরা এখন আর স্রেফ প্রেমিক-প্রেমিকা নই, লিগ্যালি স্বামী-স্ত্রী। তুমি থাকবে হরিশ মুখার্জি রোডে আর আমি কেয়াতলায়, তা হতে পারে না।'

আজন্মের ভীরুতা কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না অনুরাধা। তিনি বলেছিলেন, আপাতত আগেব মতো দু'জনে দু জায়গায় থাকবেন। তারপর সুবিধামতো বাড়িতে জানানো যেতে পারে।

কিন্তু প্রণবেশ রাজি হননি। বলেছেন, 'তা ছাড়া আর একটা ব্যাপার আছে। তুমি

বাড়ির একমাত্র মেয়ে, আমি একমাত্র ছেলে। বিয়ে হল, একটা জমকালো ফাংশান তো করতেই হবে।'

'ওসব এখন থাক।'

'একেবারেই না।'

একরকম জোর করেই তাঁদের সেই পুরনো অস্টিনটায় অনুরাধাকে তুলে সোজা হরিশ মুখার্জি রোডে চলে গিয়েছিলেন প্রণবেশ। অনুরাধাদের বাড়িতে ঢোকার আগে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'চল, প্রথমে তোমার কাকাকে খবরটা দিয়ে যাই।' খুব সম্ভব দু বছর আগের সেই তিক্ততার স্মৃতি তিনি ভুলতে পারেননি।

অনুরাধা যেতে চাননি কিন্তু এবারও জোর খাটিয়েছেন প্রণবেশ, তাঁর একটা হাত ধরে একরকম টানতে টানতে পাশের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। তখন সন্ধে নেমে গেছে। কোর্ট থেকে ফিরে পোশাক পালটে গোপাল মুখার্জি তাঁর চেম্বারে বসে চা খাচ্ছিলেন। প্রণবেশদের দেখে তাঁর শিরদাঁড়া টান টান হয়ে গিয়েছিল।

প্রণবেশ বলেছেন, 'আমাকে চিনতে পারছেন?'

গোপাল মুখার্জি উত্তর দেননি, তাঁর পাঁশুটে রঙের ঘন ভুরু দুটো শুধু কুঁচকে গিয়েছিল।

হেসে হেসে প্রণবেশ ফের বলেছেন, 'দু বছর আগে আপনার ভাইঝির একজন উটকো ফ্যান হিসেবে দুম করে চলে এসেছিলাম। আজ এসেছি আপনাদের জামাই হিসেবে। অনুরাধাকে আমি ঘন্টাদেড়েক আগে বিয়ে করেছি। শুভ কাজটা শেষ করেই ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে সোজা এখানে চলে এলাম। আশা করি আপনার আশীর্বাদ পাব।'

গোপাল মুখার্জি এবারও কিছু বলেননি। তাঁর চোয়াল দুটো শুধু নড়ছিল, আর দাঁতে দাঁত ঘষার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল।

প্রণবেশ থামেননি, 'আপনার ভাইঝি সাবালিকা, তেইশ বছর বয়েস। তাকে ফুসলে নিয়ে যাইনি। নিজের ইচ্ছায়, সুস্থ মস্তিষ্কে এবং কারও বিনা প্ররোচনায় সে আমাকে বিয়ে করেছে। জিজ্ঞেস করে দেখুন, তার ওপর এতটুকু বলপ্রয়োগ করা হয়নি। বুঝতেই পারছেন, ইন্ডিয়ান পেনাল কোড আমার চুলের ডগাও ছুঁতে পারবে না। আচ্ছা চলি—' বলে আর দাঁড়াননি, অনুরাধাকে নিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

আর পেছনে বাকদের স্তূপ হয়ে বসে ছিলেন গোপাল মুখার্জি।

অনুরাধাদের বাড়িতে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল আরেক রকম। সব শোনার পর তাঁর বিধবা মা মুখে আঁচল গুঁজে সমানে কেঁদে যাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল এত বড় শোক-

সংবাদ আর কখনও পাননি। জীবনের একটা অত্যন্ত দামী ঐশ্বর্য যেন তাঁর খোয়া গেছে। মহিলাটিকে দেখতে দেখতে ভীষণ খারাপ লেগেছিল প্রণবেশের। হয়তো কিছুটা অপরাধবোধও তাঁকে ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে দিচ্ছিল। অনুরাধার মা যে এতটা ভেঙে পড়বেন ভাবা যায়নি।

আর অবনীশ প্রচণ্ড ধাক্কায় একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। বিস্ময়, আক্রোশ, তীব্র অস্থিরতা, বিদ্বেষ—সব একাকার হয়ে তাঁর মুখের ওপর কত ধরনের রং যে ফুটিয়ে তুলছিল! কাকা গোপাল মুখার্জি বা মায়ের মতো তিনিও একটি কথা বলেননি, শুধু পলকহীন তাকিয়ে থেকেছেন। মনে হচ্ছিল তাঁর চোখ ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে।

সেদিন কখন অনুরাধাকে নিয়ে ফের তাঁদের অস্টিন গাড়িটায় উঠেছিলেন, এত বছর বাদে আর মনে পড়ে না। তবে কেয়াতলায় ফেরার পথে সারাটা পথ একটানা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিলেন অনুরাধা। তাঁর পিঠে একটি হাত রেখে নরম, আর্দ্র স্বরে প্রণবেশ বলেছেন, 'কেঁদো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কান্না থামেনি অনুরাধার বরং আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।

বিয়েটা লুকিয়ে চুরিয়ে, কাউকে না জানিয়ে চোরের মতো সারলেও, বৌভাতের ব্যাপারে কিন্তু তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিলেন প্রণবেশ। কলকাতার সব চেয়ে দামী ডেকরেটরকে দিয়ে গোটা ছাদ জুড়ে চমৎকার প্যান্ডেল করিয়েছিলেন। সারা বাড়ি ফুল পাতা আর অজস্র আলোয় সাজানো হয়েছিল। অতিথিদের খাওয়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পার্ক স্ট্রিটের এক নাম-করা ক্যাটারারকে। গেটের সামনে জোড়া নহবত বসিয়ে চিৎপুর থেকে বায়না করে এনেছিলেন শহরের সেরা সানাইওলাদের। ভোর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত পালা করে বাজিয়ে বাজিয়ে তারা রঙিন স্বপ্নের আবহাওয়া তৈরি করে দিয়েছিল।

আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ইউনিভার্সিটিতে আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপকরা—সবাইকেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন প্রণবেশ। অনুরাধার মা আর দাদাকে তো বটেই, স্ত্রীর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে তার আত্মীয়দের, এমনকি আলিপুরের ঝানু উকিল গোপাল মুখার্জির বাড়িতে গিয়ে নিজে নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে এসেছেন। কিন্তু অবনীশ ছাড়া অনুরাধাদের দিক থেকে আর কেউ বৌভাতে আসেনি। অবনীশও বেশিক্ষণ থাকেননি, হাজার অনুরোধেও এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খাননি, বোনকে কিছু গয়নাগাটি দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

অনুরাধা ছিলেন প্রণবেশের কাছে এক দুর্লভ ট্রফির মতো। অসীম ধৈর্য ধরে সূক্ষ্ম রণকৌশলে ট্রফিটা জিতে নেওয়ার পর এবার তাঁর নজর গিয়েছিল কেরিয়ার তৈরির

দিকে। কেয়াতলায় নিজেদের বাড়ির একতলায় একদিন হই হই করে অফিস খুলে ফেললেন তিনি। ইংরেজি, বাংলা এবং হিন্দি তিন ভাষার তিনটে 'লার্জেস্ট সার্কুলেটেড' খবরের কাগজে তিন কলম জুড়ে বিজ্ঞাপন বেরুল। অফিস খোলার দিন সাংবাদিকদের নেমন্তন্ন করে এনে একটা প্রেস কনফারেন্স করলেন, রাত্তিরে ভাল রেস্তোরাঁয় তাদের ডিনার খাওয়ালেন। প্রণবেশ গোড়া থেকেই জানতেন, এটা প্রচারের যুগ। ভাল পাবলিসিটি না হলে লোকের নজর কাড়া যাবে না। ডিনার এবং সাংবাদিক সম্মেলনের নগদ কিছু রেজাল্ট পাওয়া গেল। পরদিন প্রণবেশের অফিসের ছবিটবি দিয়ে কাগজগুলোতে ভাল রাইট-আপ বেরুল। কিন্তু ওই পর্যন্ত। দু-একটা ছোট বা মাঝারি বাড়ির ডিজাইন ছাড়া তেমন কাজ পাওয়া গেল না।

অথচ প্রণবেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। তাঁর কাছে এই ব্যাপারটা যাকে বলে 'স্কাই ইজ দা লিমিট'। কিন্তু অন্য সব কিছুর মতো তাঁর প্রফেসানেও প্রচণ্ড কম্পিটিশন। নতুন নতুন ফন্দি ছাড়া তাঁর মতো আনকোরাদের বড় বড় অর্ডার জোগাড় করা অসম্ভব। এবার তিনি কিছু চমকপ্রদ বাড়ির নক্‌শা এঁকে আর্ট পেপারে ছেপে সুদৃশ্য ফোল্ডার বানিয়ে বিভিন্ন কোম্পানির অফিসে তো বটেই, টেলিফোন ডাইরেক্টরি থেকে ঠিকানা নিয়ে নানা নাম-করা লোকের বাড়িতে সেগুলো পাঠাতে লাগলেন। এতে সামান্য কিছু কাজ হল কিন্তু যিনি দেশের এক নম্বর আর্কিটেক্ট হতে চান তাঁর কাছে সেটা কিছুই নয়।

অফিস খোলার পর চার-পাঁচ বছর কেটে গেল। চোখ-ধাঁধানো পাবলিসিটি দিয়ে যেভাবে আরম্ভটা হয়েছিল, ভাবা গিয়েছিল, নতুন কোম্পানি ডানায় ভর করে উড়তে থাকবে কিন্তু দেখা গেল তার গতি ক্রমশ কমে আসছে, সব কিছু কেমন যেন টিকিয়ে টিকিয়ে চলছে।

এদিকে বিবাহিত জীবনটা মোটামুটি সুখেরই ছিল প্রণবেশের। কোনও কোনও মেয়ে 'হাউস ওয়াইফ' হওয়ার জন্যই জন্মায়, অনুরাধা অবিকল তেমনই। তাঁর গলা এত ভাল, বিয়ের আগে এবং পরে বহুবার গানটা চালিয়ে যেতে বলেছিলেন প্রণবেশ। অনুরাধা রাজি হননি। তিনি সুচারুভাবে গুছিয়ে সংসার করে যাচ্ছিলেন।

ওধারে অবনীশদের সঙ্গে সম্পর্ক অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। সময়ের হাতে এমন এক জাদু থাকে যা পুরনো বিদ্বেষের ঝাঁঝ কমিয়ে দেয়। অবনীশ বা অনুরাধার মা স্বর্ণময়ীর মনে যে উত্তাপ আর বিরূপতা জমেছিল তা ক্রমশ জুড়িয়ে গেছে। তাঁরা মাঝে মাঝে কেয়াতলায় আসতে লাগলেন। অনুরাধার অন্য আত্মীয়স্বজনরাও আসত। গোড়ায় প্রণবেশকে মেনে না নিলেও পরে উদ্যোগী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, পরিশ্রমী। জামাতাটিকে শ্বশুরবাড়ির লোকদের খুব ভাল লেগেছিল।

তবে গোপাল মুখার্জি কখনও আসেননি।

বিয়েব পাঁচ পছবেব মাথায় কমি যখন অনুবাধাব পেটে, স্বর্ণময়ী আব অবনীশদেব আসা-যাওয়াটা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ব্যাপাবটা একতবফা নয়, প্রায়ই মেয়ে এবং জামাইকে তাঁবা হবিশ মুখার্জি বোডেব বাড়িতে নিয়ে যেতেন।

এমনিতে মসৃণ নিয়মে জীবন কেটে যাওয়াব কথা। প্রণবেশেব যা আয় তাব সঙ্গে ঠাকুবদাব জমানো টাকাব ব্যাঙ্ক ইন্টাবেস্ট মিলিয়ে যে অঙ্কটা দাঁড়ায় তাতে বেশ আবামেই থাকা যায়। কিন্তু দাঁকণ এক অস্থিবতা সর্বক্ষণ তাঁকে তাড়া কবত। একটা ট্রফি জেতা হয়ে গেছে কিন্তু দু নম্বব টার্গেটটাব ধাবে কাছেও পৌঁছুনো যায়নি। যিনি আকাশ ছুঁতে চান তাঁব পা মাটিতেই আটকে আছে, ওপবে আব ওঠা যাচ্ছে না।

প্রণবেশ চাইতেন সর্বক্ষণেব কর্মব্যস্ততা আব টান টান উত্তেজনা। ইচ্ছা দাকণ দাকণ সব হাইবাইজ, স্টেডিয়াম বা সুপাব মার্কেটেব নক্শা বানিয়ে পৃথিবীকে চমকে দেওয়া। যে কোনও চ্যালেঞ্জ নিতে তিনি প্রস্তুত কিন্তু এ জাতীয় কাজ তাঁকে দিচ্ছে কে? আব দশটা আর্কিটেক্টেব মতো সাদামাঠা, ম্যাড়মেড়ে কেবিয়াব নিয়ে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকাব কথা ভাবলেই তাঁব মাথায় খুন চড়ে যেত। দিনেব বেশিব ভাগ সময়টা বিবাট বিবাট কোম্পানিব অফিসে অফিসে বড় কাজেব জন্য ঘুবে ব্যর্থ হয়ে ফিবে এসে একেবাবে ভেঙে পড়তেন। পবদিন সব হতাশা ঝেড়ে ফেব দৌড় শুরু হত

স্বামীকে লক্ষ কবতে কবতে অনুবাধা একদিন বলেছেন, 'আমাদেব যা আছে তাই যথেষ্ট। তোমাব ফার্মেব বিজনেসও খাবাপ নয়। তবু এত বেস্টলেস হয়ে থাক কেন? চাবদিকে এত ঘোবাঘুবি কবে শবীব খাবাপ কবাব কোনও মানে হয়?

প্রণবেশ বলেছেন 'সে তুমি বুঝবে না।

'কী বুঝবে না?'

'আমি চাই আমাদেব ফার্মটা হোল কান্ট্রিতে নাম্বাব ওয়ান হোক। আব আর্কিটেক্ট হিসেবে আই ওয়ান্ট টু বিচ দা টপ। অন্যেব পেছনে পড়ে থাকতে আমাব ঘেন্না হয়—আই হেট ইট '

অনুবাধা বলেছিলেন তোমাব এই ব্যাপাবগুলো আমাব মাথায় একেবাবেই ঢোকে না আমাদেব তো কোনও অভাব নেই। শুধু শুধু ব্যাট বেসেব মধ্যে ঢুকে টেনশন বাড়িয়ে কী লাভ?'

প্রণবেশ বেগে গিয়েছিলেন, 'টিপিক্যাল মিডল ক্লাস মেন্টালিটি অ্যাম্বিশন বলে একটা শব্দ আছে, সেটা জানো?'

অনুবাধাব মতো শান্ত, নবম মানুষও এবাব বেশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন।

বলেছেন, 'জানি জানি। যে অ্যাম্বিশান শান্তি নষ্ট করে, ব্লাড প্রেসার বাড়িয়ে দেয় তা আঁকড়ে ধরে থাকার মানে হয় না।'

'তোমার যা ব্যাকগ্রাউন্ড তাতে এ কথা তো বলবেই। কেরানি বা অফিসের বড়বাবুর লেভেল পর্যন্ত তোমরা ভাবতে পার। আমি এত নিচু স্টেজে আটকে থাকতে চাই না। আই ড্রিম অফ সামথিং বিগ।' হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো চেঁচিয়ে উঠেছিলেন প্রণবেশ। কিছু না ভেবে উত্তেজনার বশে কথাগুলো বলে ফেলেছিলেন। অনুরাধার বাবা যে একটা প্রাইভেট ফার্মের বড়বাবু ছিলেন আর দাদা একজন অফিস-ক্লার্ক সেই মুহূর্তে সেটা তাঁর মনে পড়েনি।

এদিকে প্রণবেশের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা শব্দগুলো চাবুকের মতো অনুরাধার মুখের ওপর আছড়ে পড়েছিল যেন। স্বামীর এমন চেহারা আগে কখনও দেখেননি তিনি। তাঁর মুখ পলকে রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল। স্তম্ভিত অনুরাধা পলকহীন প্রণবেশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন শুধু, তাঁর দুই ঠোঁট থরথর কেঁপে যাচ্ছিল।

সামান্য একটু দুঃখপ্রকাশ করলে ব্যাপারটা তখনই মিটে যেত। কিন্তু প্রণবেশের চরিত্রে অনুতপ্ত হওয়ার মতো নমনীয়তা নেই, বরং এক ধরনের বেপরোয়া গোঁয়ার্তুমি রয়েছে। ভাবখানা এইরকম, যা বলেছি তার জন্য লজ্জিত বা দুঃখিত হব না।

সেদিনই বোধহয় প্রথম মাঝারি মাপের আশা আকাঙ্ক্ষার ফ্রেমে আটকানো এক স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বামীর স্নায়ুযুদ্ধের শুরু। অনুরাধা খুবই অন্তর্মুখী, চিৎকার করে হুলস্থূল বাধানোর ক্ষমতা তাঁর স্বভাবে নেই। সেই ঘটনার পর নিজেকে অনেকখানি গুটিয়ে নিয়েছিলেন শুধু।

এর মাস দুই পর রুমির জন্ম কিন্তু সেটা মসৃণভাবে হয়নি। অনুরাধার তলপেটে কী একটা ইনফেকশান ঘটেছিল। তার ফলে নানা ধরনের জটিলতা দেখা দিয়েছিল। একটা সময় তাঁর বাঁচার আশা ছিল না। নেহাত আয়ুর জোর ছিল বলে মৃত্যুটা হয়নি। প্রায় আড়াই তিনমাস নার্সিং হোমে কাটিয়ে যখন তিনি ছাড়া পেলেন, স্বাস্থ্য বলতে কিছুই প্রায় অবশিষ্ট ছিল না। রক্তহীন রোগা ফ্যাকাসে শরীরে প্রাণটা ধুকপুক করছিল শুধু।

নার্সিং হোম থেকে কেয়াতলায় আসেননি অনুরাধা, সোজা মেয়েকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন হরিশ মুখার্জি রোডে। কেয়াতলায় কে তাঁকে দেখবে? গণ্ডাখানেক নার্স অবশ্য রেখে দিতে পারতেন প্রণবেশ কিন্তু তাদের ওপর অনুরাধার দায়িত্ব দিতে ভরসা হয়নি। স্ত্রীর শরীরের যা হাল, ভাড়াটে সেবিকারা কতটা কী করবে সে সম্পর্কে তার সংশয় ছিল।

হরিশ মুখার্জি রোডে বেশ কিছুদিন ছিলেন অনুরাধা। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য একটি নার্স অবশ্য রাখা হয়েছিল। তবে মায়ের মমতা, যত্ন আর শুশ্রূষাটাই ছিল আসল টনিক। ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠছিলেন তিনি। আগেকার স্বাস্থ্য এবং লাবণ্য ফিরে আসছিল।

পুরোপুরি সুস্থ হয়ে প্রায় ছ'মাস বাদে কেয়াতলায় ফিরে এসেছিলেন অনুরাধা। এর মধ্যে প্রণবেশের ফার্মের চেহারা আগাগোড়া বদলে গেছে। বাড়িতে আর অফিসটা রাখেননি, কেননা এত কাজ আসতে শুরু করেছিল যে আরও দু'জন আর্কিটেক্ট আর তিনজন ড্রাফটসম্যানকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হয়েছিল। কিন্তু এতজনকে বসানোর মতো জায়গা কেয়াতলায় ছিল না। তাই ল্যান্সডাউন রোডে একটা বড় ফ্ল্যাট ভাড়া করে অফিসটা সেখানে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কয়েক মাসের ভেতর প্রণবেশের ফার্মের বিজনেস প্রায় পাঁচগুণ বেড়ে গিয়েছিল। রাতারাতি এই ফুলেফেঁপে ওঠার পেছনে সূক্ষ্ম একটা ম্যাজিক কাজ করেছে। এতদিন প্রণবেশের প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ছিল, ছিল নিজের ওপর অগাধ আস্থা আর অহঙ্কার। ভাবতেন, এত ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছেন, চমকপ্রদ সব বাড়ির ডিজাইন করতে পারেন। কাজেই স্বাভাবিক নিয়মে তিনি বিরাট বিরাট অর্ডার পেয়ে যাবেন কিন্তু ট্যালেন্ট বা যোগ্যতা এক জিনিস আর বিজনেসের গ্রামার পুরোপুরি আলাদা। এখানে কোনও রাস্তাই সরলরেখায় চলে না। গোলকধাঁধার মতো অনেক জটিল অন্ধকার গুলিঘুঁজি রয়েছে, সেগুলোর খোঁজ না পেলে সাফল্য অসম্ভব। এক হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর কাছে তার সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলেন প্রণবেশ। বন্ধুটি বলেছিলেন, 'গিভ অ্যান্ড টেক বলে একটা ব্যাপার আছে জানো নিশ্চয়ই। বিজনেস বা প্রফেসন যাই হোক, ওটা সারাক্ষণ মাথায় রাখতে হবে। আজকের ওয়ার্ল্ডে এটাই হল সাকসেসের ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট ওয়ার্ড।'

বুঝতে না পেরে প্রণবেশ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মানে?'

'বড় বড় অর্ডার চাইবে আর তার জন্যে নগদ নারায়ণ কিছু খসাবে না, তাই কখনও হয়?' চোখ কুঁচকে হেসে হেসে বন্ধুটি বলেছিলেন, 'যে টপ একজিকিউটিভরা অর্ডার দেয় তাদের পুজো চড়াও। কাজের জন্যে তুমি যে ফি এক্সপেক্ট কর অ্যাট লিস্ট তার টেন টু ফিফটিন পারসেন্ট দিয়ে দাও। আর পেছন ফিরে তাকাতে হবে না। একেবারে স্মুদ সেইলিং—'

'তুমি কি ঘুষের কথা বলছ?'

'কথাটা শুনতে খারাপ, তাই পুজো চড়াতে বলছি।'

'সেই একই ব্যাপার। কিন্তু অনেস্টলি কাজ করব, তার দাম নেব। ঘুষ দিতে যাব

কেন?'

বন্ধুটি বলেছেন, 'সত্য যুগ ফুগের মতো তপোবন খুলে সেখানে থাকাই তোমার উচিত ছিল। আরে বাবা, হোল কান্ট্রি কোরাপশানে ভরে গেছে। দুর্নীতি হচ্ছে এখন সবচেয়ে বড় ইন্ডাস্ট্রি। তুমি বিজনেস করবে, একজন সাকসেসফুল প্রফেসনাল হবে আর ঘুষ দেবে না, কাট মানি দেবে না—তাই কখনও হয়?'

দ্বিধান্বিত প্রণবেশ বলেছেন, 'যে পারসেন্টেজের কথা বললে সেটা দিতে হলে আমাদের কী থাকবে?'

জিভের ডগায় চুক চুক আওয়াজ করে বন্ধুটি বলেছেন, 'তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। যারা তোমাকে অর্ডার দেবে তাদের সঙ্গে সিক্রেট ডিল করে নেবে। যে পারসেন্টেজ তোমাকে দিতে হবে সেটা তোমার ফি'র সঙ্গে জুড়ে বিল করে দিও। তা হলে তো আর কোনও প্রবলেম নেই।'

বন্ধুর দেখানো রাস্তা ধরে এরপর মসৃণভাবে এগিয়ে গিয়েছিলেন প্রণবেশ। প্রথম প্রথম অবশ্য ঘুষ দিয়ে কাজ বাগিয়ে নিতে খারাপ লাগত। পরে ব্যাপারটা চমৎকার রপ্ত করে নিয়েছিলেন। শুধু খামে কড়কড়ে কারেন্সি নোটের গোছা ভরে জায়গামতো পৌঁছে দিতেন না, যাঁদের নিয়ে তাঁর কাজ তাঁদের স্ত্রীদের মাঝে মাঝেই ঢাকাই বা মাইশোর সিল্কের শাড়ি কিংবা দামী ফরেন পারফিউমের শিশি দিয়ে আসতেন। এছাড়া দু-মাস পর পর হোটেলে পার্টি দিয়ে এঁদের সবাইকে গলা পর্যন্ত স্কচ খাওয়াতেন। অর্থাৎ ঘুষ দেওয়াটাকে সূক্ষ্ম চারুকলার পর্যায়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রণবেশ।

সাফল্যের সঙ্গে হুইস্কির বোধহয় নিবিড় সম্পর্ক থাকে। গোড়ার দিকে পার্টিতে গিয়ে সফট ড্রিংকের গেলাস হাতে নিয়ে বেহেড মাতালদের তিনি সঙ্গ দিতেন। মদ্যপানটা তাঁর কাছে কোনও অর্থেই ট্যাবু নয় বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একবার রাম আর বার পাঁচেক বিয়ার খেয়েছিলেন। ব্যস, ওই পর্যন্ত। আসলে এই ব্যাপারটায় তাঁর আদৌ উৎসাহ ছিল না।

কিন্তু পার্টিতে যেতে যেতে কবে থেকে যে হুইস্কির বোতলগুলো তাঁকে টলিয়ে দিতে শুরু করেছিল, এতকাল বাদে আর মনে পড়ে না। তা ছাড়া বন্ধুবান্ধব এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের ক্রমাগত উসকানিও ছিল। তবে তিনি জানতেন, মিডল ক্লাস ফ্যামিলির অতীব পিউরিটান মেয়ে অনুরাধা মদ্যপানটা একেবারেই বরদাস্ত করেন না। তাই গোড়ার দিকে এক আধ পেগ খেয়ে, নানা প্রক্রিয়ায় মুখের গন্ধ মেরে বাড়ি আসতেন। কিন্তু নেশা এমনই ব্যাপার যে অঙ্ক কষে চালানো যায় না। সেটা নিজের ঝোঁকেই সব হিসেব ওলটপালট করে বেড়ে চলে। সুতরাং একদিন প্রচুর হুইস্কি খেয়ে

টলতে টলতে বাড়ি ফিরলেন প্রণবেশ।

স্বামীকে এই অবস্থায় আগে আর কখনও দেখেননি অনুরাধা, ভয়ে অস্বস্তিতে তিনি একেবারে সিঁটিয়ে গিয়েছিলেন। কী যে করবেন, ভেবে উঠতে পারছিলেন না।

হুইস্কি মাথায় চড়ে বসলেও ঢুলু ঢুলু আরক্ত চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কিছু একটা আন্দাজ করেছিলেন প্রণবেশ। জড়ানো গলায় বলেছেন, 'বন্ধুরা জোর করে খাইয়ে দিলে কিনা—'

অনুরাধা একটি কথাও বলেননি। রুমি তাঁদের বেডরুমে ঘুমোচ্ছিল। তিনি সোজা সেখানে গিয়ে দরজা বন্ধ করে তার কাছে শুয়ে পড়েছিলেন। কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকে টলোমলো পায়ে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিলেন প্রণবেশ।

পরদিন বেশ বেলায় ঘুম ভেঙেছে প্রণবেশের। স্নানটান করার পর আগের রাতের নেশা কেটে যাওয়ায় খুব তাজা লাগছিল। পোশাক টোশাক পালটে তিনি চলে এসেছিলেন ডাইনিং রুমে। সেখানে চুপচাপ বসে ছিলেন অনুরাধা। তাঁর মুখ গম্ভীর, বিষাদ মাখানো।

রোজ সকালে স্নান সেরে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে প্রণবেশ অফিসে যেতেন। তাঁকে দেখেই উঠে পড়েছিলেন অনুরাধা। ক্ষিপ্র হাতে টোস্টারে রুটি সেঁকে, মাখন লাগিয়ে, ওমলেট বানিয়ে প্লেটে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে শশা, আপেল এবং কলা। একটা চিনামাটির বোলে দুধ, আর কর্নফ্লেকস মিশিয়ে দেওয়ার পর কফি করে এনেছিলেন। ব্রেকফাস্টটা একটু বেশি করেই করেন প্রণবেশ। দুপুরে ভরপেট ভাত খেলে ঘুম পায়, কাজের ভীষণ অসুবিধা হয়।

রুটিতে কামড় দিয়ে ঘাড় হেলিয়ে অনুরাধার দিকে তাকিয়েছিলেন প্রণবেশ। অনুরাধা টেবলের ওধারে কোণাকুণি মুখ নিচু করে চামচ দিয়ে কফি নাড়ছিলেন।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ খাওয়ার পর প্রণবেশ বলেছেন, 'কাল সবাই এমন করে ধরল যে অ্যাভয়েড করা গেল না।'

অনুরাধা উত্তর দেননি।

একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলেন প্রণবেশ। বলেছেন, 'আসলে এটা হল পার্ট অফ আওয়ার বিজনেস।'

খুব শান্ত গলায় এবার ছোট একটি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন অনুরাধা, 'ঘুষ দিয়ে কনট্রাক্ট পাওয়া, পার্টিতে মদ খাওয়া—এ সবই তা হলে বিজনেসের অঙ্গ?'

চোখের তারা স্থির হয়ে গিয়েছিল প্রণবেশের। তাঁর ধারণা ছিল, সংসার আর মেয়েকে নিয়ে সদাব্যস্ত অনুরাধার তাঁদের কোম্পানি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ নেই। অন্তত মুখ ফুটে কখনও কৌতূহল দেখাননি। এ সম্পর্কে স্ত্রীর সঙ্গে বিশেষ

আলোচনাও কোনওদিন করেননি প্রণবেশ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক কিছুই জানেন অনুরাধা। টলতে টলতে আসার কারণে না হয় মদ্যপানের ব্যাপারটা হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু ঘুষের খবরটা তাঁর কানে পৌঁছুল কী করে?

ভেতরে ভেতরে বেশ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন প্রণবেশ। কয়েক মুহূর্ত থমকে থাকার পর খুব সংক্ষেপে বলেছেন, 'রাইট।'

'ও—' ছোট্ট এক অক্ষরের শব্দটি এমনভাবে অনুরাধা এবার উচ্চারণ করেছিলেন যে তার ভেতর থেকে শ্লেষ ফুটে বেরিয়েছিল।

স্ত্রীর দিকে কোণাকুণি ঝুঁকে প্রণবেশ তীব্র স্বরে বলেছেন, 'হোয়াট ডু য়ু মিন? কী বলতে চাও তুমি?'

'তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে অ্যাম্বিশানের কথা শুনে আসছি। উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে হলে এসব করতে হয়, আমার জানা ছিল না।' ঠিক আগের মতোই অনুরাধার গলায় ছিল চাপা আক্রমণের ঝাঁঝ।

এভাবে কখনও কথা বলেননি অনুরাধা। হঠাৎ রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছিল প্রণবেশের, রাগে মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছিল। গলার স্বর অনেকখানি উঁচুতে তুলে তিনি প্রায় চেঁচিয়েই উঠেছেন, 'ইয়েস, আই অ্যাম ভেরি মাচ অ্যাম্বিশাস। কোনওদিন কি বলেছি আমি আইডিয়ালিস্ট? বিজনেসটা নীতিশিক্ষার ক্লাস নয়, মরালিটি প্রিচ করার জন্যে আমি অফিস খুলিনি—বুঝেছ?'

অনুরাধা বলেছেন, 'বুঝলাম।'

কণ্ঠস্বর নামিয়ে প্রণবেশ বলেছেন, 'প্রতিটি ব্যাপারের নিজস্ব কিছু পদ্ধতি থাকে, স্টাইল থাকে। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট।'

অনুরাধা উত্তর দেননি, পলকহীন শুধু তাকিয়ে থেকেছেন।

প্রণবেশ থামেননি, খানিকটা আপসের ভঙ্গিতে বলে যাচ্ছিলেন, 'সাকসেস পেতে হলে অনেক কিছু করতে হয়। ওসব নিয়ে মাথা ঘামালে সব সময় চলে না।'

অনুরাধা এবার বলেছিলেন, 'তার মানে রোজ পার্টি থেকে মদ খেয়ে টলতে টলতে মাঝরাতে বাড়ি ফিরবে এখন থেকে?'

খানিকটা নরম হয়েছিলেন প্রণবেশ। ফের শরীরের সব রক্ত তাঁর মাথায় উঠে এসেছে। অসহিষ্ণু, উগ্র গলায় বলেছেন, 'আজকের সোসাইটিতে মদ খাওয়াটা কোনও ব্যাপার? পাঁচ ছ'বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, রটন মিডল ক্লাস ট্যাবুগুলো এবার ছাড়ো।'

মনে আছে, সেদিন থেকে একটা গোপন স্নায়ুযুদ্ধটা আরও তীব্র হয়েছিল দু'জনের মধ্যে। প্রণবেশ তখন না হলেও পরে বুঝতে পেরেছেন, মদ্যপানটা অনুরাধা

অপছন্দ করলেও সেটাকে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধ মনে করতেন না। কত লোকই তো স্বাস্থ্যের জন্য, ফুর্তি করতে, হতাশা কাটাতে অথবা অন্য কারণে মদ খায়, তাই বলে তারা সকলে বদ, দুশ্চরিত্র, এমন একটা ধারণা কখনও তাঁর মাথায় চেপে বসেনি। প্রণবেশের বেলায় আপত্তিটা ছিল অন্য জায়গায়। কেউ বিশেষ উদ্দেশ্যে, উচ্চাশা পূরণের জন্য ঘুষ দিচ্ছে, ড্রিংক করতে শুরু করেছে—এসব তাঁর কাছে চরম অধঃপতন বলে মনে হয়েছিল। প্রণবেশ যখন তা জানতে পারলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

স্ত্রীর সঙ্গে মিটমাট করে নেওয়ার কথা একবারও সে সময় তখন ভাবেননি প্রণবেশ। তাঁর মধ্যে যে একটা অসংযত বেপরোয়া ব্যাপার আছে, কেউ যেন সেটাকে ক্রমাগত উসকে দিয়েছিল। সাফল্য তাঁর মস্তিষ্কে এভাবে চড়ে বসেছে যে কোনও কিছুই গ্রাহ্য করছিলেন না। আর সাকসেসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল পার্টি, মদ্যপান। মাঝরাত পার করে এই সময়টা তিনি মাথায় রঙিন নেশার প্রবল অর্কেস্ট্রা শুনতে শুনতে আর টক্কর খেতে খেতে বাড়ি ফিরতেন। বেশির ভাগ দিনই কাজের লোকেরা কাঁধে করে বেডরুমে এনে তাঁকে শুইয়ে দিত।

প্রথম দিনই যা একটু আপত্তি করেছিলেন অনুবাধা। তারপর থেকে একেবারে চুপ হয়ে গেছেন। কঠিন নৈঃশব্দ্য দিয়ে তিনি স্বামীর এই জঘন্য আচরণের প্রতিবাদ করতেন।

ক্রমে সাকসেসের ডানায় চড়ে আকাশের দিকে ধাবমান এক স্বামীর সঙ্গে তাঁর টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত, উচ্চাশাহীন স্ত্রীর দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে। দু'জনের মধ্যে উঠতে থাকে কাচের দেওয়াল।

আরও কয়েকটা বছর কেটে যায়। তখনও প্রণবেশ আর অনুরাধার মধ্যে কাজ চলা গোছের একটা সম্পর্ক বজায় ছিল। কিন্তু হঠাৎ এক বিস্ফোরণে তা চুরমার হয়ে গেল।

চারশ কোটি টাকার একটি বেসরকারি হাউসিং-কাম-কমার্শিয়াল কমপ্লেক্সের নক্‌শা এবং মডেল তৈরির জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। সব মিলিয়ে ষাটটা হাই-রাইজ বিল্ডিং বানানো হবে, তার কোনওটাই ষোল তলার নিচে নয়। কমপ্লেক্সটার ভেতর থাকবে সুইমিং পুল, ইনডোর স্টেডিয়াম, সুপারমার্কেট, আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজ, আর্ট গ্যালারি, থিয়েটার হল থেকে শুরু করে আধুনিক জীবনযাপনের যাবতীয় ব্যবস্থা।

পরে এর চেয়ে অনেক বড় বড় প্রকল্পে কাজ করেছেন প্রণবেশ কিন্তু সেদিন ওটা ছিল তাঁর কাছে ড্রিম প্রোজেক্ট। পঁচিশ বছর আগে এত বিশাল প্রোজেক্ট ভারতবর্ষের

অন্য কোনও মেট্রোপলিসেও কম হয়েছে। তিনি জানতেন সারা দেশের নাম-করা আর্কিটেক্ট ফার্মগুলো এটার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। এদের তুলনায় তাদের কোম্পানি ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না তবু অদম্য এক জেদ তাঁকে পেয়ে বসেছিল যেন। যেভাবেই হোক, প্রকল্পের কাজটা বার করে নিতেই হবে। এতদিন তাঁর কাজকর্ম ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতেই আটকে ছিল। কিন্তু ওই প্রকল্পটা যদিও কলকাতার কাছে হতে যাচ্ছে কিন্তু [illegible] এতই বিরাট যে ওটা পাওয়া গেলে সমস্ত দেশের নজর এসে পড়বে তাঁর ওপর। রাতারাতি সর্বভারতীয় পাবলিসিটি পেয়ে যাবেন তিনি।

বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠানটির নামে ক্যুরিয়ার সার্ভিসে চিঠি পাঠিয়ে প্রণবেশ জানিয়ে দিয়েছিলেন, এই কাজটা পেতে তাঁর ফার্ম গভীরভাবে আগ্রহী। কিন্তু চিঠির ওপর ভরসা করেই থেমে থাকেননি। এই প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার যুগে অত্যন্ত গোপনে, নিঃশব্দে অনেক স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে হয়। চারশ কোটি টাকার প্রোজেক্ট তো সামান্য ব্যাপার নয় যে হাত বাড়ালেই টুক করে খসে পড়বে। এই বিজনেসের সূক্ষ্ম কলাকৌশল, সোজা কথায় যাকে বলে ঘোঁতঘাত, সব ততদিনে জানা হয়ে গেছে তাঁর। কাকে ধরলে এবং কী পরিমাণ পুজো চড়ালে কাজটা পাওয়া যেতে পারে, তলায় তলায় তার খোঁজ নিতে শুরু করেছিলেন তিনি।

বাড়ি থেকে ল্যান্সডাউন রোডে অফিসটা তুলে আনার পর একজনকে ম্যানেজার হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন প্রণবেশ। তার নাম রমেশ সামতানি। লোকটা খুব করিতকর্মা, কাজের ব্যাপারে তুখোড়। কোনও দায়িত্ব দিলে যে করে হোক সেটা নামিয়ে দেবেই। রমেশকেই এই প্রোজেক্টের ব্যাপারে গোয়েন্দা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। দিন কুড়ির ভেতর সে খবর নিয়ে এসেছিল, বিজ্ঞাপনদাতা রিয়েল এস্টেট কোম্পানিটার একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী অ্যাডভাইসর আছেন। তাঁর হাতেই প্রোজেক্টটার চাবিকাঠি। এঁকে খুশি করতে পারলে কাজটা পাওয়া যেতে পারে। প্রণবেশ মনস্থির করে ফেলেছিলেন, যত টাকা লাগে দেবেন। এর জন্য যদি অনুরাধার গয়না, গাড়ি বা ঠাকুরদার কেনা কিছু ব্লু-চিপ কোম্পানির শেয়ার বেচে দিতে হয় আপত্তি নেই। মোট কথা এমন সুযোগ জীবনে বার বার আসে না, কোনওভাবেই এটা হাতছাড়া করা চলবে না।

প্রণবেশ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'অ্যাডভাইসরকে নিশ্চয়ই পুজো চড়ানো হবে। টাকার অ্যামাউন্টটা কত?'

রমেশ সামতানি এবার সাত অঙ্কের একটা ফিগার বলেছিলেন। প্রণবেশের মস্তিষ্কে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য একটা ক্যালকুলেটর সক্রিয় হয়ে ওঠে। গয়না, গাড়ি, কিছু শেয়ারটেয়ার বেচে যে টাকা পাওয়া যাবে তাতে ওই ফিগারটার কাছাকাছি পৌঁছুনো

যাবে না। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, আরও শেয়ার বেচে দেবেন, ফিক্সড ডিপোজিট ম্যাচিওর করার আগেই ভাঙিয়ে টাকা তুলবেন। তাতেও না হলে বাড়ি মর্টগেজ রাখবেন ব্যাঙ্কের কাছে। কিন্তু এসব করতে গেলেও যথেষ্ট সময় দরকার।

প্রণবেশ বলেছিলেন, 'ও. কে, আমি রাজি।'

রমেশ বলেছিলেন. 'তবে আরেকটা আনবিটন শর্ত আছে। শুধু টাকাতেই হবে না।'

প্রণবেশের ভ্রূ কুঁচকে গিয়েছিল। যে টাকা তিনি দেবেন তাব কোনও সাক্ষী থাকবে না, লেখাপড়ার তো কোনও প্রশ্নই নেই। হস্তান্তরটা হবে এমনভাবে যাতে কাকপক্ষীও টের না পায়। টাকা নিয়েও যদি অ্যাডভাইসরটি পরে অস্বীকার করেন তিনি একেবারে পথে বসে যাবেন। মাথা তুলে দাঁড়াতে কত বছর লাগবে কে জানে। সমস্ত ব্যাপারটাই চোখ বুজে ফাটকা খেলাব মতো। কিন্তু টাকা ছাড়াও অন্য খাঁই মেটাতে হবে। শুনে হঠাৎ টেনসন বাডতে শুরু করেছিল প্রণবেশের। বলেছেন, 'এর ওপব আব কী চায লোকটা?'

রমেশ বলেছিল 'টাকা'র সঙ্গে একটি জীবন্ত প্রাণীও নিয়ে যেতে হবে।'

'মানে?' বুঝতে না পেরে গলায় একটু জোব দিয়েই বলেছিলেন প্রণবেশ।

নিবাসক্ত দার্শনিকের মতো দুম করে রমেশ বলেছে, 'আ বিউটিফুল ইয়ং গার্ল। অ্যান্ড—' কথা শেষ না করে আচমকা থেমে গেছে সে।

'অ্যান্ড হোয়াট?'

'লোকটার একটা ফাঁকা, ফার্নিশড ফ্ল্যাট আছে বডন স্ট্রিটে। মেয়েটিকে কয়েকদিন সেখানে থাকতে হবে।'

ইঙ্গিতটা এত স্পষ্ট যে প্রণবেশ চমকে উঠে বলেছেন. 'ওহ গড—ওম্যানাইজার!'

তাঁর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে করতে রমেশ আস্তে মাথা হেলিয়ে বলেছে, 'দ্যাটস ইট।'

অ্যাটাচি কেস ভরে একজিকিউটিভদের টাকা, তাদের স্ত্রীদের গয়না, দামি শাড়ি বা বিদেশি পারফিউম দেওয়া কিংবা ফাইভ স্টার হোটেলে পার্টি দিয়ে গলা পর্যন্ত হুইস্কি আর ডিনার খাওয়ানো, এসব এক ব্যাপার। আর মেয়ে ঘুষ দিয়ে কনট্রাক্ট বাগানো একেবারেই আলাদা—অত্যন্ত জঘন্য, কুৎসিত, নোংরা। প্রণবেশ কাজের জন্য টাকাপয়সা দেন ঠিকই, তাই বলে মেয়ে? তিনি কি পিম্প—বেশ্যার দালাল? তাঁর শিক্ষাদীক্ষা আছে, রুচি আছে, ভদ্র পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে। যতবার লোকটার কদর্য শর্তটার কথা ভেবেছেন, সারা গা ঘিন ঘিন করে উঠেছে। উত্তেজিত সুরে বলেছেন, 'একটা ডার্টি গাটার স্নাইপ—নর্দমার পোকা।'

'অ্যাবসোলিউটলি কাবেক্ট।'

'ওকে সামনে পেলে—' কী যে কবতেন ভাবতে না পেবে থেমে গিয়েছিলেন প্রণবেশ।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তাবপব প্রণবেশ বলেছেন, 'আমি এতে বাজি নই বমেশ—'

এবাব নড়েচড়ে বসেছে বমেশ, 'কিন্তু—

'কী?'

'লোকটাকে খুশি কবতে পাবলে একটা গোল্ড মাইন আমাদেব হাতে এসে যাবে স্যাব কোম্পানি কোন হাইটে পৌঁছে যাবে, একবাব ভেবে দেখুন।'

বমেশ একটানা বকে যাচ্ছিল আব চোখেব সামনে বঙিন স্বপ্নেব মতো দুর্দান্ত এক ভবিষ্যৎ ফুটিয়ে তুলছিল। নিজেব সঙ্গে অনেকক্ষণ যুদ্ধেব পব শেষ পর্যন্ত নিজেকে বমেশেব হাতেই যেন সঁপে দিয়েছেন প্রণবেশ। ক্লান্তভাবে বলেছেন, 'আমি এসবেব ভেতব থাকব না—'

বমেশ বলেছে, 'আপনি কেন এব মধ্যে থাকবেন? আমি আছি কী কবতে?'

এবপব বমেশ কী কবেছে, প্রণবেশ জানতে চাননি। তিনি শুধু টাকা জোগাড়ের জন্য ছুটোছুটি শুরু কবেছেন। তবে সাত অঙ্কেব পুবো টাকাটার ব্যবস্থা একসঙ্গে কবা যায়নি। বমেশ বলেছিল, কয়েকটা ইনস্টলমেন্টে দিলেও চলবে। সেই অনুযায়ী লাখখানেক টাকা তাব হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

এব দিন তিনেক বাদে দুপুববেলা অফিসে বসে একটা বাড়িব নকশা আঁকছিলেন প্রণবেশ, আচমকা অনুবাধাব ফোন এল। অফিসে কোনও দিনই এব আগে তিনি ফোন কবেননি। তা ছাড়া মাতাল হয়ে মধ্যবাতে বাড়ি ফেবা যেদিন থেকে প্রণবেশ শুরু কবেছিলেন কথাবার্তাও 'বিশেষ বলতেন না' [illegible]' এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যেখানে আপসেব বাস্তাগুলো ক্রমশ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

প্রণবেশ প্রথমটা বেশ অবাকই হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছেন, 'কী ব্যাপাবে—বল—'

অনুবাধা ওধাব থেকে বলেছেন 'তুমি এখনই একবাব বাড়ি চলে এসো।'

হঠাৎ কোনও বিপদ ঘটে গেছে কি, প্রথমটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন প্রণবেশ। বলেছেন, 'কেন বলো তো? অ্যাকসিডেন্ট-ট্যাক্সিডেন্ট কিছু হয়েছে?'

'না।'

'তা হলে?'

'তোমার আসাটা খুব আর্জেন্ট।' .

'কাজ ফেলে এখন কী করে যাব?'

'তোমাকে আসতেই হবে। আধ ঘণ্টার ভেতর না এলে আমিই তোমার অফিসে চলে যাব। সেটা কিন্তু তোমার পক্ষে ভাল হবে না।'

প্রণবেশের বিস্ময় এক লাফে অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। এমন কর্তৃত্বের সুরে আগে কখনও কথা বলেননি অনুরাধা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বলেছেন, 'তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?'

অনুরাধা বলেছেন, 'যা বলার আমি বলেছি। সেটা কীভাবে ব্যাখ্যা করবে তা তোমার ব্যাপার।'

অসহ্য রাগে মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে প্রণবেশের। দাঁতে দাঁত চেপে বলেছেন, 'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।'

আধঘণ্টাও লাগেনি, তাব আগেই বাড়ি ফিরে এসেছিলেন প্রণবেশ। অনুরাধাব কথাগুলো তাঁর কছে প্রচণ্ড অপমানজনক মনে হয়েছে। তাবা থাকতেন তেতলায়। ক্রোধে, উত্তেজনায় একসঙ্গে তিন চারটে করে সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে তেতলার মস্ত হল-ঘরে উঠে এসেছিলেন। এটাই তাঁদের লিভিং-কাম-ডাইনিং রুম। হল-এ পা দিয়েই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পডতে হয়েছিল।

একধাবে সোফায বসে ছিলেন অনুরাধা। তাঁব মুখোমুখি অন্য একটা সোফায় বসে অঝোরে কেঁদে যাচ্ছিল সুলতা। কতক্ষণ ধরে মেয়েটা কাঁদছে কে জানে। চোখ দুটো টকটকে লাল, গাল বেয়ে অবিবল ফোঁটায ফোঁটায় জল ঝরে যাচ্ছে।

সুলতা দারুণ সুন্দরী। গায়েব রং ঘন দুধেব মতো হলদেটে। লম্বাটে মুখ ঘন পালকে-ঘেবা টানা চোখ, কোঁচকানো নিবিড চুল পিঠ ছাপিয়ে নেমে এসেছে। পাতলা নাক, সরু চিবুক, নিটোল হাত এবং গ্রীবা—সব মিলিযে সে অসাধাবণ। সৌন্দর্য যেমনই হোক, তাব পোশাকে বা সাজসজ্জায় অভাবের ছাপটা স্পষ্ট। পরনে সস্তা সাদামাঠা শাড়ি, পায়ে খেলো স্লিপার, বাঁ হাতে কালো ফিতে-বাঁধা পুরনো আমলের ঘড়ি। গলায় সরু রুপোর চেইন ছাড়া ধাতুর চিহ্নমাত্র নেই। মিডল ক্লাসের একেবারে নিচের স্তরে আশাহীন, ভবিষ্যৎহীন যারা ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে, সুলতা তাদেরই একজন। সেই মুহূর্তে তার মুখটা কান্নায় ভেঙেচুরে বিকৃত দেখাচ্ছিল।

মেয়েটাকে কিছুদিন আগে থেকেই চিনতেন প্রণবেশ। সাধারণ পাশ কোর্সের গ্র্যাজুয়েট। বেশ কয়েকবার চাকরির জন্য তাঁদের অফিসে গেছে সুলতা। বাড়িতে এসেও ধরাধরি করেছে। অফিসে যাতায়াতের কারণে বমেশের সঙ্গে তাব আলাপ টালাপ হয়েছিল।

ঠিক স্পষ্ট করে নয়, আবছাভাবে রমেশ যেন বলেছিল, ঘুষের টাকার প্রথম ইনস্টলমেন্ট আর সুলতাকে নিয়ে সেই অ্যাডভাইসরটির কাছে যাবে। তারপর ঠিক কী হয়েছিল তাঁকে জানায়নি সে।

প্রণবেশকে দেখামাত্র মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে অনুরাধার। বলেছেন, 'দাঁড়িয়ে কেন, এদিকে এসো—'

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন প্রণবেশ।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়েছেন অনুরাধা। সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, 'মানুষের লাইফে কত টাকা দরকার?'

বাইরের একটি মেয়ের সামনে এমন একটা প্রশ্ন বুঝিয়ে দিয়েছিল অনুরাধা গোড়া থেকেই চড়া আক্রমণাত্মক মেজাজে রয়েছেন, যা একেবারেই তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। প্রণবেশ দাঁতে দাঁত ঘষে বলেছিলেন, 'কী বলতে চাইছ তুমি?'

'টাকার জন্যে, বিজনেসের জন্যে এত নিচে নেমে গেছ তুমি, ভাবতেও পারিনি।' অনুরাধার চোখমুখ আর কণ্ঠস্বর থেকে প্রচণ্ড ঘৃণা এবং ধিক্কার আগুনের হলকার মতো বেরিয়ে এসেছিল।

হঠাৎ শরীরের সব রক্ত মাথায় উঠে গিয়েছিল প্রণবেশের। হিতাহিতজ্ঞানশূন্যের মতো গলার শিরা ছিঁড়ে চেঁচিয়ে উঠেছেন তিনি, 'শাট আপ—'

'কেন, তোমার ভয়ে? যা করেছ, এতটুকু মনুষ্যত্ব থাকলে তার জন্যে তোমার বিষ খাওয়া উচিত। ছিঃ—'

প্রণবেশ টের পাচ্ছিলেন তাঁর চোয়াল পাথরের মতো কঠোর হয়ে উঠেছে। আর সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীর ভেতর অদৃশ্য আগুনের চাকা ঘুরে যাচ্ছে।

অনুরাধা কিন্তু থামেননি, সুলতার দিকে আঙুল বাড়িয়ে একই সুরে বলেছিলেন, 'তোমার অ্যাম্বিশানের জন্যে এই গরিব মেয়েটাকে একটা লুচ্চার হাতে তুলে দিয়েছিলে। কপাল ভাল বলে সম্মান নিয়ে ফিরে এসেছে। তোমার মতো অমানুষ, ইতর জীবনে আমি দেখিনি।'

প্রণবেশ এবার আর চিৎকার করেননি। চাপা, গনগনে গলায় শুধু বলেছিলেন, 'গেট আউট—আই সে গেট আউট—'

অনুরাধা বলেছেন, 'সেটা তোমার না বললেও চলবে। আমি আগেই ঠিক করে ফেলেছিলাম, তোমার মতো নোংরা লোকের সঙ্গে আর থাকব না। সেটা বলার জন্যই তোমাকে ডাকিয়ে এনেছিলাম।'

সত্যিই রুমিকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন অনুরাধা। সেই মুহূর্তে স্ত্রীকে বাধা দেওয়ার কথা একবারও ভাবেননি প্রণবেশ। প্রথমত ক্রোধে, অপমানে সারা গায়ের

রক্ত ফুটছিল, সেই সঙ্গে স্তম্ভিতও তিনি কম হননি। এতকাল তাঁর ধারণা ছিল, ভারি নরম, ভীরু, দুর্বল এবং একান্ত মধ্যবিত্ত অনুরাধার মধ্যে পারিবারিক বিস্ফোরণ ঘটানোর মতো যথেষ্ট বারুদ নেই। কিন্তু সেদিন তাঁর ধারণা বা বিশ্বাস ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। অনুরাধা যে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারেন তা কোনওদিন তাঁর ভাবনায় ছিল না।

দিন কয়েক বাদে কুরিয়ার সার্ভিসে স্ত্রীর নামে হরিশ মুখার্জি রোডে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন, অনুরাধার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে চান না। আসলে অসম্মানটা একেবারেই ভুলতে পারছিলেন না তিনি। চিঠির উত্তরও এসে গিয়েছিল এক সপ্তাহের ভেতর। অনুরাধার তরফে তাঁর কাকা গোপাল মুখার্জি লিখেছিলেন, প্রণবেশের মতো একটা বদ, দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে তাঁর ভাইঝিও সম্পর্ক রাখতে একেবারেই আগ্রহী নন। এজন্য যতদূর যেতে হয় তাঁরা যাবেন।

সেই যে বিয়ের আগে এবং পরে প্রণবেশ গোপাল মুখার্জিকে দু দু'বার নাজেহাল করে এসেছিলেন সেটা একেবারেই ভুলতে পারেননি আলিপুরের ক্রিমিনাল ল' ইয়ারটি। কয়েক বছর ধরে রাগটা গোপনে পুষে রেখেছিলেন। তিনি এমন ধরনের মানুষ, প্রতিহিংসার জন্য যাঁরা আমৃত্যু অপেক্ষা করতে পারেন। পালটা মার না দেওয়া পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে অস্ত্র শানিয়ে যান। আচমকা অনুরাধা আর প্রণবেশের সম্পর্কটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগাতে শুরু করেছিলেন।

ক্রোধ এবং ঘৃণার মধ্যে এমন সব বিষাক্ত জীবাণু থাকে যা মানুষের বিচারবুদ্ধি ধ্বংস করে দেয়। তার ওপর যদি গোপাল মুখার্জির মতো লোকেদের ক্রমাগত উসকানি থাকে তা হলে তো কথাই নেই। অনুরাধা আর প্রণবেশের তিক্ততা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে শেষ পর্যন্ত ডিভোর্সের মামলা আনতে হয়েছিল। গোপাল মুখার্জি পরিষ্কার শাসিয়ে দিয়েছিলেন, কেসের বিরোধিতা করা হলে আদালতে সুলতার ব্যাপারটা তোলা হবে। সেটা প্রণবেশের পক্ষে সুখকর হবে না। আদালতের কাঠগড়ায় তাঁকে পেলে গোপাল মুখার্জি যে তাঁর জামাপ্যান্ট খুলে নেবেন, এমন একটা হুমকিও দেওয়া হয়েছিল।

প্রণবেশ আদালতের ধারেকাছে যাননি। একতরফা মামলায় বিবাহ বিচ্ছেদটা ঘটে গিয়েছিল অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। প্রণবেশের দিক থেকে আর্জি জানানো হয়েছিল রুমিকে যেন তাঁর কাস্টডিতে রাখা হয়, কিন্তু মেয়ে নাবালিকা, মাত্র চার বছর ন'মাস বয়স, এই কারণে সেটা খারিজ হয়ে যায়।

ডিভোর্সের কিছুদিন বাদে উত্তাপ যখন অনেকখানি জুড়িয়ে এসেছে, প্রণবেশ

বুঝতে পারছিলেন জীবনের একটা বড় ঐশ্বর্য হারিয়েছেন। এবার অনুরাধা আর রুমিকে ফিরে পাওয়ার জন্য মিটমাট করে নিতে চেয়েছেন তিনি। চিঠি লিখে, ফোন করে এবং শুভাকাঙ্ক্ষী লোকজন পাঠিয়ে জানিয়েছেন তিনি অনুতপ্ত, ক্ষমাপ্রার্থী। তবে অনুরাধাদের দিক থেকে সাড়া পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন স্ত্রী এবং মেয়ের ভরণপোষণের জন্য টাকাও দিতে চেয়েছেন, এমনকি মানি অর্ডার করে পাঠিয়েছেনও কয়েক বার। কিন্তু সেই টাকা ফেরত এসেছে। অবনীশ একদিন ফোন করে খুব রূঢ়ভাবে বলেছিলেন, প্রণবেশের টাকার দরকার নেই, তাঁর সাহায্য ছাড়াই অনুরাধা আর রুমি বেঁচে থাকতে পারবে।

এদিকে প্রণবেশের কোম্পানির ইমেজটাও রাতারাতি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কীভাবে যেন চাউর হয়েছিল তাঁরা মেয়েমানুষ ঘুষ দিয়ে কাজ জোগাড় করেন। টাকাপয়সা দেওয়া, মদ্যপান করানো—এসব চালু রীতি। এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো না। কিন্তু কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে একটা ছোটখাটো বাঙালি ফার্ম মেয়ে পাঠিয়ে কনট্রাক্ট বাগাচ্ছে, এটা ছিল অভাবনীয়। তা ছাড়া সুলতা সেই রিয়েল এস্টেট কোম্পানির অ্যাডভাইসরটির ফ্ল্যাটে যাওয়ার পর আত্মরক্ষার জন্য এমন হইচই আর কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছিল যে চারশ কোটি টাকার কাজটাও পাওয়া যায়নি।

ঘরে বাইরে, সব দিক থেকে যখন প্রণবেশ বিধ্বস্ত, সেই সময় নিশানাথ বাসুর সঙ্গে তাঁর হঠাৎ যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল। নিশানাথ ছিলেন একজন বিখ্যাত স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার এবং তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী অমলার বাবা। বম্বের একটা বিশাল কনস্ট্রাকশন কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিটের তিনি ছিলেন ডিরেক্টর। কোম্পানির কাজে কলকাতায় এসেছিলেন, তখন একটা বড় হোটেলে প্রণবেশের সঙ্গে তাঁর আলাপ। নিজের থেকে যোগাযোগটা করেছিলেন প্রণবেশ। তাঁর কিছু বাড়ির ডিজাইন দেখে নিশানাথ খুশি হন। জানান, বম্বেতে তাঁদের কোম্পানি কয়েকটা বড় হাউসিং কমপ্লেক্স তৈরি করতে চলেছে। প্রণবেশ সেখানে গেলে একটা কমপ্লেক্সের ডিজাইনের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

কলকাতায় একেবারেই ভাল লাগছিল না। অফারটা পাওয়ামাত্র এখানকার অফিসের দায়িত্ব এমপ্লয়িদের হাতে ছেড়ে দিয়ে প্রণবেশ বম্বে চলে গিয়েছিলেন। নিশানাথ তাঁদের কোম্পানির গেস্ট হাউসে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেখানে বসেই যে কমপ্লেক্সের কাজ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তার নক্‌শা তৈরি করতেন।

সারাদিন গেস্ট হাউসে নিজের ঘরে কাজের ভেতর ডুবে থাকতেন প্রণবেশ।

মাঝে মাধ্যে যে সাইটে কমপ্লেক্সটা তৈরি হবার কথা সেখানে যেতেন। পরিবেশ অনুযায়ী নক্‌শাটা কতখানি আকর্ষণীয় করা যায়, সেই জন্য চারপাশ খুঁটিয়ে দেখাটা জরুরি। আর যেতেন নিশানাথের অফিসে। ডিজাইনটা কেমন ভেবেছেন কোনওরকম পরিবর্তন করা দরকার কিনা, সব জেনে আসতেন। তবে বেশির ভাগ দিনই অফিসে গেলে ছুটির পর নিশানাথ তাঁকে ওঁদের সান্তাক্রুজের ফ্ল্যাটে নিয়ে আসতেন। প্রণবেশ সম্পর্কে তাঁর মনে কোথাও একটু দুর্বলতার সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি একজন দুর্দান্ত 'ইমাজিনেটিভ' আর্কিটেক্ট বলেই শুধু নয়, তাঁর বাঙালি হওয়াটাও একটা বড় কারণ। আসলে বাংলা ভাষা, বাঙালির কালচার, বাংলা শিল্প সাহিত্য, সব ব্যাপারেই ছিল তাঁর অসীম গর্ববোধ। এজন্য তাঁকে প্রভিন্সিয়াল বা প্রচণ্ড 'শভিনিস্ট' যাই বলা হোক, নিশানাথ গ্রাহ্য করতেন না।

সান্তাক্রুজে যেতে যেতে অমলার সঙ্গে প্রথমে আলাপ, পরে ঘনিষ্ঠতা। অমলার বয়স তখন সাতাশ আটাশ। তাব আগেই ইকনমিকসে এম. এ করার পর মাস কম্যুনিকেশনে একটা কোর্স শেষ করেছিলেন। তারপর ভর্তি হয়েছিলেন ম্যানেজমেন্ট ক্লাসে। সেই সময় তাঁর সেকেন্ড ইয়ার চলছে।

প্রণবেশ কোনও কিছুই গোপন কবেননি। আগেই যে তিনি বিবাহিত, এবং প্রেম করেই যে বিয়েটা হয়েছিল কিন্তু দাম্পত্যজীবন স্থায়ী হয়নি, কোর্ট থেকে তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, এমনকি ডিভোর্সের কারণ—সমস্ত কিছু অমলাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। বার বার বলেছেন, তিনি একজন বিখ্যাত, বিত্তবান এবং সফল পিতার একমাত্র মেয়ে, প্রণবেশের মতো একটি বিবাহবিচ্ছিন্ন পুরুষকে বিয়ে করার মানে হয় না। নিশানাথ হয়তো মেয়েকে নিয়ে অন্য স্বপ্ন দেখেন, তাঁর বিয়ের ব্যাপারে নিশ্চয়ই বিরাট মাপের কোনও পরিকল্পনা করে রেখেছেন। মেয়ে প্রণবেশকে বিয়ে করলে তিনি খুব আঘাত পাবেন। কিন্তু তাঁর মতোই অমলার মধ্যে রয়েছে এক বেপরোয়া জেদ। প্রণবেশকে একবকম কিছুই করতে হয়নি, অমলাই তাঁর মা আর বাবার কাছ থেকে মত আদায় করে নিয়েছিলেন। নিশানাথ এবং তাঁর স্ত্রী মেয়ে একজন ডিভোর্সীকে বিয়ে কবতে চাওয়ায় কতটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, জানা যায়নি; দু'জনেই ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। মেয়ে যথেষ্ট সাবালিকা, শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমতী—তিনি যা করতে চাইছেন, অবশ্যই সবদিক ভেবেচিন্তেই চাইছেন। বাধা দিয়ে সম্পর্কটা তিক্ত করে তোলাব মানে হয় না। নিশানাথরা আপত্তি করেননি, বরং মেয়ের সিদ্ধান্তকে স্বাগতই জানিয়েছেন।

বিয়ের পর প্রণবেশ ঠিক করে ফেলেছিলেন, বম্বেতেই থেকে যা.বেন। বম্বে তখন এক নম্বর 'বুম' সিটি। সারা দেশ থেকে প্রতিদিন আরব সাগরের পারের এই শহরে

ট্রেন বোঝাই হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আসছে—খাদ্যের খোঁজে, কাজের সন্ধানে। বম্বে হল সিটি অফ গোল্ড, সে কাউকে ফেরায় না, হাজার ডানা মেলে সবাইকে আশ্রয় দেয়।

এত মানুষ আসছে। তাদের জন্য ঘরবাড়ি চাই। অবিশ্বাস্য দুরন্ত গতিতে শহর চতুর্দিকে বাড়তে লাগল। মানুষের চাহিদা অনুযায়ী তৈরি হতে লাগল স্যাটেলিট টাউনশিপ, হাজার হাজার হাউসিং কমপ্লেক্স, সিনেমা হল, সুপার মার্কেট, শপিং আর্কেড ইত্যাদি। এ সব নিজের থেকে গজিয়ে ওঠে না। তার জন্য আর্কিটেক্টদের নক্‌শা চাই, মডেল চাই, ডিজাইন চাই।

কাজেই বম্বেতে অফিস খুলে ফেললেন প্রণবেশ। এরপর শুধুই স্বপ্নবৎ সাকসেস স্টোরি। সারা দেশ জুড়ে, এবং দেশের বাইরেও তাঁর স্থাপত্যের সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়ল। অবশ্য এ ব্যাপারে নিশানাথ জামাইকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

বিয়ের এক বছরের ভেতর কলকাতায় গিয়ে ল্যান্সডাউনের অফিসটা তুলে দিয়েছিলেন প্রণবেশ। তবে কেয়াতলার বাড়িটার দায়িত্ব একজন কেয়ারটেকারের হাতে তুলে দিয়ে অনেকটা আগের মতো ছোট একটা অফিস বসিয়ে এসেছেন। সারা বছর সেটা বন্ধ থাকে, তিনি যখন কলকাতায় যান তখন খোলা হয়। এইভাবে দেখতে দেখতে কতগুলো বছর কেটে গেল! রুমির মুখ এখন আর মনে পড়ে না, অনুরাধার মুখটাও স্মৃতিতে অনেক ঝাপসা হয়ে গেছে। তবু তাঁরই ফোন পেয়ে অসময়ে কলকাতায় ছুটে আসতে হল।

অলৌকিক এক টাইম মেশিনে চড়ে সময়ের উজান ঠেলে ঠেলে পঁচিশ তিরিশ বছর আগের সেই দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছিলেন প্রণবেশ। হঠাৎ অডিও সিস্টেমে ঘোষণা শোনা গেল, 'আর কিছুক্ষণের মধ্যে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের এই উড়ান দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাবে। বাইরে এখন তাপমাত্রা আটাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপনারা কৃপা করে সিট বেল্ট...'

চকিত হয়ে জানালা দিয়ে প্রণবেশ লক্ষ করলেন, ধবধবে সাদা, হালকা মেঘপুঞ্জের ভেতর দিয়ে তাঁদের এয়ারক্রাফট জাঁদরেল বাজপাখির মতো কলকাতা এয়ারপোর্টের চকচকে, কালো রানওয়ের দিকে নেমে যাচ্ছে।

।। চার ।।

একটা মাঝারি ফাইবারের সুটকেশে খুব দরকারি কাগজপত্র, ডায়েরি, পেন, আঁকার সরঞ্জাম ছাড়া আর কিছুই আনেননি প্রণবেশ। কেয়াতলায় তাঁদের বাড়ির

ওয়ার্ডরোবে ডজনখানেক শার্ট আর ট্রাউজার সবসময় মজুদ থাকে। কলকাতায় এসে সেগুলো পরেন। বম্বে থেকে ঢাউস বাক্সপ্যাঁটরা বোঝাই করে তাই গাদাগুচ্ছের পোশাক টেনে আনার দরকার হয় না।

ফাইবারের হালকা সুটকেশটা সিটের তলায় রেখে দিয়েছিলেন প্রণবেশ। সাড়ে আটটায় প্লেন কলকাতা এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করলে সেটা তুলে নিয়ে অ্যারাইভাল লাউঞ্জে চলে এলেন।

সেদিন অনুরাধার ফোন পাওয়ার পর ছত্রিশ ঘন্টা অর্থাৎ পুরো দেড়টা দিন প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে প্রণবেশের। কেননা এই অসময়ে কলকাতায় আসার মতো প্রস্তুতি তাঁর ছিল না। যদিও পরশু বম্বে অফিসের দায়িত্ব মহেশকে দিয়েছিলেন তবু খুঁটিনাটি নানা ব্যাপারে মহেশ তো বটেই, অন্য সহকর্মীদের সঙ্গেও কাল ছ'সাতবার এমার্জেন্সি মিটিং করতে হয়েছে। এই সব কারণে কলকাতার বাড়ির কেয়ারটেকার সন্তোষকে ফোন করার কথাটা একেবারেই মাথায় ছিল না। এখানে তাঁর একটা গাড়ি আছে—মারুতি ওমনি। সন্তোষকে জানিয়ে দিলে গাড়ি নিয়ে সে চলে আসত। কিন্তু এখন আর তা ভেবে লাভ নেই।

এয়ারপোর্টের বাইরে এসে ট্যাক্সি নিলেন প্রণবেশ। ভি আই পি রোড ধরে শহরের দিকে যেতে যেতে তাঁর চোখে পড়ছিল দু'ধারে শুধু হাই-রাইজের ছড়াছড়ি—অর্থাৎ কংক্রিটের জঙ্গল। ফি বছরই তিনি এখানে আসেন আর ফি বছরই দেখেন কলকাতার স্কাইলাইন কত দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

জানলার বাইরে হাইরাইজের লাইন, ফাঁকে ফাঁকে গাছপালা, বর্ষার জলে ডুবু ডুবু হঠাৎ একটা লম্বা খাল, কিছু পাখি, মাথার ওপর বর্ষাশেষের ভাসমান মেঘ ইত্যাদি নানা দৃশ্যাবলী তিনি দেখছিলেন ঠিকই কিন্তু সেসব তাঁর মাথায় ছাপ ফেলতে পারছিল না। বার বার অনুরাধার সেই কুড়ি বছর আগের মুখটা তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠছিল। সেদিনের সেই মায়াকাননের পরীর চেহারা কতটা বদলে গেছে কে জানে। পরক্ষণে মনে হল, যে প্রাক্তন স্ত্রীটি তাঁকে চূড়ান্ত অসম্মান করেছে, বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য যার অনমনীয় জেদই একমাত্র দায়ী, বাইরের একটা উটকো মেয়ের জন্য যে তাঁদের দাম্পত্য জীবনটাকে ভেঙে চুরমার করে দিল, তার ডাকে হুট করে চলে না এলেই বুঝিবা ভাল হত। কিন্তু রুমি—তাঁর সন্তান? পাঁচ বছর বয়সের পর আর তার প্রতি কোনও দায়িত্বই তো তিনি পালন করেননি। বা করার সুযোগ পাননি। অনুরাধা যা বলেছেন তাতে ধ্বংসের হাত থেকে মেয়েকে ফিরিয়ে আনা তাঁর কর্তব্য। অবিন্যস্ত, ছন্নছাড়া নানা ভাবনা প্রণবেশের মস্তিষ্কে প্রবল চাপ দিয়ে যেতে লাগল।

সকালের দিকটা রাস্তা টাস্তা মোটামুটি ফাঁকাই থাকে। ভি আই পি রোড থেকে ইস্টার্ন বাইপাস হয়ে, কসবা কানেক্টর দিয়ে তিনি যখন কেয়াতলার বাড়িতে এসে পৌঁছুলেন দশটাও বাজেনি।

উঁচু কমপাউন্ড ওয়াল দিয়ে গোটা চৌহদ্দিটা ঘেরা। মাঝখানে ধবধবে সাদা তেতলা বাড়িটার নাম 'রজনীগন্ধা' ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। এই নামকরণ যাঁর সেই ঠাকুরদাকে একসময় প্রণবেশের কবি বলে মনে হত। সামনের দিকে সবুজ রঙের গেটের পাশে পাঁচিলের গায়ে শ্বেত পাথরের ফলকে বাড়ির নামটা কালো হরফে লেখা আছে। গেটের পর অনেকটা জায়গা জুড়ে যে বাগানটা ষাট পঁয়ষট্টি বছর আগে ঠাকুরদা করে গিয়েছিলেন, সেটা নষ্ট হতে দেননি প্রণবেশ। কেয়ারটেকার সন্তোষের ওপর তাঁর কড়া হুকুম, সারা বছর বাগানের যত্ন নিতে হবে, এ ব্যাপারে কোনও রকম ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না। সন্তোষ বছরের পর বছর মনিবের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করে আসছে। আর প্রণবেশও এভাবে ঠাকুরদার একটি প্রিয় শখকে মর্যাদা দিয়ে চলেছেন।

গেটটা আধ-খোলা ছিল। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে সেটা খুলতেই প্রণবেশ দেখতে পেলেন সন্তোষ একটা বড় কাঁচি দিয়ে বাগানের ফুলগাছের মরা পাতা ছেঁটে দিচ্ছে। তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। গায়ের রং তামাটে, মাঝারি হাইটের নিরেট চেহারা, কাঁচাপাকা চুল চামড়া ঘেঁষে ছোট ছোট করে ছাঁটা। পরনে হাঁটুঝুল হাফপ্যান্ট ছাড়া আর কিছু নেই। বুক পেট কপাল—সব ঘামে আর মাটিতে মাখামাখি।

সন্তোষের বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটা গ্রামে। বাপ-মা ভাইবোন কেউ নেই তার, বিয়েও করেনি, তাই পিছুটানও নেই। কুড়ি বছর আগে এর হাতে বাড়ির দায়িত্ব দিয়ে প্রণবেশ বম্বে চলে গিয়েছিলেন। অবশ্য অনুরাধা যে বছর এ বাড়ি ছেড়ে চলে যান সে বছরই সে কাজে লেগেছিল সে। লোকটা সব দিক থেকেই চৌকস এবং বিশ্বাসী। তার রান্নার হাত চমৎকার। কাজে লাগার পর মোটর ড্রাইভিং শিখে নিয়েছে, মালীর কাজটাও জানে। ফ্রিজ, টোস্টার বা ওয়াশিং মেশিনে খুব বড় রকমের গোলমাল না হলে মেরামতির জন্য লোক ডাকতে হয় না, সন্তোষই সে সব করে ফেলে।

বাগানের পাশ দিয়ে নুড়ির রাস্তা সোজা বাড়ির সামনে গাড়ি বারান্দার দিকে চলে গেছে। ওটা ধরে প্রণবেশ খানিকটা এগুতেই পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়ায় সন্তোষ। কিছুক্ষণ হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর পাতা-কাটা কাঁচিটা ফেলে এক দৌড়ে প্রণবেশের কাছে চলে আসে। তাঁর হাত থেকে স্যুটকেশ নিতে নিতে বলে, 'দাদা, আপনি!' সে প্রণবেশকে দাদাই বলে।

বাড়ির দিকে যেতে যেতে প্রণবেশ বলেন, 'হ্যাঁ। একটা জরুরি কাজে হঠাৎ চলে আসতে হল।'

তাঁর পাশাপাশি চলতে চলতে সন্তোষ বলে, 'একটা ফোন করে দিলেন না কেন? আমি গাড়ি নিয়ে দমদমে চলে যেতাম। রাস্তায় নিশ্চয়ই আপনার খুব কষ্ট হয়েছে।' আগে তার গলায় সাউথ চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক টান ছিল। বহু বছর কলকাতায় থাকার কারণে সেটা পুরোপুরি মুছে গিয়ে সন্তোষ এখন একজন তুখোড় শহরবাসী।

'না না, কষ্ট টষ্ট কিছু হয়নি।' প্রণবেশ বললেন, 'রাস্তায় জ্যাম ছিল না, ট্যাক্সিতে বেশ আরামেই এসেছি।' সন্তোষকে ফোন করার কথাটা যে ভুলে গিয়েছিলেন সেটা আর বললেন না।

হঠাৎ কোন জরুরি কাজ অসময়ে প্রণবেশকে কলকাতায় টেনে এনেছে, সেটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে যায় সন্তোষ। মনিব যখন নিজের থেকে জানাননি, সে সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করাটা ধৃষ্টতা। নিজের অধিকারের সীমা কতদূর পর্যন্ত টানা, সেটা তার অজানা নয়।

কলকাতায় এসে প্রণবেশ তেতলায় থাকে। দোতলায় তাঁর এখানকার অফিস। একতলায় থাকে সন্তোষ। সেখানে কিচেন, ডাইনিং হল এবং গেস্ট রুম।

দু'জনে বাড়িতে ঢুকে সোজা তেতলায় চলে আসেন। এখানে একটা বড় হল-ঘর, তিনটে বেড-রুম। সবগুলোর সঙ্গেই অ্যাটাচড বাথ। গোটা হল-ঘরটাই ড্রইং রুম। এখানে আছে টিভি সেট, বিখ্যাত গায়কদের গানের গাদা গাদা ক্যাসেট। তার মধ্যে রবিশঙ্কর, বিসমিল্লা, আলি আকবর কি মেনুহিনের বাজনার ক্যাসেটও রয়েছে। দেওয়ালগুলো দেশ-বিদেশের নানা শিল্পীর পেইন্টিং দিয়ে সাজানো। এখানে বম্বের মতো রয়েছে একটি দামি লাইব্রেরিও। স্থাপত্য সংক্রান্ত সব প্রয়োজনীয় বই দু কপি করে কেনেন প্রণবেশ। এক কপি থাকে বম্বেতে, এক কপি এখানে। হলটার মাঝখানে তিন সেট সোফা আর সেন্টার টেবল। দক্ষিণ দিকের পুরো দেওয়ালটা কাচ দিয়ে ঘেরা, সেখান থেকে সাদার্ন অ্যাভেনিউর ওধারে লেকের অনেকটা অংশ চোখে পড়ে। এই কাচের দেওয়ালের পাশেই একটা বড় টেবল। সেটার ওপর দুটো টেলিফোন, কিছু ফাইল, আঁকার কিছু সরঞ্জাম ইত্যাদি। কলকাতায় এলে এখানে বসেই আঁকার কাজ করেন প্রণবেশ। হলটাকে তিনদিকে ঘিরে যে তিনটে বিরাট বেড-রুম রয়েছে সেগুলো মেহগনি কাঠের ভারি ভারি কারুকার্যময় ক্যাবিনেট দিয়ে সাজানো, যেমনটি পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে দেখা যেত। আসলে তাঁর ঠাকুরদা সে আমলে নিজের পছন্দমতো বাড়িটাকে এভাবে সাজিয়ে গিয়েছিলেন।

গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে তেতলা পর্যন্ত সব ঝকঝকে। কোথাও একফোঁটা ধুলোটুলো

চোখে পড়ে না। আসলে বাড়িটার ওপর দারুণ মায়া পড়ে গেছে সন্তোষের। সারাদিন ঝেড়েপুঁছে ধুয়েমুছে ফিটফাট করে রাখে।

প্রণবেশের স্যুটকেশটা হল-ঘরের কোণের টেবলে রেখে সন্তোষ বলে, 'আপনি একটু জিরিয়ে নিন। আমি কফি করে আনছি। এখন আর কী খাবেন?'

প্রণবেশ একটা সোফায় বসে জুতো খুলতে খুলতে শরীর এলিয়ে দিয়েছিলেন। আগে প্লেনে ঘোরাঘুরি করতে খুব ভাল লাগত। দু-তিন ঘণ্টার ভেতর দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত আরামে উড়ে যেতে দারুণ সুখদায়ক এক অনুভূতি হত। আজ কিন্তু একটু ক্লান্তিই লাগছে। অনুরাধার ফোন পাওয়ার পর প্রায় দুটো দিন ধরে যে মানসিক চাপটা চলছে, হয়তো সেই কারণে। বললেন, 'ব্রেকফাস্ট প্লেনেই করেছি। আর কিছু দরকার নেই। শুধু কফি হলেই চলবে।'

'আচ্ছা। দুপুরে কী রান্না করব?'

'তোমার যা ইচ্ছে—'

'মাছ-মাংস বাড়িতে কিছু নেই। আপনাকে কফি দিয়ে আমি চট করে বাজারটা ঘুরে আসছি।'

সন্তোষের হাতে বাড়তি টাকা দেওয়া থাকে। কখন কী এমার্জেন্সি হয়ে পড়বে, আগে থেকে তো জানা যায় না। বম্বে থেকে টাকা পাঠাতে পাঠাতে হয়তো দেরি হয়ে যাবে। প্রণবেশ বললেন, 'ঠিক আছে—'

হল পেরিয়ে সন্তোষ যখন সিঁড়ির কাছাকাছি চলে গেছে, হঠাৎ কী মনে পড়ায় প্রণবেশ তাকে ডাকলেন, 'শোন—'

সন্তোষ ফিরে এসে উৎসুক চোখে তাকায়।

প্রণবেশ বলেন, 'এক মহিলা ক'দিন আগে তোমার কাছ থেকে আমার বম্বের ফোন নাম্বার নিয়েছিলেন?'

সন্তোষ বলে, 'হ্যাঁ।'

'কই আমাকে বলোনি তো।'

'উনি বললেন ফোন করে যা জানাবার আপনাকে জানাবেন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনাকে এ নিয়ে কিছু বলব কিনা। উনি বললেন দরকার নেই। তাই—'

একটু ভেবে প্রণবেশ বলেন, 'মহিলা কি আর ফোন করেছিলেন?'

সন্তোষ বলে, 'না।'

'ঠিক আছে, যাও।'

সন্তোষ চলে গেল।

দূরমনস্কর মতো প্রণবেশ ভাবলেন, অনুরাধা হয়তো ধরে নিয়েছেন কাল তাঁর পক্ষে কলকাতায় আসা সম্ভব ছিল না, তাই আর খোঁজ করেননি। আজ নিশ্চয়ই ফোন করবেন। একবার মনে হল, অনুরাধাকে নিজেই ফোন করে তাঁর আসার খবরটা জানিয়ে দেবেন। পরক্ষণে ঠিক করলেন, এখন থাক।

দশ মিনিটের ভেতর কফি নিয়ে এল সন্তোষ। প্রণবেশের সমস্ত অভ্যাস এবং কখন কী দরকার সব তার মুখস্থ। সে জানে সকালে ন'টা নাগাদ স্নানটা সেরে ফেলেন প্রণবেশ কিন্তু বম্বে থেকে ভোরবেলায় যখন তিনি প্লেন ধরেছিলেন তখন আরব সাগরের পারে সূর্যোদয় হয়নি, চারদিক অন্ধকারে ডুবে ছিল। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে অত সকালে স্নান করে বেরোননি।

সন্তোষের মধ্যে রোবটের মতো একটা যান্ত্রিক ব্যাপার আছে। প্রণবেশকে কফি দিয়ে সে তাঁর বেডরুমে গিয়ে ওয়ার্ডরোব থেকে ধবধবে পাজামা-পাঞ্জাবি-তোয়ালে ইত্যাদি বার করে অ্যাটাচড বাথে সাজিয়ে রেখে গিজার চালিয়ে দিল। শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস স্নানের সময় গরম জল চাই প্রণবেশের। শীতকালে বেশি গরম, অন্য সময় অত উষ্ণতার দরকার নেই।

বাথরুম থেকে হল-ঘরে এসে সন্তোষ বলে, 'গরম জলের কল চালানো রইল। আমি বাজারে যাচ্ছি—'

ঘণ্টাদেড়েক বাদে আবার তেতলায় উঠে আসে সন্তোষ। এর মধ্যে বাজার, রান্না সব শেষ করে ফেলেছে সে।

এদিকে শেভ টেভ করে, স্নান সেরে, পোশাক টোশাক পালটে কাচের দেওয়ালের পাশের টেবলে এসে বসেছেন প্রণবেশ। জুহুর যে হোটেল কমপ্লেক্সের নক্‌শাটা শেষ না করেই চলে আসতে হল সেটা এখন তাঁর সামনে পড়ে আছে। নষ্ট করার মতো অঢেল সময় তাঁর নেই। কাজটা কমপ্লিট করে ফেলা দরকার কিন্তু একটা লাইনও টানতে ইচ্ছা করছে না। উদাসীন চোখে কিছুক্ষণ স্কেচটা দেখে মুখ ফিরিয়ে কাচের দেওয়ালের বাইরে তাকালেন প্রণবেশ। বম্বেতে এ বছরের মতো বর্ষা শেষ হয়ে এলেও কলকাতায় তার রেশ এখনও থেকে গেছে। রোদ তেমন নেই। আকাশের জলকণাবাহী মেঘগুলো যেভাবে মিলেমিশে জমাট বাঁধার ষড়যন্ত্র করছে তাতে কিছুক্ষণের ভেতর যদি তোড়ে দু-এক পশলা নেমে যায় অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। আগস্টের এই স্যাঁতসেঁতে দুপুরে কাছাকাছি সাদার্ন অ্যাভেনিউতে গাড়িটাড়ি তেমন নেই। দূরে লেক, ঘন সবুজ গাছপালা, তার ওধারে বজবজ লাইন পার হয়ে লেক গার্ডেনসের বাড়ি টাড়ি—সব যেন জলে-ধোয়া ঝাপসা পেইন্টিং-এর মতো। এসব দেখছিলেন ঠিকই, তাঁর কান কিন্তু ছিল টেলিফোনের দিকে।

কলকাতার বাড়িতে পৌঁছুবার পর দু ঘন্টা কেটে গেছে, কিন্তু এখনও অনুরাধার ফোন আসেনি।

কখন যে সন্তোষ টেবলের ওধারে এসে দাঁড়িয়েছে, খেয়াল করেননি প্রণবেশ। তার ডাকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

সন্তোষ বলে, 'বারোটা বাজে। ভাত নিয়ে আসব?'

কলকাতায় থাকলে খাওয়ার জন্য নিচে ডাইনিং হল-এ যান না প্রণবেশ। কাজ করতে করতে এই টেবলে বসেই ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ডিনার খেয়ে নেন। এখানকার খাবারের তালিকাও বম্বের থেকে আলাদা। বম্বেতে ডিম টোস্ট মাখন কলা ইত্যাদি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে অফিসে ছোটেন। দুপুরে ভাত-টাত নয়, স্রেফ দু পিস চিকেন বা ভেজিটেবল স্যান্ডউইচ। রাত্তিরে বাড়ি ফিরে চাপাটি, গ্রিন ভেজিটেবলস, ডাল, মাংস, পাঁপড় এবং একটা লাড্ডু বা প্যাঁড়া। রবিবার শুধু ভাত খান। কলকাতায় দু-বেলা ভাত চাই, সেই সঙ্গে কম করে দু'রকমের মাছ, ডাল, তরকারি, ভাজা এবং ক্ষীরের মতো জমাট দই। স্থান-মাহাত্ম্য আর কী। দু'মাস পর যখন তিনি বম্বে ফিরে যান ততদিনে তিন কেজি ওজন বেড়ে গেছে।

প্রণবেশ বলেন, 'আনো। খেয়ে নেওয়া যাক। কাল থেকে একটার আগে কিন্তু খাব না।'

'আচ্ছা—'

দেড় ঘণ্টার ভেতর সন্তোষ যা সব রেঁধেছে তাকে রাজকীয়ই বলা যায়। সরু চালের ঝরঝরে ভাত, ডিমওলা তপসে ভাজা, দই ইলিশ, নারকেল-সর্ষে দিয়ে পাবদা, ঘন মুসুর ডাল, আলু-পটলের তরকারি, আনারসের চাটনি আর দই। এই সব সুখাদ্যের প্রতিটিই তাঁর প্রিয়। অন্য বার খেতে বসে সন্তোষের রান্নার তারিফ করতে করতে মজার গলায় প্রণবেশ বলেন, 'এই সব খাইয়ে কোলেস্টেরল বাড়িয়ে আমার হার্ট অ্যাটাক করে ছাড়বে দেখছি।' এবার কিন্তু কিছুই বললেন না, অন্যমনস্কর মতো খেয়ে যেতে লাগলেন।

খাওয়াটা যখন আধাআধি হয়ে এসেছে সেই সময় ফোন বেজে ওঠে। হৃৎপিণ্ডের ধকধকানি পলকের জন্য বন্ধ হয়ে যায় যেন। তারপর ব্যগ্রভাবে বাঁ হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিতেই—না, অনুরাধা নয়, বহুদূর বম্বে থেকে অমলার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'হ্যালো, ঠিক সময়ে কলকাতায় পৌঁছেছিলে তো?'

একটু কি হতাশ হলেন প্রণবেশ? এটা তো শতকরা একশ ভাগ সত্যি, এই মুহূর্তে অমলাকে তিনি আশা করেননি। নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন 'হ্যাঁ হ্যাঁ—প্লেন রাইট টাইমে ল্যান্ড করেছে। দশটার ভেতর বাড়ি পৌঁছে গেছি।'

'কলকাতার খুব উন্নতি হয়েছে দেখছি। আগে তো এয়ারপোর্ট থেকে কেয়াতলায় পৌঁছুতে তিনঘণ্টা লেগে যেত।'

'না, আজকাল সে প্রবলেম নেই।'

'কী করছ এখন?'

'খাচ্ছি—'

'লাঞ্চ?'

'হ্যাঁ, দুপহরকা ভোজন।' একটু মজা করেই বললেন প্রণবেশ।

'সো আর্লি!' অমলা যে অবাক হয়েছেন সেটা তাঁর গলা শুনেই টের পাওয়া যায়।

প্রণবেশ বলেন, 'কী করব? জুহুর সেই হোটেল কমপ্লেক্সের হাফ-কমপ্লিট ড্রয়িংটা নিয়ে বসেছিলাম, সন্তোষ বলল রান্না হয়ে গেছে। তাই খেতে বসে গেলাম।'

'কলকাতায় গেলে তুমি কিন্তু খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে লিমিট ছাড়িয়ে যাও। বুঝেসুঝে খাবে।'

প্রণবেশ টেবলের ওপর সাজানো খাদ্যবস্তুগুলোর দিকে দ্রুত একবার তাকিয়ে নেন। অর্ধেক খাওয়ার পরও মস্ত প্লেটে এক ফুট লম্বা পাবদা মাছ এবং ইলিশের দুটো বড় পেটি রয়েছে। দই, চাটনি তো ছোঁয়াই হয়নি। অমলা এসব দেখলে স্রেফ ভিরমি খেতেন। হেসে হেসে তিনি বলেন, 'অত ভেবো না। আমি কি ছেলেমানুষ! কী খেতে হবে না হবে, জানি না!'

'জানলেই ভাল। একটা কথা শুধু মনে করিয়ে দিচ্ছি, তোমার কিন্তু ভীষণ কোলেস্টেরলের টেনডেন্সি—'

'মনে আছে।'

'শুভ আর তোড়া তোমার সঙ্গে কথা বলবে।'

'সে কি, ওরা এখনও বাড়িতে! আজ ক্লাস নেই?'

'শুভর একটা ক্লাস আছে সেই আড়াইটেয়। দেড়টার সময় বেরুবে। তোড়া স্কুলে গিয়েছিল, ওদের একজন টিচার মারা গেছেন। কনডোলেন্স মিটিংয়ের পর ছুটি হয়ে গেছে। এই নাও—কথা বল—'

একটু পর শুভর গলা ভেসে আসে, 'বাবা, তুমি কলকাতায় গেছ। আমরা কিন্তু তোমাকে ভীষণ মিস করছি। তোমাকে ছাড়াই আজ আমাদের ব্রেকফাস্ট করতে হয়েছে। এত 'ডাল' লাগছিল!'

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রণবেশের সম্পর্ক একেবারে বন্ধুর মতো। পরস্পরের মধ্যে 'অ্যাটাচমেন্ট'টা বড় বেশি রকমের। দুপুরে ওদের স্কুল কলেজ থাকে, তিনি অফিসে

যান। তখন আর হয়ে ওঠে না। তবে ছুটির দিনে ব্রেকফাস্ট থেকে ডিনার পর্যন্ত সবাই একসঙ্গে বসে খান। সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে শুধু রাতের খাওয়া আর ব্রেকফাস্ট।

সস্নেহে প্রণবেশ বলেন, 'আরে বাবা, পুরো ছ'ঘণ্টাও হয়নি আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, এর মধ্যে মিস করতে শুরু করলে!'

'ইয়া বাবা, তাড়াতাড়ি চলে এসো।'

'আসব, আসব।'

'কলকাতা থেকে যখন ফেরো, প্রত্যেক বার তোমার ওয়েট অনেক বেড়ে যায়। এবার যদি বাড়ে স্ট্রেট হেলথ ক্লাবের ডায়েটিসিয়ানদের কাছে নিয়ে যাব। ওরা এক্সট্রা ওয়েট কমানোর জন্যে কী খেতে দেয় জানো তো—সারাদিনে দু' কাপ ভেজিটেবল স্যুপ আর জল। তখন কিন্তু চেঁচামেচি করতে পারবে না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'লাস্ট উইকে তোমার ওয়েট নেওয়া হয়েছিল—সেভেনটি থ্রি কেজিস অ্যান্ড ফাইভ হানড্রেড গ্রামস। কলকাতা থেকে ফিরে এলেই তোমাকে কিন্তু ওয়েইং মেশিনে বসিয়ে দেব। দেখব. কতটা ওজন বাড়িয়ে এসেছ।'

কণ্ঠস্বরে নকল বিরক্তি ফুটিয়ে প্রণবেশ বলেন, 'এই ছেলেটা বক বক করে মাথা খারাপ করে দেবে দেখছি। অনেক হয়েছে, এবার তোড়াকে ফোন দে।'

টেলিফোনটা যে হস্তান্তরিত হয়েছে সেটা টের পাওয়া গেল। একটু পরেই তোড়ার গলা ভেসে আসে, 'বাবা, কলকাতায় বেশিদিন থেকো না। তাড়াতাড়ি চলে এসো।'

'আসব, আসব। তোরা সাবধানে থাকিস। খুব রাত জেগে পড়াশোনা করবি না।'

'আমাদের জন্যে ভেবো না। তুমি বরং বেশি স্ট্রেন করো না। আর সেই কথাটা মনে আছে তো?'

'কোনটা রে?'

'সেপ্টেম্বরে আমরা সবাই উটিতে বেড়াতে যাব—'

'নিশ্চয়ই যাব।'

'আগস্ট কিন্তু শেষ হযে আসছে। আর ক'দিন পরেই সেপ্টেম্বর পড়ে যাবে।'

'সেপ্টেম্বরের টেনথ আমরা উটিতে যাচ্ছিই। তার আগে বম্বে চলে আসব। ওক্কে?'

'ওক্কে বাবা—এখন ছাড়ছি—' ওধার থেকে লাইন কেটে দেয় তোড়া।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে আবার খাওয়া শুরু করেন প্রণবেশ। তাঁর সম্বন্ধে ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীর দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগটুকু বড় ভাল লাগল। বারো শ মাইল দূরে

থেকেও ওরা যেন তাঁকে ঘিরে আছে। আশ্চর্য এক সুখানুভূতি কিছুক্ষণ প্রণবেশকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

খাওয়া শেষ হলে বেশিক্ষণ আর বসে থাকতে পারলেন না প্রণবেশ, চোখ জুড়ে আসতে লাগল। অনেকদিন পর দুপুরে ভাত খেয়েছেন, তার ওপর শরীরে ক্লান্তি জমা হয়ে ছিল। এরপর যা অবধারিত তা হল পরিপাটি একটি দিবানিদ্রা। ধীরে ধীরে টেবল থেকে উঠে সোজা বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি।

ঘুম যখন ভাঙল, পাঁচটা বেজে গেছে। চোখেমুখে জল দিয়ে হল-ঘরে নিজের টেবলে এসে বসলেন প্রণবেশ। টানা একটা ঘুমের পর শরীর বেশ ঝরঝরে লাগছে।

হল-ঘরের আলো অনেক ম্লান দেখাচ্ছে। সব কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে, ছায়াচ্ছন্ন। ধীরে ধীরে কাচের দেওয়ালের বাইরে তাকালেন প্রণবেশ। দুপুর থেকে যে কারণে ষড়যন্ত্র চলছিল, সেটা কখন যেন শুরু হয়ে গেছে। বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে একটানা, তবে খুব তোড়ে নয়, ঝির ঝির করে। রোদের ছিটেফোঁটাও নেই। দুটো মাস বম্বেতে তুমুল বর্ষার পর কলকাতায় এসে আবার বৃষ্টির পাল্লায় পড়া গেল। তাতে অবশ্য খারাপ লাগছে না। বর্ষা ঋতুটাকে তিনি পছন্দই করেন। এর মধ্যে কোথায় যেন একটা ক্লাসিকাল গানের মতো ব্যাপার আছে।

লেক বা তার ওধারে রেললাইন, লেক গার্ডেনসের স্কাইলাইন, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টির আড়ালে সব অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

'দাদা—'

সন্তোষের ডাকে মুখ ফিরিয়ে তাকান প্রণবেশ। দুপুরের ঘুমের পর মাথার ভেতরটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই তবু কেন যেন সন্তোষকে দেখামাত্র অনুরাধার কথাটা মনে পড়ে যায়। তিনি জানেন, কলকাতায় এলে সন্তোষ তাঁর কাছাকাছিই থাকে। কখন কী দরকাব হয় তাই ওর থাকাটা ভীষণ জরুরি। তিনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন, নিশ্চয়ই সে তখন হল-ঘরে হামেহাল মজুদ ছিল।

সন্তোষ বলে, 'আমি চার বার আপনার শোবাব ঘরে গিয়ে দেখে এসেছি। আপনি ঘুমোচ্ছেন, তাই ডাকিনি। খানিক আগে নিচে চিঠির বাক্স দেখতে গিয়েছিলাম। এখন কী আনব—চা, না কফি?'

কফিটা যদিও প্রণবেশ খুবই পছন্দ করেন, কিন্তু ভাদ্রের এই বৃষ্টিঝরা বিকেলে হঠাৎ চা খেতে ইচ্ছা হল। বললেন, 'চা নিয়ে এসো। সঙ্গে আর কিছু নয়। দুপুরে যা খাইয়েছ, তারপর দু'দিন না খেলেও চলবে।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যখন ঘুমোচ্ছিলাম তখন কি কেউ ফোন করেছিল?'

'না।'

'ঠিক লক্ষ্য রেখেছিলে তো?'

'নিশ্চয়ই। এই হল-ঘরে সারাক্ষণ বসে ছিলাম।'

'ঠিক আছে, যাও—'

প্রণবেশ ভাবলেন, তিনি কলকাতায় পৌঁছুবার পর এগারো বারো ঘণ্টা পার হতে চলল কিন্তু এখনও অনুরাধার ফোন এল না। তিনি কথা দেওয়া সত্ত্বেও কি অনুরাধা বিশ্বাস করতে পারেননি যে সত্যিই আসবেন? নাকি তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল করে ফেলেছেন—প্রণবেশের সাহায্য নেবেন না। ভেতরে ভেতরে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে থাকেন তিনি।

সন্তোষ চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল। মনিবকে শুধু চা দিয়েই সে সন্তুষ্ট নয়, তার সঙ্গে কিছু কাজু বাদাম আর নোনতা বিস্কুটও এনেছে। সে সব টেবলে রেখে হল-ঘর তো বটেই, বেড-রুমের আলো জ্বালিয়ে দিল।

প্রণবেশ কাপে লিকার এবং দুধ ঢেলে তাঁর সঙ্গে সুগার কিউব মিশিয়ে চা তৈরি করে নিলেন। তারপর অন্যমনস্কর মতো আস্তে আস্তে চুমুক দিতে লাগলেন। কাজু বা বিস্কুট ছুঁলেনও না।

হল-ঘরের কোণের দিকে একটা লম্বা গ্র্যান্ডফাদার ক্লক রয়েছে। সেটা যখন অর্কেস্ট্রার মতো সুরেলা আওয়াজ করে জানিয়ে দিল ছ'টা বাজে, সেই সময় ফোন বেজে ওঠে।

কিন্তু এবারও নিরাশ হতে হল। বম্বে অফিস থেকে মহেশ ফোন করেছে। সে জানাল, প্রণবেশ যেন কোনওরকম দুশ্চিন্তা না করে, ওখানকার কাজকর্ম তাঁর গাইডলাইন অনুযায়ী মসৃণভাবে চলছে।

মহেশ আদ্যোপান্ত প্রফেসনাল, 'ম্যাজিক ক্রিয়েশান'-এর বিজনেস ছাড়া অন্য কিছুই বোঝে না। তাকে বলা হয়েছিল কলকাতার একটা বিশাল প্রোজেক্টের জন্য হুট করে প্রণবেশকে চলে আসতে হয়েছে। সে ব্যাপারে যাদের প্রোজেক্ট তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কিনা, জানতে চাইল মহেশ। প্রণবেশ বললেন, 'এখনও করিনি। আশা করি দু-একদিনের ভেতর করতে পারব। তখন তোমাকে সব জানিয়ে দেবো।'

ফোনটা ছেড়ে দেওয়ার পর প্রণবেশ দুটো ব্যাপারে মনস্থির করে ফেললেন। প্রথমত, রুদ্ধশ্বাসে টেলিফোনের সামনে বসে থেকে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। দ্বিতীয়ত, কালকের দিনটাও তিনি দেখবেন। এর মধ্যে অনুরাধা যদি ফোন না করেন, পরশু মর্নিং ফ্লাইটে বম্বে ফিরে যাবেন।

অবিন্যস্ত, এলোমেলো মনটাকে গুছিয়ে নিয়ে হোটেল কমপ্লেক্সের ড্রয়িংটার হাত দিলেন। প্রণবেশ। তারপর কখন যে কাজের ভেতর ডুবে গেলেন মনে নেই।

কতক্ষণ পর, প্রণবেশের খেয়াল ছিল না, ফোন বেজে ওঠে। চকিত হয়ে সেটা তুলে দিলেন। কলকাতায় এলে রাতেও ফোন করেন অমলা। ভেবেছিলেন, তিনিই করেছেন। কিন্তু ওধার থেকে এবার অনুরাধার গলা ভেসে আসে, 'হ্যালো, আমি অনু—'

যাঁর জন্য বম্বের সব কাজ ফেলে, ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীর সঙ্গে মিথ্যাচার করে কলকাতায় ছুটে এসেছেন, এতক্ষণে তাঁর ফোন এল। শরীরের সমস্ত রক্তস্রোত পলকের জন্য থমকে ফের দুরন্ত গতিতে ছুটতে শুরু করে। প্রণবেশ বলেন, 'আমি সকালের ফ্লাইটে চলে এসেছি। তারপর থেকে সারাদিন তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'আমি জানতাম তুমি আসবে। কিন্তু অফিসের কাজে হঠাৎ কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল। সেখান থেকে অনেক বার তোমাকে ফোন করতে চেষ্টা করেছি কিন্তু ওখানকার এক্সচেঞ্জে কী একটা গোলমাল হয়েছে। কিছুতেই তোমাকে ধরতে পারিনি।'

বেশ অবাকই হন প্রণবেশ। বলেন, 'তুমি চাকরি কর নাকি?'

অনুরাধার কণ্ঠস্বর এবার মৃদু শোনায়। বলেন 'চাকরি না করলে খাব কী?'

একটু চুপচাপ।

তারপর অনুরাধা ফের শুরু করেন, 'দাদা তো খুব ভাল কিছু মাইনে পেত না। তাই আমাকে—' বলতে বলতে থেমে যান।

প্রণবেশ ভাবেন, জীবনযাপনের জন্য অনুরাধার এত কষ্ট করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তিনি তাঁর আর রুমির জন্য যে টাকা মাসে মাসে দিতে চেয়েছিলেন তাতে আরামেই কাটিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু অনুরাধা গোঁ ধরে বসে রইলেন তাঁর পাঠানো কিছুই ছুঁয়ে দেখবেন না। কী প্রয়োজন ছিল এই কৃচ্ছ্রসাধনের? এ সব কথা ভাবা যায় কিন্তু কুড়ি বছর যাঁর সঙ্গে আইনসঙ্গত সম্পর্ক নেই তাঁকে তা বলা যায় না। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী অফিস তোমার? কোন ধরনের কাজ করতে হয়?'

'একটা প্রাইভেট ফার্ম। নানা টাইপের কনজিউমার প্রোডাক্টের ওরা সোল এজেন্ট। আমি ওদের সেলসে আছি। সেই ব্যাপারেই আমাকে কাল চন্দননগরে যেতে হয়েছিল।' অনুরাধা বললেন।

একদিন যার গলায় ছিল সুরের ম্যাজিক, বেঙ্গলি লিটারেচারের যে ছিল মেধাবী

ছাত্রী, সে কিনা মাল বেচে বেড়াচ্ছে? কিন্তু এ কথাও বলা গেল না। প্রণবেশ চুপ করে রইলেন।

অনুরাধা এবার বলেন, 'তোমার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার। ফোনে সব কথা হয় না। সামনাসামনি বসে সব বলতে হবে।'

প্রণবেশ বলেন, 'ঠিক আছে। কোথায় দেখা হবে বল—'

'বুঝতে পারছি না। তুমি একটা জায়গা ঠিক কর।'

'আমাদের বাড়ি আসা কি তোমার পক্ষে সম্ভব?'

'না না ওখানে গেলে কে দেখে ফেলবে। তাতে অশান্তিই শুধু বাড়বে।' গলা শুনে বোঝা যায় কেয়াতলায় যাওয়ার কথায় চমকে উঠেছেন অনুরাধা।

এদিকটা খেয়াল করেননি প্রণবেশ। অনেকখানি ঝোঁকেব মাথায় বলে ফেলেছিলেন। একদা যেখানে ছিল অনুরাধার একচ্ছত্র অধিকার আজ সেখানে যাওয়া যে কতটা দুরূহ তা মনে পড়তেই ভীষণ অস্বস্তি বোধ কবতে থাকেন। বলেন, 'রাইট। যে জন্যে আমাদের এখানে তোমার আসা অসম্ভব, একই কারণে আমিও তোমাদের বাড়ি যেতে পারি না।'

অনুরাধা উত্তর দিলেন না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে প্রণবেশ বলেন, 'কাল অফিস থেকে ছুটি নিতে পারো?'

অনুরাধা বলেন, 'পারব। ক্যাজুয়াল, মেডিক্যাল আর আর্নড লিভ মিলিয়ে আমার অনেক ছুটি পাওনা আছে।'

'কাল পাতাল রেলের কালিঘাট স্টেশনের সামনে—রাসবিহারীর দিকটায়, ঠিক ন'টায় ওয়েট করো। আমি ওখান থেকে তোমাকে তুলে নেবো। কোথায় গিয়ে বসা যায় তখনই ঠিক করা যাবে।'

'আচ্ছা।'

'রুমি বাড়ি আছে?'

'না। ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার নাম করে বেরিয়েছে। এখনও ফেরেনি।'

গ্র্যান্ড ফাদার ক্লকটার দিকে তাকিয়ে প্রণবেশ বললেন, 'এখন ন'টা বেজে সাতাশ। তাব ওপর বৃষ্টি পডছে। এত রাত পর্যন্ত বাইরে কী করছে?'

অনুরাধা বিরক্ত সুরে বলেন, 'জানি না। রোজই তো এরকম রাত হয়। কী করে বেড়ায়, সে-ই জানে। আমাকে কি গ্রাহ্য করে? একবার উচ্ছন্নে গেছে।'

'কখন ফিরবে বলে যায়নি?'

'না। প্রয়োজন বোধ করেনি। তোমাকে পরশুই তো বলেছি, ও কিরকম হয়ে উঠেছে।'

'বারোটা পর্যন্ত আমি কাজ করব। ও ফিরে এলে আমাকে ফোন করতে বলো।'

'বলব।'

ফোন নামিয়ে রেখে আবার স্কেচ পেন্সিল নিয়ে টেবলের ওপর ঝুঁকে পড়েন প্রণবেশ। কিন্তু এবার আর তেমন মনঃসংযোগ ঘটানো যাচ্ছে না। পরশু ফোনে যখন অনুরাধা রুমির দেরি করে বাড়ি ফেরার কথা বলেছিলেন তখন ততটা গুরুত্ব দেননি। পঁচিশ বছরের এক তরুণী, যথেষ্ট 'অ্যাডাল্ট' এবং আত্মরক্ষার ক্ষমতা তার আছে, এরকম কিছু মন্তব্য তিনি করে থাকবেন। তখন হয়তো খেয়াল করেননি, অনুরাধা যে ধরনের নরম স্বভাবের মানুষ তাঁর পক্ষে রুমির মতো বেপরোয়া একটি মেয়েকে কঠোর শাসনে রাখা অসম্ভব। প্রচণ্ড এক দুশ্চিন্তা চুঁইয়ে চুঁইয়ে প্রণবেশের ভেতরে ঢুকে সব বিক্ষিপ্ত করে দিতে থাকে।

বারোটা পর্যন্ত টেবলের সামনে বসে রইলেন ঠিকই কিন্তু পেন্সিল দিয়ে এলোমেলো দু-চারটে লাইন টানা ছাড়া আর কিছুই করা গেল না। এর মধ্যে বম্বে থেকে অমলা আবার ফোন করেছেন। নতুন কিছু নয়, দুপুরে যা বলেছিলেন প্রায় সেই কথাগুলোই দ্বিতীয় বার শুনতে হল। তবে হরিশ মুখার্জি রোড থেকে রুমির ফোন এল না।

।। পাঁচ ।।

পরদিন সকালে স্নান এবং ব্রেকফাস্ট সেরে সাড়ে আটটায় তাঁদের মারুতি ওমনিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন প্রণবেশ। কেয়াতলা থেকে পাতাল রেলের কালিঘাট স্টেশন গাড়িতে খুব বেশি হলে সাত আট মিনিটের পথ। তা ছাড়া এই সকালের দিকটায় ট্রাফিক তেমন একটা থাকে না। তবে কলকাতাকে বিশ্বাস নেই। কখন, কী কারণে আচমকা জ্যাম হয়ে যাবে, এমন ভবিষ্যদ্বাণী করা এখানে অসম্ভব। তাই একটু আগে আগে যাওয়াই ভাল।

প্রণবেশ কলকাতায় এলে সন্তোষ গাড়িটা চালিয়ে থাকে। কিন্তু আজ তিনি নিজেই ড্রাইভ করছেন। কোথায় যাচ্ছেন, কার সঙ্গে দেখা করছেন, সে ব্যাপারে কোনও প্রত্যক্ষদর্শী না থাকাই বাঞ্ছনীয়। হাওয়ায় হাওয়ায় খবরটা যে বম্বে পর্যন্ত পৌঁছে যাবে না, তেমন কোনও গ্যারান্টি তো নেই। 'সাবধানের মার নেই'—এই আপ্তবাক্যটি মাথায় রেখে তিনি তাই একাই চলেছেন।

কলকাতার খামখেয়ালি চরিত্র সম্পর্কে ভূভারতে হাজার বদনাম। যখন তখন এখানে সামান্য ছুতোনাতায় তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়। আজ কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ছে না। শহর খুব শান্ত, রাস্তা মোটামুটি ফাঁকা। কাঁটায় কাঁটায় আট মিনিটের

মাথায় টিউব ট্রেনের কালিঘাট স্টেশনের সামনে চলে এলেন প্রণবেশ। রাসবিহারী অ্যাভেনিউর ওপর স্টেশনের যে গেট তার ঠিক উল্টোদিকে যেখানে লাইন দিয়ে গড়িয়াহাটা আর বালিগঞ্জের অটোগুলো দাঁড়িয়ে থাকে তার পাশে গাড়ি পার্ক করে ভেতরেই বসে রইলেন। তাঁর চোখ কালিঘাট স্টেশনের গেটের দিকে স্থির হয়ে রইল। কিন্তু কোনও মহিলাকেই ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে না।

অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ একটা চিন্তা প্রণবেশের মাথায় ঢুকে যায়, তিনি কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। কুড়ি বছর আগে অনুরাধাকে শেষ যখন দেখেছিলেন তখন তাঁর বয়স আর কত? বত্রিশ তেত্রিশ। তাঁর সেই সময়কার চেহারাটাই স্মৃতিতে থেকে গেছে। কিন্তু কুড়িটা বছর তো কম সময় নয়। এতদিনে তিনি কি আর তেমনটিই আছেন? সময়ের অদৃশ্য মেক-আপম্যানের হাতে তাঁর চেহারা ভেঙেচুরে এখন কেমন দাঁড়িয়েছে কে জানে। হয়তো তাঁকে চেনাই যাবে না। প্রণবেশ এক ধরনের অস্থিরতা বোধ করেন। কাল যদি অনুরাধাকে বলে দিতেন, সবুজ সাদা বা অন্য কোনও বিশেষ রঙের শাড়ি পরে আসতে তা হলে চিনে নিতে অসুবিধা হত না। কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই।

এদিকে রাস্তায় গাড়িটাড়ি এবং লোকজন দ্রুত বেড়ে চলেছে। স্টেশনের কাছে বেশ ভিড়। অফিস আওয়ার্স যে শুরু হয়েছে, সেটা বোঝা যায়।

ন'টা বাজতে যখন দু-এক মিনিট বাকি সেই সময় অনুরাধাকে দেখতে পেলেন প্রণবেশ। রসা রোডের দিক থেকে এসে, স্টেশনে ঢোকার মুখে যে ক'টা সিঁড়ি রয়েছে সেগুলো ভেঙে বড় চাতালের মতো জায়গাটায় উঠে উৎসুক চোখে এদিকে সেদিকে তাকাচ্ছেন তিনি, একবার কবজি উলটে ঘড়িও দেখে নিলেন।

দেখামাত্র চিনতে পেরেছেন প্রণবেশ। দূর থেকে যা বোঝা গেল, সময় অনুরাধাকে তেমন বদলে দিতে পারেনি। টের পেলেন, বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড উথল পাথল হয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ল, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় একেক দিন একেক জায়গা আগে থেকে ঠিক করে তিনি বা অনুরাধা দাঁড়িয়ে থাকতেন। তারপর অন্যজন এলে অনেক দূরে কোথাও চলে যেতেন। যৌবনের সেই দিনগুলোতে জীবন ছিল চঞ্চল, বেপরোয়া, অনেকখানি বাধাবন্ধহীন। কিন্তু এখন তাঁরা ধীর, স্থির, পরিণত। প্রৌঢ়ত্বের সীমানা দু'জনেই প্রায় পেরুতে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে কোনওরকম আইনসঙ্গত সম্পর্ক নেই! বিবাহবিচ্ছেদের সঙ্গে সব শেষ হয়ে গেছে। ঈশ্বর জানেন, রুমির জন্যই তিনি কলকাতায় এসেছেন। এই যে পাতাল রেল স্টেশনের কাছে অনুরাধাকে অপেক্ষা করতে বলেছেন, তা-ও রুমির জন্যই। প্লেনে বসে থেকে আসতে আসতে যে প[illegible]শ্চর্য টাইম মেশিন তাঁকে তিরিশ বছর আগে [illegible]

গিয়েছিল, সেটাই আরেক বার যৌবনে পৌঁছে দিল। সময়ের হাতে কী ইন্দ্রজাল যে থাকে কে জানে। তিরিশ বছর আগে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখা করতেন, এই প্রৌঢ় বয়সে হুবহু আবার তাই করতে চলেছেন।

ঘোরের মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা পেরিয়ে অনুরাধার কাছে চলে এলেন প্রণবেশ। অনুরাধার পরনে ছোট ছোট বুটি দেওয়া হালকা রঙের চওড়া-পাড় টাঙ্গাইল শাড়ি এবং শাড়ির রঙের সঙ্গে রং মিলিয়ে ব্লাউজ। পায়ে সরু ফিতের স্লিপার। গয়না বলতে গলায় ছোট লকেট-ওলা একটা চেইন, নাকে রক্তবিন্দুর মতো লাল পাথরের নাকছাবি, ডান হাতে সোনার রুলি, বাঁ হাতে চৌকো ছোট ঘড়ি। চোখে চশমা।

অনুরাধা কোনও দিনই চড়া রং, জবড়জং সাজগোজ, গুচ্ছের গয়না পছন্দ করেন না। চিরকালই ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন তাঁর রুচি। সবই আগের মতো আছে, তবে আগে চশমা ছিল না, সেটা নতুন যোগ হয়েছে।

চেহারা কিন্তু অবিকল কুড়ি বছর আগের মতো নেই। মুখে কিছুটা ভাঙচুর হয়েছে, চোখের তলায় হালকা কালির ছোপ, ত্বকেরও সেই উজ্জ্বলতা আর নেই। গলার কাছটা একসময় ছিল্ল ভরাট, এখন কণ্ঠার হাড় দেখা দিতে শুরু করেছে। মসৃণ সুগোল হাতের দু-একটা শিরাও চোখে পড়ে। সামনের দিকে চুল কিছু উঠে যাওয়ায় কপালটা বেশ বড় হয়ে গেছে। তবে এই বয়সেও যা চুল আছে তা বেশ নিবিড় এবং অঢেল, তার ফাঁকে ফাঁকে মিহি রুপোলি কিছু তার চিক চিক করে। বয়সের এই ছাপটুকু সত্ত্বেও সৌন্দর্যের অনেকগুলি রশ্মি তাঁর মধ্যে এখনও থেকে গেছে।

দু'জন পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে থাকেন। হঠাৎ আবছাভাবে প্রণবেশের খেয়াল হল, কুড়ি বছর আগে অনুরাধার কী যেন একটা ছিল, এখন আর নেই। প্রথমটা ধরতে পারলেন না। পরক্ষণে মনে পড়ে গেল, কপালে বড় করে সিঁদুরের টিপ পরতেন অনুরাধা। মাঠের মাঝখানে সূর্যোদয়ের মতো দেখাত। তা ছাড়া সিঁথিতেও থাকত সরু করে সিঁদুরের টান। এখন সে সবের চিহ্নমাত্র নেই। দুই ভুরু মাঝখানে শুধু হালকা মেরুন রঙের একটা টিপ।

অনুরাধাকে দেখতে দেখতে অকারণেই হয়তো বুকের ভেতর চিনচিনে একটু কষ্ট বোধ করেন প্রণবেশ। ভারি গলায় বলেন, 'এসো আমার সঙ্গে—'

অনুরাধা চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন। নিঃশব্দে প্রণবেশের পাশাপাশি রাস্তা পার হয়ে ওধারে চলে যান। প্রণবেশ গাড়িতে উঠে তাঁর বাঁ দিকের দরজা খুলে বলেন, 'ওঠ—'

যেন নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা কোনওটাই কাজ করছে না অনুরাধার মধ্যে।

যন্ত্রচালিতের মতো তিনি উঠে প্রণবেশের পাশে বসেন।

গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে প্রণবেশ লক্ষ করেন, নিজেকে যতটা সম্ভব গুটিয়ে, আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন অনুরাধা। তিনি এ নিয়ে কিছু বললেন না, শুধু জিজ্ঞেস করলেন, 'একটা ফাঁকা জায়গার কথা কাল ভেবে রেখেছি। সেখানে গিয়ে বসা যাক। তোমার আপত্তি নেই তো?'

আস্তে মাথা নেড়ে অনুরাধা জানিয়ে দেন—আপত্তি নেই।

প্রণবেশের মনে পড়ে, বম্বেতে তাঁর বেশ কিছু বিবাহবিচ্ছিন্ন বন্ধুবান্ধব রয়েছে। ডিভোর্সের পরও প্রাক্তন স্ত্রীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়নি। বন্ধুর মতো তারা মেলামেশা করে, কারও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা নেই। কিন্তু অনুরাধা বড় বেশি মধ্যবিত্ত, প্রচণ্ড ট্র্যাডিশনাল, জন্মগত সংস্কার কাটিয়ে ওঠার মতো জোর তাঁর কোনও দিনই ছিল না, আজও নেই। প্রণবেশ প্রাক্তন স্বামী হলেও একজন পরপুরুষ, তাঁর কাছে সহজ হতে পারা খুবই কঠিন।

ড্রাইভ করতে করতে একসময় চোখের কোণ দিয়ে পার্শ্ববর্তিনীকে দেখে নিলেন প্রণবেশ। অনুরাধা উইন্ডস্ক্রিনেব ভেতর দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখের দৃষ্টি স্থির, ঠোঁট দৃঢ়বদ্ধ. কী ভাবছেন বোঝাব উপায় নেই।

মারুতি ওমনি এলগিন বোডের ক্রসিং পেরিয়ে সার্কুলার রোডের মোড়ে এসে ট্র্যাফিক সিগনালে আটকে গিয়েছিল। প্রণবেশদের সামনে এবং পেছনে অগুনতি প্রাইভেট কাব, বাস. মিনিবাস, স্কুটার লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

অনুরাধাকে দেখার পর থেকে প্রণবেশ এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে রুমিব চিন্তাটা মাথায় ছিল না। অথচ কলকাতায় এসে প্রাক্তন স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে নিয়ে চলেছেন, সেটাও তারই জন্য। মেয়ের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আস্তে করে ডাকেন, 'অনু—'

একটু যেন চমকেই অনুরাধা মুখ ফেরান।

প্রণবেশ জিজ্ঞেস করেন, 'কাল রুমি কখন ফিরল?'

'তোমার সঙ্গে যখন ফোনে কথা বলছিলাম তার পনের কুড়ি মিনিট বাদে।'

'আমি তো তখন জেগে। আমাকে ফোন করতে বলনি?'

'বলেছিলাম—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যান অনুরাধা।

রীতিমত অবাক হয়েই প্রণবেশ জানতে চান, 'করল না কেন?'

মুখ নিচু করে অনুরাধা বলেন, 'ও তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না।'

'কারণ?'

'কারণ— কারণ —' কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে যান অনুরাধা। তাঁকে বিব্রত

দেখায়।

কী একটা আন্দাজ করলেন প্রণবেশ। মনটা খুব খারাপ হয়ে যায় তাঁর। এই সময় ট্র্যাফিক সিগনালে সবুজ আলো জ্বলে ওঠে। জমাট-বাঁধা গাড়ির ঝাঁক আবার গাঁক গাঁক করতে করতে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করে।

প্রণবেশ তাঁর গাড়িটা বাঁ ধারের রাস্তায় নিয়ে আসেন। তারপর একদিকে ক্যালকাটা ক্লাব এবং অন্যদিকে নন্দন, রবীন্দ্রসদনের পাশ দিয়ে ঘুরে চলে যান বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের কাছে। সেখান থেকে সোজা ভিক্টোরিয়ার সামনে এসে ময়দানের সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে।

দূরে চৌরঙ্গিতে, কিংবা রেস কোর্সের পাশের রাস্তাগুলোতে এখন শুধু গাড়ি আর মানুষ। কলকাতার দৈনন্দিন ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। শুরু হয়েছে চতুর্দিকে উর্ধ্বশ্বাস দৌড়।

কিন্তু ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডটা একেবারেই নির্জন। ধারেকাছে কেউ কোথাও নেই। যা কিছু উত্তেজনা, ভিড়, হইচই, হাজার হাজার গাড়ির হর্নের আওয়াজ, সব দূরে দূরে। কলকাতার মাঝখানে দ্বীপের মতো এমন নিরিবিলি জায়গা আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে প্রণবেশ বলেন, 'নামো—'

আজ মেঘটেঘ তেমন নেই। ঝলমলে সোনালি রোদে চারদিক ভেসে যাচ্ছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে কে বলবে কাল বিকেল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত বেশ জোরালো কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

দু'জনে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলেন। রোদে মাঠ অনেকটা শুকিয়ে গেলেও ঘাসের নিচের দিকটা এখনও ভেজা ভেজা। প্রণবেশ বললেন, 'হুট করে বসে পড়ো না। একটু দাঁড়াও—'

গাড়িতে জানালা টানালার ধুলো ঝাড়ার জন্য একটা মোটা ঝাড়ন ছিল। সেটা নিয়ে এসে ঘাসের ওপর পেতে দিতে দিতে বলেন, 'বসো। শাড়িটা এবার আর ভিজবে না।'

একটু কুণ্ঠিতভাবে অনুরাধা জিজ্ঞেস করেন, 'কিন্তু তুমি?'

হেসে হেসে প্রণবেশ বলেন, 'আমার ব্যবস্থাও ভেবে রেখেছি।' জুতো দুটো খুলে পাশাপাশি রেখে তার ওপর রুমাল বিছিয়ে বসে পড়েন তিনি।

অনুরাধার মুখে আলতো একটু হাসি ফোটে। আর কিছু না বলে তিনিও ধীরে ধীরে পা মুড়ে বসেন।

যে উদ্দেশ্যে তাদের এখানে আসা এবার স্বাভাবিক নিয়মে তাই নিয়েই তো

আলোচনা শুরু হওয়া উচিত। কিন্তু অনেকক্ষণ দু'জনে চুপচাপ বসে থাকেন। হঠাৎ পুরনো নস্টালজিয়া প্রৌঢ়, পরিণত, অত্যন্ত প্রফেসনাল এক আর্কিটেক্টের বয়স যেন মুহূর্তে তিরিশ বছব কমিয়ে দেয়। একদা যে বিস্ময়কর নারীটি ছিল জীবনের পরম কাম্য বস্তু, কুড়ি বছর পর সে মাত্র তিন ফুট দূরত্বে বসে আছে। একবার ইচ্ছে হল, হাত বাড়িয়ে তাকে একটু স্পর্শ করেন। কিন্তু তার আগেই অনুরাধা বলে উঠলেন, 'কারণটা তখন জানতে চাইছিলে না?'

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লেগে আচ্ছন্নতা কেটে যায় প্রণবেশের। অনুরাধা আবার তাঁকে এই সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। প্রণবেশ জিজ্ঞেস করেন, 'ও, রুমির ব্যাপারটা তো?'

'হ্যাঁ।'

'বাবার সঙ্গে কথা বলতে ওর আপত্তি কিসের?'

দ্বিধান্বিতভাবে অনুরাধা বলেন, 'সেটা আমার কাছে নাই শুনলে। ওর সঙ্গে যদি দেখা হয় তখন জেনে নিও।'

গলার স্বর খানিকটা উঁচুতে তুলে প্রণবেশ বলেন, 'যদি মানে? ওর সঙ্গে দেখা হবে বলে সব কাজ ফেলে কলকাতায় ছুটে এসেছি। দেখা না করে ভেবেছ আমি ফিরে যাব? রুমিকে আজ একবার কেয়াতলায় আসতে বলো। তার তো আসার বাধা নেই।'

বিষণ্ণ একটু হাসি ফুটে ওঠে অনুরাধার মুখে। তিনি এবার আর কিছু বলেন না।

ভুরু সামান্য কুঁচকে যায় প্রণবেশের। বলেন, 'কী হল, হাসলে যে?'

অনুরাধা এবার বলেন, 'যে তোমার সঙ্গে ফোনেই কথা বলতে চায় না, সে কি কেয়াতলায় যাবে?'

হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো প্রণবেশের মাথায় কিছু একটা খেলে যায়। তাঁর মুখে কাঠিন্য ফুটে বেরোয়। উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলেন, 'কেন যাবে না? সে কি আমাকে ঘৃণা করে? ডাজ শি হেট মি?'

অনুরাধা চুপ।

প্রণবেশ নিজেকে সামলে নেন। তাঁর মনে হয় যে মেয়ের সঙ্গে কুড়ি বছর তাঁর যোগাযোগ নেই, যত কারণই থাক তিনি নিজেও কলকাতায় এসে কখনও তাকে দেখতে চাননি বা ফোন করে খোঁজখবর নেননি, তার তো রাগ, অভিমান থাকতেই পারে। একটা গোপন অপরাধবোধ প্রণবেশকে কিছুক্ষণ ম্রিয়মান করে রাখে। মস্তিষ্কে যে উত্তাপ জমা হয়েছিল তা অনেকটা জুড়িয়ে আসে। মুখ নামিয়ে বলেন, 'ঠিক আছে, আমিই ওর সঙ্গে দেখা করব।'

অনুরাধা প্রণবেশের দিকে এক পলক তাকান। তাঁর মুখে আলোর ছটার মতো কিছু একটা ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। ভীষণ চাপা, অন্তর্মুখী মানুষ তিনি। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি হরিশ মুখার্জি রোডে আসবে?' ভেতরকার আগ্রহ যেন তাঁর কণ্ঠস্বরে মৃদুভাবে নাড়া দিয়ে যায়।

প্রণবেশ বলেন, 'কালই তোমাকে বলেছি ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। মানুষ বেশির ভাগই খারাপ, ক্রুয়েল। তার ওপর তোমার কাকাটি তোমাদের পাশেই থাকেন। আমি গেলে তাঁর রি-অ্যাকশান কী হতে পারে, বুঝতেই পারছ।' একটু থেমে ফের শুরু করেন, 'সবসময় আমি কলকাতায় থাকব না। দু-চারদিন পর বম্বে ফিরে যেতে হবে। তোমার কাকা আর প্রতিবেশীরা তোমার জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে।'

অনুরাধা বলেন, 'তা হলে রুমির সঙ্গে দেখা হবে কী করে?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে প্রণবেশ জিজ্ঞেস করেন, 'ওর ভাল নামটা যেন কী?'

'বৈশালী—বৈশালী মজুমদার। হঠাৎ ভাল নাম জানতে চাইছ?'

'তা না হলে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ওকে খুঁজে বার করব কী করে?'

'তুমি ওর ইউনিভার্সিটিতে যাবে?'

একটু হেসে প্রণবেশ বলেন, 'না গেলে ওকে পাচ্ছি কোথায়? তবে—'

অনুরাধা জিজ্ঞেস করেন, 'তবে কী?'

'রুমিকে তো বড় হওয়ার পর আর দেখিনি। দেখা থাকলে ওকে খুঁজে বার করতে সুবিধে হত।'

'ওকে দেখলেই চিনতে পারবে। নামের দরকার হবে না।'

'মানে?'

অনুরাধা বলেন, 'সেটা তুমি ইউনিভার্সিটিতে গেলেই বুঝতে পাববে।'

কিছুক্ষণ অবাক তাকিয়ে থাকেন প্রণবেশ। তবে এ নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন করেন না। শুধু বলেন, 'কাল কখন ওর ক্লাস শুরু হচ্ছে?'

'রোজই তো এগারোটা নাগাদ বেরিয়ে যায়। বারোটা সাড়ে বারোটায় গেলে দেখা হয়ে যেতে পারে।'

'ঠিক আছে, তাই যাব। তুমি ফোনে পরশু বলেছিলে, রুমি খুব খারাপ সঙ্গে পড়েছে। বদ ছোকরাগুলো কারা, এদের সঙ্গে কোথায় কোথায় সে যায় বলতে পারো?'

অনুরাধা এবার যা বলেন তা এইরকম। চার পাঁচটি ছেলেব সঙ্গেই বেশি মেলামেশা করে রুমি। অবশ্য সে একাই নয়, আরও ক'টা বড়লোকের বয়ে-যাওয়া মেয়েও আছে। ছোকরাগুলোর বাবাদের অঢেল পয়সা। এদের একজন হল গুরনাম

সিং—পাঞ্জাবি, থাকে এলগিন রোডে। ওদের ট্রান্সপোর্টের বিশাল বিজনেস। আরেকজন সিন্ধি, নাম অজয় শিবদাসানি, ল্যান্সডাউন রোডে ওদের বিশাল ফ্ল্যাট। ওর বাবা একজন নাম-কারা শেয়ারব্রোকার। বাকি তিনজন বাঙালি—সুগত, পরিমল আর দীপক। সুগত থাকে সল্টলেকে, ওর বাবা একজন বড় প্রোমোটার। পরিমলদের বাড়ি লেক টাউনে, ওদের ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ফার্ম রয়েছে। দীপক থাকে ওল্ড বালিগঞ্জে, তার বাবা তিনটে সিনেমা হল আর দুটো কোল্ড স্টোরেজের মালিক। পাঁচজনই ড্রিংক ট্রিংক করে থাকে, তবে গুরনাম পুরোপুরি ড্রাগ-অ্যাডিক্ট। এরা সবাই বেপরোয়া, বাপেদের পাহাড় প্রমাণ কালো টাকা থাকলে যা হয় আর কি। তা ছাড়া দু কান-কাটা বজ্জাত, ওরা না পারে এমন কাজ নেই। ওদের সঙ্গে কোথায় কোথায় রুমি ঘোরে অনুরাধা জানেন না। তবে ওঁর ধারণা বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের কোনও একটা ফ্ল্যাটে প্রায়ই যায়। না, রুমিকে কোনও দিন ড্রিংক করে বাড়ি ফিরতে দেখা যায়নি। তবে মাঝে মাঝে গুরনামের মোটর বাইকের পেছনে বসে ফেরে। হরিশ মুখার্জি রোডের ভদ্র, মধ্যবিত্ত পাড়ায় এই নিয়ে চাপা উত্তেজনা চলছে। মা হিসেবে অনুরাধার পক্ষে কাউকে মুখ দেখানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

সব শোনার পর প্রণবেশ জিজ্ঞেস করেন, 'এই স্কাউনড্রেলগুলোর পাল্লায় কী করে পড়ল রুমি?'

অনুরাধা জানান, বাঙালি ছেলে তিনটের কয়েক বছর ধরে ইউনিভার্সিটিতে নাম লেখানো আছে। পড়াশোনা কিছুই করে না, তবে মাঝে মাঝে ক্লাসে যায়। ইউনিভার্সিটিতেই ওদের সঙ্গে রুমির আলাপ। গুরনাম আর অজয়ের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ হয়েছে, অনুরাধা বলতে পারলেন না।

অনেকক্ষণ ভেবে প্রণবেশ বলেন, 'চিন্তা করো না। রুমির ব্যাপারে যা করার আমি করব।'

অনুরাধা ভয়ে ভয়ে বলেন, 'ছেলেগুলো কিন্তু ভীষণ পাজি।'

প্রণবেশকে এবার উত্তেজিত দেখায়। বলেন, 'কলকাতা কি টেক্সাস হয়ে গেছে? রাসকেলগুলোকে কী করে টিট করতে হয় আমি জানি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনুরাধা বলেন, 'রুমির ব্যাপারে আমি একটা কথা ভেবেছি।'

'কী?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর বিয়েটা দেওয়া দরকার। আমি একটা ছেলেও দেখে রেখেছি।'

প্রণবেশ বললেন, 'বিয়ে পরে হবে। আগে ওকে ওই কোম্পানি থেকে বার করে

আনতে হবে।'

অনুরাধার মুখচোখ দেখে মনে হল, যে দুশ্চিন্তা আর মানসিক চাপটা ভেতরে ভেতরে ভেঙেচুরে তাঁকে চুরমার করে ফেলছিল তার অনেকটাই কেটে গেছে। এতদিন ভীষণ অসহায় আর দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর ডাকে বম্বে থেকে ছুটে এসে প্রণবেশ যে পাশে দাঁড়িয়েছেন তাতে মনের জোর কয়েক গুণ বেড়ে গেছে।

কৃতজ্ঞ সুরে অনুরাধা বলেন, 'তুমি আমাকে বাঁচালে। এখন আমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত।'

তাঁর ওপর প্রাক্তন স্ত্রীর নির্ভরতা ভারি ভাল লাগে প্রণবেশেব। তিনি সামান্য হাসলেন শুধু।

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

চারদিকে রুদ্ধশ্বাসে ছুটন্ত গাড়ি আর মানুষের স্রোত দেখে বোঝা যায় কলকাতার ব্যস্ততা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সূর্য উঠে এসেছে মাথার ওপর। রাস্তার ধারের গাছগুলোর ঝুঁটি ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ভাদ্রের উল্টোপাল্টা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে কখনও পুব থেকে পশ্চিমে, কখনও উত্তর থেকে দক্ষিণে।

রুমির সম্পর্কে সমস্ত শোনা হয়ে গেছে। এবার উঠে পড়াই উচিত। কিন্তু হঠাৎ আবার পুরনো নস্টালজিয়া প্রণবেশেব ওপর ভর করে। খুব নিচু গলায় তিনি ডাকেন, 'অনু—'

তাঁর ডাকটায় এমন এক ঝংকার ছিল যে চকিত হয়ে তাকান অনুরাধা। অস্পষ্ট স্বরে কিছু উত্তর দেন তিনি, তার একটি শব্দও শোনা যায় না।

সামনের দিকে ঝুঁকে প্রণবেশ এবার বলেন, 'তোমার কি মনে আছে, ইউনিভার্সিটির ক্লাস পালিয়ে কতদিন দুপুরে আমরা এখানে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিয়েছি।'

স্মৃতিচারণের মধ্যে সংক্রামক কিছু থাকে যা নিঃশব্দে অনুরাধার অস্তিত্বে প্রবেশ করছিল। তাঁর বয়স আচমকাই তিরিশ বছর যেন কমে যায়। মুখ নামিয়ে ধীরে ধীরে তিনি মাথা নাড়েন শুধু।

প্রণবেশ আবার বলেন, 'খালি এই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডেই নাকি, কেউ যাতে টের না পায় সে জন্যে প্ল্যান করে কত জায়গায় না গেছি! তোমার মনে পড়ে?'

মুখটা এবার প্রায় মাটির কাছাকাছি নেমে যায় অনুরাধার। বাতাসের শব্দের মতো ফিসফিস করে বলেন, 'পড়ে।'

'কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখ, কতকাল পরে আমরা আবার এভাবে দেখা করছি।

অথচ—'বলতে বলতে থেমে যান প্রণবেশ।

অনুরাধা উত্তর দেন না, নীরবে বসে থাকেন।

প্রণবেশ একটানা বলে যেতে থাকেন, 'অথচ আজ এরকম লুকিয়ে চুরিয়ে দেখা করার দরকারই হত না। আমাদের জীবন যা স্বাভাবিক তাই হতে পারত—তাই না?'

আচমকা ঘোর কেটে যায় অনুরাধার। তাঁর খেয়াল হয় যে সুরে কথাগুলো প্রণবেশ বলছেন তা নতুন করে জটিলতা সৃষ্টি করবে। এই বয়সে রুমিকে ছাড়া তিনি আর কিছু ভাবতে চান না। তাঁর দুর্বল, নরম স্নায়ুর ওপর অন্য কোনও সমস্যার চাপ পড়লে অনুরাধা শেষ হয়ে যাবেন। ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলেন, 'এবার আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে।'

প্রণবেশ হকচকিয়ে যান। পরক্ষণে তাঁরও মনে হয়, লুকনো, অবরুদ্ধ কোনও আবেগ তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছিল, যেটা এখন একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। অনুরাধা সঠিক জায়গায় তাঁকে থামিয়ে দিয়েছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের মাঝখানে যে অদৃশ্য সীমারেখাটি রয়েছে সেটা পার হওয়া কোনও ক্রমেই উচিত নয়। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান প্রণবেশ। বিষণ্ণ হেসে বলেন, 'হ্যাঁ, চল। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।'

দ্বিধান্বিতভাবে অনুরাধা বলেন, 'কিন্তু—'

অনুরাধার দ্বিধার কারণটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। প্রণবেশ বলেন, 'ভয় নেই, তোমাদের বাড়ির কাছে যাচ্ছি না। আশুতোষ মুখার্জি রোড দিয়ে গিয়ে পূর্ণ সিনেমার সামনে নামিয়ে দেবো।'

নতমুখে অনুরাধা বলেন, 'আচ্ছা।'

কথা বলতে বলতে কিছুক্ষণ আগে একবার মনে হয়েছিল, অনুরাধাকে সঙ্গে নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের কোনও রেস্তোরাঁয় গিয়ে লাঞ্চ খাবেন। কিন্তু সেটা আব বলা হল না।

ফেরার সময় কেউ একটি কথাও বললেন না। সারাক্ষণ চুপচাপ অপবিচিত মানুষের মতো পাশাপাশি বসে রইলেন। অথচ দু'জনেই টের পাচ্ছিলেন বুকেব ভেতর কোনও গভীর গোপন প্রান্তে এমন একটা কষ্ট হচ্ছে যা বোঝানো যায় না।

পূর্ণ সিনেমার উল্টোদিকে গাড়ি থামিয়ে প্রণবেশ শুধু বললেন, 'কাল রুমির সঙ্গে দেখা করার পর কী হল, তোমাকে ফোনে জানিয়ে দেবো।'

গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলেন অনুরাধা, আস্তে মাথা নাড়েন শুধু।

ফের স্টার্ট দিয়ে সোজা যেতে যেতে একবার পিছন ফেরেন প্রণবেশ। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পলকহীন তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছেন অনুরাধা।

কেয়াতলায় ফিরে আসতেই সন্তোষ জানালো, বম্বে থেকে অমলা আর মহেশ এর ভেতর ফোন করেছিল। দারুণ খিদে পেয়ে গিয়েছিল প্রণবেশের। সন্তোষকে ভাত দিতে বলে বোতাম টিপে টিপে প্রথমে অমলাকে ধরলেন তিনি।

অমলা জিজ্ঞেস করেন, 'কোথায় গিয়েছিলে সকালে?'

এই প্রশ্নটা যে অবধারিত সেটা আগেই আন্দাজ করে নিয়েছিলেন প্রণবেশ। এবং স্বয়ংক্রিয় কোনও প্রক্রিয়ায় উত্তরটাও ভেবে রেখেছিলেন। বললেন, 'নতুন একটা প্রোজেক্টের ব্যাপারে একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।'

'সেই আন্ডার-ওয়াটার প্লাজার কী হল?'

'দু-একদিনের ভেতর ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'সাবধানে থাকবে।'

'ঠিক আছে। তুমি আজ কেমন আছ?'

'ভাল, তবে উইকনেস পুরোপুরি কাটছে না। সকালে ডাক্তার পাইকে ফোন করেছিলাম। আরও তিন-চারদিন বাড়িতে রেস্ট করতে বললেন।'

'তাই করো।'

'এখন ছাড়ছি।'

এরপর মহেশকে ফোন করে জানা গেল, অফিস মসৃণ নিয়মে চলছে। প্রণবেশের দুর্ভাবনার কারণ নেই।

সন্তোষ বিরাট ট্রেতে ভাত মাছ,ডাল তরকারি সাজিয়ে নিয়ে এল। বেসিন থেকে হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসে যান প্রণবেশ।

খাওয়া যখন আধাআধি হয়েছে সেইসময় ফোন বেজে ওঠে। সেটা তুলতে যাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যায় এই মুহূর্তে তাঁর কথা ভাবেননি প্রণবেশ। বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে বলেন, 'কী ব্যাপার অনু, এই তো আধ ঘন্টা আগেও আমরা একসঙ্গে ছিলাম। এর মধ্যে কিছু ঘটেছে?' তাঁকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখায়।

ব্যস্তভাবে অনুরাধা বলেন, 'না না, কিছু হয়নি।'

'তা হলে?'

'তোমাকে তখন একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

'কী?'

একটু চুপ করে থেকে অনুরাধা বলেন, 'তোমার খাওয়া দাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

এরকম একটা প্রশ্ন যে অনুরাধা করতে পারেন, এ ছিল অভাবনীয়। রীতিমত অবাক হয়েই প্রণবেশ জিজ্ঞেস করেন, 'হঠাৎ এ কথা জানতে চাইছ?'

'তোমার একসময় তেল মশলাওলা রিচ খাবার খুব ফেভারিট ছিল। এখন বয়স তো হচ্ছে, ওসব খাওয়া ঠিক নয়। এক ডাক্তারের কাছে শুনেছিলাম চল্লিশ পেরুবার পর যতটা সম্ভব ফ্ল্যাট-ফ্রি খাবার খাওয়া ভাল।'

হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে আশ্চর্য এক শিহরণ খেলে যায় প্রণবেশের। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে তাঁর কী জাতীয় সুখাদ্য পছন্দ ছিল, মনে করে রেখেছেন অনুরাধা। কাল প্রায় একই কথা বলেছিলেন অমলা। বার বার তাঁকে কোলেস্টেরল সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন।

প্রণবেশ উত্তর দেওয়ার আগেই অনুরাধা ফের বলেন, 'তোমার কুক ভাল রাঁধে তো?'

প্রণবেশ বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ ভাল।'

'ঠিক?'

'মিথ্যে বলে আমার কী লাভ? আর যদি খারাপ রাঁধেও কী আর করা যাবে?'

'সত্যিই যদি ওর রান্না খেতে কষ্ট হয়, বল। আমি রেঁধে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো।'

প্রণবেশ অনুভব করেন রক্তের ভেতর তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। অসীম তিক্ততার মধ্যে যাঁর সঙ্গে একদিন সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, বিবাহিত জীবনের সমস্ত মাধুর্য ধ্বংস হয়ে পারস্পরিক ঘৃণা এবং বিদ্বেষ ছাড়া কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না—এত সবের পরও সেই অনুরাধা তাঁর খাওয়া দাওয়া, শরীরস্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত। ভেতরকার আলোড়ন শান্ত হলে বললেন, 'না না, পাঠাতে হবে না। আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। সন্তোষ, মানে আমার এখানকার কেয়ারটেকার-কাম-কুক-কাম-মালী খুবই যত্ন করে।'

'ও, আচ্ছা—' বলে চুপ করে যান অনুরাধা।

প্রণবেশ আন্দাজ করতে পারলেন না, অনুরাধা ক্ষুণ্ণ হয়েছেন কিনা। হলেও কিছু করার নেই। হরিশ মুখার্জি রোড থেকে নিয়মিত খাবার দাবার এলে জানাজানি হয়ে যাবার সম্ভাবনা। কেননা কাল থেকে সময় করে বিভিন্ন কোম্পানির হেড কোয়ার্টারে যেতে হবে প্রণবেশকে, যারা আন্ডার-ওয়াটার প্লাজা আর মাটির তলায় বহুতল গ্যারাজ করার পরিকল্পনা নিয়েছিল তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা দরকার। তিনি যে সত্যিই জরুরি কাজে কলকাতায় এসেছেন তার বিশ্বাসযোগ্য কিছু প্রমাণ তো বম্বেতে নিয়ে যেতে হবে। তিনি যখন বাড়িতে থাকবেন তখন যদি অনুরাধা খাবার পাঠান, আর সেই সময়েই যদি অমলার ফোন আসে, সন্তোষ হয়তো কথায় কথায় এটা জানিয়ে দিতে পারে। অমলাকে কতটুকু বললে আর কতটুকু গোপন রাখলে

অশান্তি এড়ানো যায় তা তো কাজের লোককে শিখিয়ে রাখা যায় না। সেটা তাঁর পক্ষে অস্বস্তিকর তো বটেই, সম্মানজনকও নয়। কাজেই অনুরাধাকে এ ব্যাপারে থামিয়ে দেওয়া ভাল।

অনুরাধা এবার বলেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব, যদি তুমি কিছু মনে না কর—'

প্রণবেশ বলেন, 'অত হেজিটেশন কেন? কী বলার বলে ফেল—'

'তোমার চোখের কোলটা খুব ফোলা ফোলা দেখলাম। ডাক্তারদের কাছে শুনেছি বেশি ড্রিংক করলে কোলেস্টেরল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাকি এরকম হয়। তুমি কি—' বলতে বলতে থেমে যান অনুরাধা।

ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছিলেন প্রণবেশ। হঠাৎ দারুণ মজাই লাগে তাঁর। জোরে জোরে শব্দ করে হেসে ওঠেন, হাসির তোড়ে সারা শরীর দুলতে থাকে।

হাসির আওয়াজ টেলিফোনের অন্য প্রান্তেও পৌঁছে গিয়েছিল। অবাক হয়ে অনুরাধা বলেন, 'কী হল, অত হাসছ কেন?'

হাসতে হাসতেই প্রণবেশ বলেন, 'কায়দা করে জেনে নিতে চাইছ তো আমি আগের মতো ড্রিংক করি কিনা?'

অনুরাধা চুপ।

প্রণবেশ থামেননি, সমানে বলে যান, 'কুড়ি বছর আগে আমার লাইফে যে ট্র্যাজেডিটা ঘটে গিয়েছিল, তারপর ড্রিংক প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। তবে বিজনেস চালাতে গেলে পার্টি দিতে হয়, নানা ফাংশন অ্যাটেন্ড করতে হয়। তখন দু-এক পেগ না খেলে চলে না। প্রফেসন বল, বিজনেস বল, সব কিছুর নিয়মই এই।' বলতে বলতে কখন হাসি বন্ধ হয়ে গেছে আর কণ্ঠস্বর ঘন বিষাদে ভারি হয়ে উঠেছে তিনি নিজেই টের পাননি।

অনুরাধা এবার উত্তর দেন না।

প্রণবেশ খানিকটা আত্মবিস্মৃতের মতো ফোনে মুখ ঠেকিয়ে খুব নিচু গলায় ফিস ফিস করেন, 'কি, খুশি তো? আশা করি এতে তোমার আপত্তি নেই।'

সচকিত অনুরাধা বলেন, 'এখন রাখছি—' বলেই লাইনটা কেটে দেন।

ধীরে ধীরে ফোন নামিয়ে রাখেন প্রণবেশ। তারপর অন্যমনস্কর মতো ফের খেতে শুরু করেন।

কাল দুপুরে খাওয়ার পর দুই চোখ জুড়ে এসেছিল, আজ কিন্তু জোর করেই নিজেকে জাগিয়ে রাখলেন প্রণবেশ। প্রচুর মাছভাত খেয়ে প্রচুর দিবানিদ্রা দিয়ে সময় নষ্ট করতে তিনি কলকাতায় আসেননি।

বেসিন থেকে আঁচিয়ে আসতে আসতে টেবল সাফ করে ফেলে সন্তোষ। জুহুর

সেই হোটেল কমপ্লেক্সের ড্রয়িংটা নিয়ে বসে যান প্রণবেশ।

।। ছয় ।।

প্রণবেশের বেশির ভাগ আত্মীয়স্বজনই কলকাতায় থাকেন। কাকারা, পিসিরা, জেঠারা এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা সবার সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক খুব ভাল। যদিও কুড়ি বছর বম্বেতে আছেন তবু পরস্পরের প্রতি তাঁদের গভীর টান। তিনি কলকাতায় এলে প্রথম কাজটা হল কাকা আর পিসিটিসিদের বাড়ি ফোন করা। বম্বের মতোই এখানেও তাঁর প্রচণ্ড কাজের চাপ থাকে। নিজের পক্ষে সবসময় সবার বাড়ি যাওয়া সম্ভব হয় না কিন্তু খুড়তুতো পিসতুতো জেঠতুতো ভাইবোনেরা খবর পাওয়া মাত্রই ঝাঁকে ঝাঁকে কেয়াতলায় চলে আসে। কেউ হয়তো তেল-কই কবে নিয়ে এল, কেউ বাগদা চিংড়ির মালাই কারি, কেউ বা আনল নাম-করা মিষ্টির দোকানের ল্যাংচা বা রাবড়ি। সন্তোষের তেল-ঘি দিয়ে রগরগে করে রান্না সুখাদ্যগুলোই শুধু নয়, সেই সঙ্গে এইসব রাবড়ি টাবড়িও তাঁর ওজন, রক্তচাপ ওবং কোলেস্টেরল বাড়ানোর কারণ।

এবার কিন্তু কাউকেই ফোন করেননি প্রণবেশ। এই একটা ব্যাপারে সন্তোষকেও সতর্ক করে দিয়েছেন, তাঁর আসার খবরটা যেন সে চাউর করে না দেয়। বলেছেন, অত্যন্ত জরুরি কাজে তাঁকে কলকাতায় আসতে হয়েছে, লোকজন এলে সময় নষ্ট হবে, তাতে কাজেব ক্ষতি। প্রণবেশ জানেন সন্তোষ খুবই অনুগত, প্রভুভক্ত মানুষ, সে ঘুণাক্ষরেও কাউকে তাঁর কথা জানাবে না।

আত্মীয়স্বজনেরা এলে বিপদের সম্ভাবনাও যথেষ্ট। পিসতুতো খুড়তুতো জেঠতুতো ভাইবোনদের সঙ্গে অমলার যোগাযোগ আছে। প্রণবেশের কলকাতায় আসার উদ্দেশ্যটা এরা টের পেলে অমলার কাছে সে খবর মুহূর্তে পৌঁছে যাবে। তাই সব দিক থেকে যতটা সম্ভব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করে রেখেছেন তিনি।

রোজই শুতে শুতে অনেক রাত হয়ে যায় প্রণবেশের। দেরি করে ঘুমোন বলে উঠতেও বেশ বেলা হয়। তবে ঘুম ভাঙলে এক মুহূর্তও আর বিছানায় পড়ে থাকতে ভাল লাগে না। তক্ষুনি উঠে মুখ ধুয়ে বেশ আয়েস করে ধীরেসুস্থে দিনের প্রথম কাপ চা খান।

আজ কিন্তু এতদিনের অভ্যাসটার ব্যতিক্রম ঘটে গেল। হোটেল কমপ্লেক্সের সেই ড্রয়িংটা নিয়ে কাল মাঝরাত পর্যন্ত কাটালেও আজ খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল প্রণবেশের। এখনও রোদ ওঠেনি, তবে বাইরে আবছা আলো ফুটতে শুরু করেছে। কিন্তু বিছানা ছাড়ার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না তাঁর।

চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে আজ সবার আগে যাকে মনে পড়ছে সে হল রুমি। প্রণবেশ টের পেলেন রুমি ছাড়া আর সব ভাবনা তাঁর মাথা থেকে উধাও হয়ে গেছে। কাল অনুরাধার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর বাড়ি ফিরে এসে লাঞ্চ সেরে সেই ড্রয়িংটা নিয়ে যখন তিনি ডুবে আছেন সেই সময় নিজের অজান্তে রুমির চিন্তাটা তাঁর মধ্যে চারিয়ে গিয়েছিল। রাতে ঘুমের মধ্যেও সেটা বুঝিবা থেকে গেছে। নইলে সকালে উঠেই তাকে মনে পড়বে কেন? আসলে রুমির সঙ্গে আজ দেখা করতে যাবেন, তার প্রস্তুতিটা ভেতরে ভেতরে হয়তো কাল থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

শুয়ে থাকতে থাকতে এক ধরনের চাপা উত্তেজনার সঙ্গে কিছুটা উৎকণ্ঠা এবং হয়তো একটু আনন্দও অনুভব করতে থাকেন প্রণবেশ। বেলা যত বাড়ে, এই অনুভূতিগুলো আরও বেশি তীব্র হয়ে ওঠে।

অন্যমনস্কতার মধ্যে একসময় কখন যে প্রণবেশ বিছানা থেকে উঠে পড়েছেন, কখন চা খেয়ে, শেভ করে, স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট করেছেন, নিজেরই খেয়াল নেই। এর ভেতর বম্বে থেকে রুটিন অনুযায়ী অমলার ফোন এসেছে, তাঁর সঙ্গে মিনিট তিনেক কথাও বলেছেন। ব্যস এই পর্যন্ত। জুহুর হোটেল কমপ্লেক্সের ড্রয়িংটা যে ভীষণ আর্জেন্ট, একবারও মনে পড়েনি। শুধু ভেবেছেন, আজ পৃথিবীর একমাত্র জরুরি কাজ হল রুমির সঙ্গে দেখা করা।

কুড়ি বছর আগে এই শহর ছেড়ে প্রণবেশ চলে গিয়েছিলেন, তারপর এখানে কতবার তো এসেছেন কিন্তু রুমিকে সেভাবে কখনও মনে পড়েনি। স্মৃতি থেকে সে এক রকম মুছেই গিয়েছিল। কিন্তু তাই যদি হবে, অনুবাধা তার কথা বলা মাত্র তিনি কলকাতায় ছুটে আসবেন কেন? আর কেনই বা তাকে দেখার জন্য হঠাৎ এত ব্যাকুল হয়ে উঠবেন? সন্তানের প্রতি এই দুরন্ত, গোপন টান হয়তো মানুষের সহজাত সংস্কার। অনুরাধা রুমির সমস্যাটা জানানোর পর থেকে তাঁর পিতৃত্ব হাজারটা ফোয়ারা হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

হল-ঘরের কোণে গ্রান্ডফাদার ক্লকটা অর্কেস্ট্রা বাজিয়ে যখন জানান দিল এগারোটা বেজেছে, দ্রুত পোশাক পালটে বেরিয়ে পড়েন প্রণবেশ। সন্তোষকে সকালেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, আজ দুপুরে বাড়িতে খাবেন না। রুমির সঙ্গে কখন দেখা হবে, কতটা সময় তার সঙ্গে কাটাবেন, আগে থেকে জানা সম্ভব নয়। ব্রেকফাস্টটা একটু বেশি করেই করেছেন। তবু যদি খিদে টিদে পেয়ে যায়, বাইরে কোথাও খেয়ে নেবেন।

রাস্তায় একটা লম্বা প্রশেসান বেরিয়েছিল, ফলে ট্র্যাফিক জ্যাম হয়ে যায়। যানজটের ফাঁদে মিনিট চল্লিশেক আটকে থাকার পর প্রণবেশ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে

পৌঁছুলেন বারোটা বেজে গেছে। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের ভেতর তাঁর মারুতি ওমনি পার্ক করে হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টটা যে বিল্ডিংয়ে, সেখানে চলে এলেন। একদা তিনিও এখানকার ছাত্র ছিলেন, কয়েকটা বছর নিয়মিত ক্লাস করে গেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিপার্টমেন্ট কোথায়, কিছুই ভুলে যাননি, সব স্মৃতিতে থেকে গেছে।

হিস্ট্রি বিভাগের পাঁচতলা বাড়িটায় ঢুকে সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় উঠতে উঠতে প্রণবেশের অদ্ভুত অনুভূতি হতে লাগল। পৃথিবীর আর কোনও বাবা এভাবে তার মেয়ের সন্ধানে বেরিয়েছে কিনা তাঁর জানা নেই।

প্রণবেশ ঠিক করে রেখেছিলেন, প্রথমে খোঁজ করে দেখবেন, এখন হিস্ট্রির ক্লাস হচ্ছে কিনা। যদি হয় অপেক্ষা করবেন। নইলে এই ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রী বেয়ারা যাকেই পান তাকে অনুরোধ করবেন তারা একটু কষ্ট করে যেন রুমি বা বৈশালীকে ডেকে আনে অথবা চিনিয়ে দেয়।

হিস্ট্রির ক্লাসগুলো হয় তেতলায়। একসময় সেখানে চলে আসেন প্রণবেশ। সিঁড়ির গা ঘেঁষে বিরাট লাউঞ্জ। তারপর বাঁদিকে লম্বা করিডর চলে গেছে, সেটার একপাশে পর পর অনেকগুলো ক্লাসরুম, আরেক পাশে প্রোফেসরদের বসার জন্য আলাদা কামরা এবং অফিস।

লাউঞ্জ বা করিডরে কাউকে দেখা যাচ্ছে না, চারদিক একেবারে ফাঁকা। মিনিটখানেক লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে থাকেন প্রণবেশ। তারপর ঠিক করে ফেলেন অফিস-ঘরে বা প্রোফেসরদের কামরায় গিয়ে রুমির খোঁজ নেবেন। করিডরের দিকে ক'পা এগিয়েছেন, হঠাৎ দেখা গেল অল্পবয়সী একটা বেয়ারা একগাদা ফাইলপত্র নিয়ে অফিস-ঘরটা থেকে বেরিয়ে লাউঞ্জের দিকে আসছে। তার কাছে জানা গেল এখন সাতাশ নম্বর ঘরে হিস্ট্রির ক্লাস চলছে। বৈশালী মজুমদারকে সে চেনে কিনা, জিজ্ঞেস করায় বলল, শুধু বৈশালী কেন, হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের সব ছাত্রছাত্রীর নাম-ঠিকানা তার মুখস্থ।

প্রণবেশ বলেন, 'বৈশালীর সঙ্গে আমার খুব দরকার। ওকে একটু চিনিয়ে দিতে পারো?'

বেয়ারা সন্দিগ্ধ চোখে তাকায়। বলে, 'আপনি বৈশালীদিকে চেনেন না?'

উটকো একটা লোক হুট করে অচেনা তরুণী ছাত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, বেয়ারার সংশয়ের কারণ যে সেটাই তা মুহূর্তে বুঝে ফেলেন প্রণবেশ। শশব্যস্তে বলে ওঠেন, 'আমি কলকাতার বাইরে থাকি, খুব ছেলেবেলায় ওকে দেখেছি, কেউ দেখিয়ে না দিলে হয়তো চিনতে পারব না। তাই—'

বেয়ারা প্রণবেশের পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ধীরে ধীরে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করে। হয়তো তার মনে হয় এই মধ্যবয়সী ভদ্র চেহারার লোকটির কোনও কু-মতলব নাও থাকতে পারে। সে ডান ধারের একটা ফাঁকা ক্লাস-রুম দেখিয়ে বলে, 'আপনি ওখানে বসুন। মিনিট পনেরোর ভেতর ক্লাস ভাঙবে। তখন এসে বৈশালীদিকে চিনিয়ে দেবো।'

'আচ্ছা—'

বেয়ারা চলে যায়। প্রণবেশ নির্জন ক্লাস-রুমটায় গিয়ে বসেন না, লাউঞ্জেই অপেক্ষা করতে থাকেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লাসটা শেষ হয়। ছাত্রছাত্রীরা সাতাশ নম্বর ঘর থেকে হই চই করতে করতে বেরিয়ে আসে। একটা ব্যাপার প্রণবেশ তাঁর ছাত্রজীবনে লক্ষ করেছেন, স্কুলের ছেলেমেয়েই হোক আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীই হোক, ক্লাস ভাঙলেই হুল্লোড় বাধিয়ে দেয়।

ছেলেমেয়েদের অনেকেই হুড় হুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যায়। কয়েকজন থোকায় থোকায় দাঁড়িয়ে গুলতানি শুরু করে. সেই সঙ্গে তুমুল হাসাহাসি। হয়তো এখন আর ক্লাস নেই। দু-একটা পিরিয়ড অফ। তিরিশ বছর আগে প্রণবেশ যখন এখানে পড়তেন অবিকল এই দৃশ্যই চোখে পড়ত। ট্র্যাডিশন সমানে চলছে, তার কোনও হেরফের নেই।

প্রণবেশ কিন্তু এসব নিয়ে ভাবছিলেন না। প্রতিটি মেয়েকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিলেন। সেই বেয়ারাটা রুমিকে চিনিয়ে দেবে বলেছিল, কিন্তু তাকেও আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না। হয়তো ভুলেই গেছে।

প্রাণবেশ ভাবলেন লাউঞ্জে যে ছেলেমেয়েরা আড্ডা দিচ্ছে, রুমিকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের অনুরোধ করবেন। ওদের দিকে সবে পা বাড়িয়েছেন, হঠাৎ করিডরের দূর প্রান্তে যেখানে সাতাশ নম্বর রুম, সেদিক থেকে একটি মেয়েকে লাউঞ্জের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। খুব সম্ভব ক্লাস থেকে সবার শেষে সে বেরিয়েছে।

প্রণবেশ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। অনুরাধা কাল বলেছিলেন, রুমিকে দেখামাত্র চিনতে পারবেন। তখন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেননি। অবশ্য এ নিয়ে কোনও প্রশ্নও করেননি। আজ দেখা গেল রহস্যসৃষ্টির জন্য কথাগুলো বলেননি অনুরাধা। যে মেয়েটিকে তিনি একদৃষ্টে লক্ষ করছেন তার চোখেমুখে অনুরাধার আদলটি এমন স্পষ্ট করে বসানো যে তাকে না চিনে উপায় নেই। তিরিশ বছর আগে যে মায়াকাননের পরীটিকে তিনি প্রথম কলামন্দির-এ

দেখেছিলেন এ যেন হুবহু তারই রিপ্লিকা। তবে অনুরাধার চেয়ে অনেক বেশি স্মার্ট, অনেক বেশি ঝকঝকে, পোশাক টোশাক এবং সাজে অনেক বেশি উগ্র। পরনে জিনস আর শার্ট, ভ্রূ প্লাক-করা, কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা চুল, ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক, জুতোর হিল পেন্সিলের মতো সরু আর লম্বা, বাঁ হাতে চওড়া স্টিল ব্যান্ডে চৌকো ইলেকট্রনিক ঘড়ি যা পুরুষরাই পরে থাকে। কাঁধ থেকে বড় লেডিজ ব্যাগ কোমরের কাছে ঝুলছে।

ইউনিভার্সিটিতে এসে এত সহজে, কারও সাহায্য ছাড়াই রুমিকে শনাক্ত করে ফেলবেন, ভাবতে পারেননি প্রণবেশ। কুড়ি বছর আগে যে বালিকাটির মুখ তাঁর স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে গেছে সে এমন আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠবে, কে জানত! এই মেয়েটি তাঁর সন্তান, এর ধমনীতে তাঁর রক্তই প্রবাহিত, এ তাঁরই নিজস্ব সৃষ্টি, মনে হতেই কী যে এক শিহরণ সমস্ত অস্তিত্বের ভেতর দিয়ে খেলে যায়!

মেয়েটি কাছাকাছি চলে এসেছিল। প্রণবেশের পাশ দিয়ে সে যখন সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে, তিনি ডাকলেন, 'শোন—'

মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ে।

প্রণবেশ বুকের ভেতর একশ'টা ঢাকের তুমুল আওয়াজ শুনতে শুনতে বলেন, 'তুমি নিশ্চয়ই বৈশালী, মানে রুমি?'

একটা অচেনা প্রৌঢ়ের মুখে নিজের দু'টি নামই শুনে প্রথমটা ভীষণ অবাক হয়ে যায় মেয়েটি। পলকহীন প্রণবেশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে—' বলতে বলতে তার বিস্ময়টা বদলে গিয়ে ক্রোধ এবং এক ধরনের তীব্র আক্রোশ ফুটে ওঠে।

কারও মুখচোখের পরিবর্তন যে এত দ্রুত ঘটতে পারে প্রণবেশ ভাবতে পারেননি। ভেতরে ভেতরে তিনি ভয় পেয়ে যান। কিন্তু সেটা বাইরে বেরিয়ে আসতে দেন না। হাসিমুখে বলেন, 'আমাকে কী?'

চাপা তীক্ষ্ণ গলায় রুমি বলে, 'আপনাকেও বোধহয় আমি চিনতে পেরেছি।'

যেন সম্পূর্ণ দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পেরেছেন, এমনভাবে প্রণবেশ এবার বলেন, 'যাক, ভালই হল, ভেবেছিলাম নিজের পরিচয় টরিচয় দিয়ে তোমাকে কনভিন্স করতে হবে। তার আর দরকার হল না। কিন্তু—'

'কী?'

'তোমার চেহারা অবিকল তোমার মায়ের মতো যে দেখলেই চিনে ফেলা যায় কিন্তু আমাকে চেনা সহজ নয়। ছেলেবেলায় তুমি আমাকে দেখেছ। কিন্তু তখনকার স্মৃতি কি এতকাল বাদেও মনে থাকে? তা হলে—'

'সেটা জানা কি খুব আর্জেন্ট?'

নিজের মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে যেতে দেননি প্রণবেশ। বললেন, 'ঠিক আছে, এ নিয়ে এখন আর কিছু জানতে চাই·না। পরে তোমার ইচ্ছে হলে বলো।'

রুমি উত্তর দিল না।

প্রণবেশ বললেন, 'তোমার আজ আর কোনও ক্লাস আছে?'

রুমি বলে, 'আছে। এখন দুটো পিরিয়ড অফ, তারপর একটা ক্লাস হবে। কেন?'

'ওই ক্লাসটা কি খুব ইমপর্টান্ট?

'আমার কাছে ইমপর্টান্ট বলে কিছু নেই।'

রুমির বলার মধ্যে বেপরোয়া একটা ভঙ্গি রয়েছে। প্রণবেশ সেটা লক্ষ করেও করলেন না। বললেন, 'তা হলে চল, কোথাও গিয়ে বসা যাক।'

'আপনার সঙ্গে যাব কেন? আমার তো কোনও প্রয়োজন নেই।' এতক্ষণ রুমির গলার স্বরটা ছিল চাপা, এবার সেটাকে অনেক উঁচু পর্দায় তুলে দিয়েছে সে, হয়তো নিজের অজান্তেই।

আশপাশে যে ছেলেমেয়েরা আড্ডা দিচ্ছিল তারা চমকে রুমির দিকে তাকায়। দু-একজন জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে রে বৈশালী?'

প্রণবেশ এবং তার মধ্যে যে স্নায়ুযুদ্ধ চলছে সেটা বাইরে বেরিয়ে পড়ুক, যে কোনও কারণেই হোক তা চায় না রুমি। নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়ে বলে, 'কিছু না।' তারপর প্রণবেশের চোখের দিকে তাকায়, 'আমার অন্য কাজ আছে। আপনি যেতে পারেন।'

'যাব তো নিশ্চয়ই। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।'

'আপনাকে তো বললামই, আমার প্রয়োজন নেই।'

'আমার যে আছে।'

রুমি কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রণবেশ বলেন, 'অত রাগারাগি করতে নেই। নিশ্চয় বুঝতে পারছ, তুমি যতক্ষণ না আমার সঙ্গে যাচ্ছ, আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকব। তাতে তোমার পেশেন্স নষ্ট হবে, তুমি হয়তো উত্তেজনায় চিৎকার করবে, ফলে একটা বিশ্রী ড্রামা তৈরি হবে। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী সেটা জানাজানি হয়ে যাবে। কেন এতদিন বাদে তোমার খোঁজে ইউনিভার্সিটিতে হানা দিয়েছি, তোমার বন্ধুরা জানতে চাইবে। সেটা তোমার পক্ষে কতটা প্লেজান্ট হবে, আমার ধারণা নেই।'

রুমির মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। একবার নিরুপায় ভঙ্গিতে চারপাশে ছড়িয়ে-থাকা বন্ধুদের দেখে নেয়। তারপর মুখ নামিয়ে কী ভেবে বলে, 'ঠিক আছে, চলুন—'

'দ্যাটস লাইক আ গুড গার্ল। এসো—'

ঘাড় গোঁজ করে প্রণবেশের পাশাপাশি খানিকটা উদ্ধত ভঙ্গিতেই যেন নিচে নামতে থাকে রুমি। কিংবা হয়তো যে মানুষটির সঙ্গে তার নিকটতম সম্পর্ক, হঠাৎ এতকাল বাদে কেন তিনি ছুটে এসেছেন সে ব্যাপারে তার খানিকটা কৌতূহলও হয়ে থাকতে পারে।

নিচে এসে ফ্রন্ট সিটে রুমিকে নিজের পাশে বসিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন প্রণবেশ। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের বাইরের রাস্তায় আসতেই রুমি জিজ্ঞেস করে. 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

প্রণবেশ উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে চোখ রেখে বলেন, 'আমি কিছু ভাবিনি। তুমি একটা জায়গা ঠিক কর না।'

'আপনি আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন আর জায়গা ঠিক করব আমি! স্ট্রেঞ্জ।'

প্রণবেশ বলেন, 'আমি একটা জায়গার নাম বলতে পারি যেখানে আনডিসটার্বড কথা বলা যাবে।'

'সেটা কোথায়?'

'আমি যেখানে আছি, মানে কেয়াতলায়!'

রুমির মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। সে বলে, 'আপনার বাড়িতে যাওয়ার স্লাইটেস্ট ইচ্ছেও আমার নেই।'

ভেতরে ভেতরে কিছুটা থতিয়ে যান প্রণবেশ। পরক্ষণে ভাবেন, যদিও কথাগুলো খুবই রূঢ়, তবে বলতেই পারে রুমি। তাঁর ওপর ওর যে অভিমান বা রাগ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে এসব তারই প্রকাশ। মুখে হাসি ফুটিয়ে তিনি বলেন, 'ঠিক আছে, তা হলে আমরা অন্য কোথাও যাই চল—'

রুমি উত্তর দেয় না।

প্রণবেশ একটু চিন্তা করে বলেন. 'ধর, যদি কোন রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসি?'

রুমি আগ্রহশূন্যের মতো বলে, 'আই ডোন্ট মাইন্ড।'

আধঘন্টার মধ্যে পার্ক স্ট্রিটে পৌঁছে যান প্রণবেশ। গাড়িটা রাস্তার একধারে পার্ক করে রুমিকে নিয়ে একটা এয়ার-কন্ডিশানড রেস্তোরাঁয় চলে আসেন। এক কোণে দু'জনের মতো নিরিবিলি টেবলও পাওয়া যায়।

রুমিকে বসতে বলে প্রণবেশ তার মুখোমুখি বসেন। বলেন, 'আগে বল কী খাবে?'

রুমি বলে. 'খাওয়ার জন্য আমি আসিনি।'

দূরে একটি স্টুয়ার্ড দাঁড়িয়ে ছিল, সে অর্ডার নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে।

প্রণবেশ রুমিকে নিচু গলায় বলেন, 'এর সামনে আমাকে বকাবকি করো না। প্লিজ—'

রুমি অবাক হয়ে বলে, 'বা রে, কখন আপনাকে বকাবকি করলাম! অদ্ভুত ব্যাপার তো—'

তার কথা যেন শুনতেই পাননি, এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে মেনুকার্ড দেখে স্টুয়ার্ডকে দু'জনের মতো অর্ডার দিলেন প্রণবেশ। ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন, ক্রিম-ভেটকি আর আইসক্রিম।

স্টুয়ার্ড চলে গেলে রুমি দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'আপনাকে বললাম আমি খাব না। তবু অর্ডার দিলেন যে?'

প্রণবেশ বলেন, 'আমি লাঞ্চ খেয়ে বেরুইনি। ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে। আমি খাব আর তুমি বসে থাকবে, সেটা হয় না। তাই—'

রুমি চুপ করে থাকে। তাব মুখচোখ দেখে এবার মনে হয়, খুবই বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট হয়েছে।

টেবলে জলের গেলাস, ন্যাপকিন, কাঁটা চামচ ইত্যাদি সুন্দর করে সাজানো ছিল। এক চুমুক জল খেয়ে গেলাস নামিয়ে রাখতে রাখতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় প্রণবেশের। তিনি বলেন, 'একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে—'

রুমি তাঁর মুখের দিকে তাকায়।

প্রণবেশ বলেন, 'তুমি তোমাব মায়ের রিপ্লিকা, দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমাকে চিনলে কী করে?'

'শুনতে চান?'

'চাই বলেই তো জিজ্ঞেস করলাম।'

সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে রুমি চাপা, তীব্র গলায় বলে, 'তার কারণ আমাব মা। খবরের কাগজে 'আর্কিটেক্ট অব দ্য ইয়ার' হওয়ার পর যত বার আপনার ছবি বেরিয়েছে, সব কেটে একটা বাক্সে জমা করে রেখেছিল। হঠাৎ বাক্সটা ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে আমাব চোখে পড়ে। ছবিগুলো কার, মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম; মা উত্তর দেয়নি। তবে আমি ঠিকই বুঝে ফেলেছিলাম।'

প্রণবশের রক্তের ভেতর দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ খেলে যায়। অনুরাধা খবরের কাগজ থেকে কেটে তাঁর ছবি জমিয়ে রাখবেন, এমন বিস্ময়কর ব্যাপার তিনি ভাবতেও পারেননি। কোর্ট থেকে কাটান ছাড়ান হয়ে যাওয়ার পরও তা হলে সব শেষ হয়ে যায়নি। সঙ্গোপনে অনেক কিছুই থেকে গেছে।

রুমির গলা আবার শোনা যায়, 'মাকে বলেছিলাম এসব থার্ড ক্লাস, রটন সেন্টিমেন্টের মানে হয় না। পাস্ট যদি ভুলতেই না পার, তাহলে ডিভোর্স করতে গিয়েছিলে কেন? জানেন, অনেকদিন আগে মায়ের অফিসের এক কলিগ মাকে বিয়ে

করতে চেয়েছিল। মা রাজি হয়নি। যার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই তার জন্যে একটা সতীসাধ্বী মার্কা ইমেজ নিয়ে লাইফ কাটিয়ে দিচ্ছে। এই ন্যাকামো টোটালি ডিসগাস্টিং।'

প্রণবেশ কী উত্তর দেবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

রুমি থামেনি, 'আমার একটা প্রশ্ন আছে।'

'বল—' ভয়ে ভয়ে রুমিকে লক্ষ করতে থাকেন প্রণবেশ। মেয়েটাকে অনুভূতিশূন্য রোবটের মতো মনে হয় তাঁর।

'মামার কাছে শুনেছিলাম, আপনি প্রত্যেক বছর কলকাতায় এসে দু'মাস করে থেকে যান। এত বছর তো আসছেন, কই কখনও তো আমার খোঁজ নেননি। হঠাৎ কী এমন হয়েছে যে একেবারে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত গিয়ে হাজির হলেন?' প্রণবেশের মুখ থেকে চোখ না সরিয়ে তাকিয়ে থাকে রুমি।

ভীষণ অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল প্রণবেশের। দেখা হওয়ার পর থেকেই মেয়েটা আক্রমণের ভঙ্গিতে যেন অস্ত্র উঁচিয়ে রেখেছে। ফিকেমতো একটু হেসে বলেন, তোমাকে দেখতে ইচ্ছে হল, তাই—'

'এতকাল বাদে! ফাইন—'

রুমির কণ্ঠস্বরে এমন একটা তীব্রতা ছিল যে প্রণবেশ হকচকিয়ে যান। বলেন, 'না, মানে—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে রুমি এবার বলে, 'আমি যে হিস্ট্রি নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, এই খবরটা কে দিলে? নিশ্চয়ই মা?'

প্রশ্নটা এত সরাসরি এবং এমনই মারাত্মক যে নিজের অজান্তেই প্রণবেশের মুখ থেকে জবাব বেরিয়ে আসে, 'হ্যাঁ, কিন্তু—'

'সুপার্ব—আমার ক্ল্যাপ দিতে ইচ্ছে করছে।' হালকা, তরল স্বরে কথাগুলো বলতে বলতে রুমির গলা ছুরির ফলার মতো ধারালো হয়ে ওঠে, 'আপনারা দু'জনেই, বোথ অফ ইউ আর ডিজঅনেস্ট। অ্যান্ড আই উড সে—ক্রিমিনাল।'

শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল প্রণবেশের। রুমির কথাগুলো মুখের ওপর চাবুকের মতো এসে পড়েছে। প্রতিধ্বনির মতো তাঁর গলা থেকে বেরিয়ে আসে, 'ক্রিমিনাল!'

'নিশ্চয়ই। আপনি ফের বিয়ে করেও নিজের স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের ঠকাচ্ছেন। পুরনো স্ত্রীর সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে যোগাযোগ রাখা—এটা ক্রাইম নয়? আর মা? সে নিজেকে তো ঠকাচ্ছেই, সেই সঙ্গে আপনার নতুন স্ত্রী আর তাঁর ছেলেমেয়েদেরও ঠকাচ্ছে। এসব ড্রামার কী প্রয়োজন ছিল?'

উত্তর দিতে খানিকটা সময় লাগে প্রণবেশের। ম্লান মুখে বলেন, 'তুমি যা ভাবছ

তা ঠিক নয়। তোমার মা বা আমি কেউ কাউকে ঠকাইনি, কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাও করিনি। যে কোনও কারণেই হোক, আমাদের জীবনে যে ট্র্যাজেডি ঘটে গেছে সে জন্যে আলাদা আলাদাভাবে কষ্ট নিশ্চয়ই আমরা ভোগ করেছি কিন্তু কারও ক্ষতি করিনি।'

গলা অনেকটা উঁচুতে তুলে একরকম চেঁচিয়েই ওঠে রুমি, 'বিশ্বাস করি না। ইউ আর আ লায়ার।'

পার্ক স্ট্রিটের এই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অভিজাত রেস্তোরাঁয় এমন চেঁচামেচি কেউ ভাবতেই পারে না। এখানে সবাই কথা বলে নিচু গলায়, প্রায় ফিস ফিস করে, যাতে অন্যদের অসুবিধা না হয়। রুমির চড়া, উগ্র কণ্ঠস্বর শুনে কাছে এবং দূরের টেবলগুলোতে যারা বসে ছিল, চমকে এদিকে মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

প্রণবেশ ভয়ানক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে থাকেন। মেয়েকে শান্ত করার জন্য রুদ্ধ স্বরে বলে ওঠেন, 'আস্তে রুমি, আস্তে। সবাই আমাদের লক্ষ করছে।'

'করুক, আই ডোন্ট কেয়ার।' আশপাশের লোকজনদের একবার দেখে নিয়ে রুমি গলার স্বর কিছুটা নামায় ঠিকই, তবে আক্রোশটা থেকেই যায়।

প্রণবেশ খুবই দমে যান। রুমির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবেন, এই বেপরোয়া মেয়ে যে সারাক্ষণ আঘাত হানার জন্য উদ্যত হয়ে আছে তাকে সামলে রাখা ভয়ঙ্কর কঠিন ব্যাপার। অনুরাধার সমস্যা কত মারাত্মক তার খানিকটা আঁচ করা যাচ্ছে। তাঁর মতো নরম স্বভাবের মহিলা কতখানি নিরুপায় হলে লজ্জাসঙ্কোচ আত্মসম্মান ভুলে তাঁকে বম্বে থেকে ডেকে এনেছেন, এবার তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এই সময় খাবার এসে যায়। বেয়ারা দু'জনের সামনে প্লেটগুলো সাজিয়ে চলে যাওয়ার পর প্রণবেশ বলেন, 'খাও—'

রুমি খাওয়ার ব্যাপারে আর গোলমাল করে না। ঘাড় গোঁজ করে চামচ দিয়ে ফ্রায়েড রাইস আর চিলি চিকেনের একটা টুকরো মুখে পুরে ধীর ধীরে চিবোতে থাকে।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে খাওয়ার পর প্রণবেশ লক্ষ করেন, রুমির মুখটা অনেক নরম দেখাচ্ছে, আগের সেই উগ্রতা ততটা নেই। বললেন, 'তোমাকে আরেকটা কথা বলব। বিশ্বাস করা বা না-করা তোমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।'

রুমি চোখ তুলে তাকায়, তার দৃষ্টিতে সামান্য ঔৎসুক্য ফুটে বেরোয়।

প্রণবেশ এবার বলেন, 'কুড়ি বছর আমরা আলাদা হয়ে গেছি, কেউ কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখিনি। কেননা সব দিক থেকেই সেটা অন্যায় এবং অশোভন হত। দিন তিনেক আগে তোমার মা হঠাৎ আমাকে বম্বেতে ফোন করেছিল।'

রুমি জিজ্ঞেস করে, 'কেন?'

'সে একটা সমস্যায় পড়েছে। তাই—' বলতে বলতে চুপ করে যান প্রণবেশ।

বেশ কিছুক্ষণ তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে রুমি। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞেস করে, 'সমস্যাটা কি আমাকে নিয়ে?'

'এ প্রশ্নের উত্তর দেব না।'

'না দিলেও আমি বুঝে গেছি। আমার মা তার আনকনট্রোলেবল মেয়েকে সামলাতে না পেরে এক্স-হাজব্যান্ডকে ডেকে এনেছে। তার ধারণা আপনি আমাকে টিট করতে পারবেন। বাট হু আর ইউ? আমার ব্যাপারে দয়া করে ইন্টারফেয়ার করবেন না।' রুমির চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে খানিক আগের সেই উত্তেজনা আর উগ্রতা ফিরে আসে।

প্রণবেশ বলেন, 'তোমার মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক না থাকলেও তোমার সঙ্গে আছে। ডোন্ট ফরগেট ইট।'

'তাই নাকি!' রুমির গলা থেকে তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ দুটো আগুনের হলকার মতো বেরিয়ে আসে। লাফ দিয়ে উঠে পড়ে সে। বলে, 'আমি যাচ্ছি।'

প্রণবেশের মাথার ভেতর স্বয়ংক্রিয় কোনও নিয়মে দ্রুত ভাবনার কাজ শুরু হয়ে যায়। এই মেয়ের সঙ্গে নরম ব্যবহার করে কিছুই হবে না। বহুদিন কড়া শাসনে না থাকার কারণে রুমি ভয়ানক বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তার জন্য অন্যরকম প্রতিষেধক দরকার।

প্রণবেশ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। রুমির কাঁধে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলেন, 'সিট ডাউন—' তাঁর কণ্ঠস্বরটা চাপা গর্জনের মতো শোনায়।

রুমি হকচকিয়ে যায়। যে মানুষটিকে এতক্ষণ খুব স্নেহপ্রবণ মনে হয়েছে, যাঁর কথাবার্তা ব্যবহার ছিল আশ্চর্য কোমল, আচমকা তিনি এমন রূঢ় হয়ে উঠতে পারেন, এ ছিল অভাবনীয়। শুধু তাই নয়, তাঁর মধ্যে এমন এক প্রবল ব্যক্তিত্ব রয়েছে যা অমান্য করা অসম্ভব। নিজের অজান্তে ফের বসে পড়ে রুমি।

প্রায় আদেশের ভঙ্গিতে প্রণবেশ এবার বলেন, 'খাও—অ্যান্ড ডোন্ট ট্রাই টু ক্রিয়েট এনি সিন।'

মুখ নামিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকে রুমি। তারপর আবার চামচ আর কর্ক তুলে নেয়। একটু আধটু মুখে তুলে বলে, 'আপনি আমার ওপর জোর করছেন।'

গম্ভীর, ভারি গলায় প্রণবেশ বলেন, 'দরকার হলে জোর করতেই হয়।'

রুমি আর কিছু বলে না।

একসময় প্রণবেশ জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে?'

রুমি বলে, 'মা আপনাকে জানায়নি?'

'জানিয়েছে। তবু তোমার মুখে আরেক বার শোনা যাক।' প্রণবেশ আগের সুরেই বলেন।

রুমি উত্তর দেয় না।

প্রণবেশ জিজ্ঞেস করেন, 'একটা বছর নষ্ট করলে কেন?'

রুমি বলে; 'ইচ্ছে হয়নি, তাই পরীক্ষা দিইনি।'

'এ বছর ইচ্ছে হবে তো?'

'দেখি।'

একটু চুপচাপ।

তারপর প্রণবেশ জানতে চান, 'মাকে এত কষ্ট দিচ্ছ কেন?'

রুমি খাওয়া থামিয়ে বলে, 'কিরকম?'

'তুমি নাকি রাত্তিরে দশটা সাড়ে দশটার আগে বাড়ি ফেরো না?'

'আমার বয়েস পঁচিশ চলছে। আই অ্যাম সাফিসিয়েন্টলি গ্রোন-আপ। আমার চলাফেরার ব্যাপারে কেউ নাক গলাক, সেটা একেবারেই চাই না। কিসে আমার ভাল বা খারাপ হতে পারে তা বোঝার মতো বয়স আমার হয়েছে।'

'বুঝলাম। একটা কথা মনে রেখো, আমাদের সোসাইটিতে মেয়েরা নিরাপদ নয়। যে কোনও মুহূর্তে তাদের বিপদ ঘটে যেতে পারে।'

রুমি উত্তর দেয় না।

প্রণবেশ বলেন, 'এখন থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসবে। মায়ের দুশ্চিন্তা বাড়ে তেমন কিছু করা ঠিক নয়।'

রুমি বলে, 'মা হাইপার-টেনসানের ভিকটিম, অকারণে চিন্তা করে করে মাথা খারাপ করে ফেলে।'

'অকারণে নয়—'

'মানে?'

'তোমার যা সব বন্ধুবান্ধব, তাদের ব্যাপারে দুর্ভাবনার যথেষ্ট কারণ আছে।'

রুমি জিজ্ঞেস করে, 'মা আমার বন্ধুদের সম্পর্কে কী বলেছে?'

প্রণবেশ বলেন, 'তারা যা ঠিক তাই বলেছে। এদের বাবাদের প্রচুর ব্ল্যাক মানি। ফলে ছেলেরা যা হওয়ার তাই হয়েছে—ড্রাগ-অ্যাডিক্ট, ড্রাঙ্কার্ড, বদমাশ। তুমি এদের সঙ্গে আর মিশবে না।'

'যদি আপনার কথা না শুনি?'

'যাতে শোন তার ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে।'

রুমি উত্তর দেয় না। অন্যমনস্কর মতো চামচ আর ফর্ক দিয়ে প্লেটের

খাদ্যবস্তুগুলো নাড়াচাড়া করে। অসহ্য রাগে তার মুখ থমথম করতে থাকে।

প্রণবেশ রুমিকে লক্ষ করছিলেন। তার মনোভাবও আন্দাজ করতে পারছিলেন কিন্তু এ নিয়ে কিছু বলেন না। শুধু জিজ্ঞেস করেন, 'গুরনাম সিং, অজয় শিবদাসানি, সুগত, পরিমল আর দীপক—এরা কারা?'

প্রথমটা চকিত হয়ে ওঠে রুমি। বলে, 'এদের নাম আপনি কী করে জানলেন?' একটু থেমে কী ভেবে ফের বলে, 'বুঝেছি, মা বলেছে। ওরা আমার বন্ধু।'

'এই বাজে, নোটোরিয়াস ছোকরাগুলোর সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক রাখা চলবে না।'

রুমি চুপ করে থাকে।

প্রণবেশ বলেন, 'এখন থেকে ইউনিভার্সিটি ছুটি হলেই বাড়ি চলে আসবে। রাত করে ফেরাটা আমার একেবারেই পছন্দ নয়।'

এবারও কিছু বলে না রুমি।

প্রণবেশ থামেননি। তিনি একটানা বলে যান, 'শুনেছি ওই পাঞ্জাবি ছোকরাটা মানে গুরনাম সিং প্রায় রোজই তোমাকে অনেক রাতে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে যায়। পাড়ার লোকেরা এর জন্যে তোমার সম্বন্ধে যা তা কমেন্ট করে। তোমার মা লজ্জায় কারও দিকে তাকাতে পারে না। দিস ইজ ভেরি ব্যাড, শেমফুল। সোসাইটিতে থাকতে হলে কিছু কোড অফ কনডাক্ট মেনে চলতে হয়।'

অনেকক্ষণ পর মুখ খোলে রুমি। কোড অফ কনডাক্টের বাংলা তর্জমা করে বলে, 'আপনি কি এতকাল পর আমাকে সামাজিক আচরণবিধি শেখাতে এসেছেন?'

রুমির বলার ভঙ্গিতে তীব্র একটা শ্লেষ রয়েছে, সেটা বেতের বাড়ির মতো প্রণবেশের মুখের ওপর এসে পড়ে। সে যেন বোঝাতে চেয়েছে, এতদিন কোনও বকম দায়িত্ব পালন না করে নীতিশিক্ষা দেওয়ার অধিকাব তাঁর নেই।

প্রণবেশ উত্তেজিত হন না। শান্ত মুখে বলেন, 'ধর তাই।'

'আপনার কথা আমার মনে থাকবে।'

'সেটাই তো আমি চাই।'

প্রণবেশের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ করলেন, রুমি বিশেষ কিছুই খায়নি। ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন টিকেন যেমন দেওয়া হয়েছিল তার বেশির ভাগই পড়ে আছে। খাওয়ার জন্য তিনি তাকে অনুরোধ বা জোর কোনওটাই করলেন না। বেয়ারাকে ডেকে বিল মিটিয়ে রুমিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তায় এসে গাড়ির সামনের সিটের দরজা খুলতে খুলতে বললেন, 'ওঠ—'

রুমি বলে, 'আমি আপনার সঙ্গে যাব না। আমাকে অন্য এক জায়গায় যেতে

হবে।'

'অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। তুমি এখন সোজা বাড়ি যাবে। ওঠ—' প্রণবেশের কণ্ঠস্বরে সেই কর্তৃত্ব ফুটে ওঠে যা কোনওভাবেই অমান্য করা যায় না।

'আপনি কিন্তু বার বার আমার ওপর জোর করছেন।' গাড়িতে উঠতে উঠতে রাগের গলায় বলে রুমি।

'তা করছি।' বলে গাড়িটার ওধারে গিয়ে ড্রাইভারের সিটে উঠে বসেন প্রণবেশ। স্টার্ট দিয়ে খানিকটা এগিয়ে ডান পাশে ক্যামাক স্ট্রিটের দিকে যেতে যেতে বলেন, 'কখনও কখনও জোর না করলে চলে না।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

এর মধ্যে প্রণবেশের মারুতি ওমনি ক্যামাক স্ট্রিট পেরিয়ে সার্কুলার রোডে এসে পড়েছে। ডাইনে ঘুরে চৌরঙ্গির ক্রসিং-এ আসতেই ট্রাফিক সিগনালে লাল আলো জ্বলে ওঠে। অগত্যা গাড়ি থামাতে হয়। প্রণবেশ একবার ভাবেন, বাঁ দিকে ঘুরে আশুতোষ মুখার্জি রোড ধরে পূর্ণ সিনেমার কাছে রুমিকে নামিয়ে দিয়ে যাবেন। কিন্তু পরক্ষণে স্থির করে ফেলেন, না, হরিশ মুখার্জি রোডে গিয়ে একেবারে বাড়ির সামনে পৌঁছে দেবেন।

ঠিক পাশেই বসে আছে রুমি। প্রণবেশ লক্ষ করলেন, মেয়েটা উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। তার চোখেমুখে প্রবল অসন্তোষ এবং বিরক্তি। তার ব্যাপারে প্রণবেশের এই নাক গলানোটা একেবারেই মেনে নিতে পারছে না। এটাকে জোরজুলুম বলে মনে করছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এ ছাড়া আর কী-ই বা করা যেত!

হঠাৎ রুমির প্রতি অপার মমতায় মন ভরে যায় প্রণবেশের। পঁচিশ বছরের এই জেদি, একগুঁয়ে, বদমেজাজি, বেপরোয়া তরুণীটি তাঁরই সন্তান। তার ক্রোধ, অসন্তোষ, চাপা অভিমান এবং কুসঙ্গে মিশে নিজেকে ধ্বংস করা—এ সবের জন্য তাঁর দায়িত্বও তো কম নয়। কারণ যাই থাক, কুড়ি বছর মেয়ের সঙ্গে তিনিও তো কোনও রকম সম্পর্ক রাখেননি। যেখানে কর্তব্য পালন করা হয়নি সেখানে হঠাৎ লাগাম টেনে শাসন করতে গেলে সহ্য করার কথা নয়।

আর্দ্র স্বরে প্রণবেশ ডাকেন, 'রুমি—'

চোখ না ফিরিয়ে শুকনো গলায় রুমি সাড়া দেয়, 'বলুন—'

প্রণবেশ বলেন, 'তোমার সঙ্গে এতদিন পরে দেখা হল। খালি বকাঝকাই করলাম—'

রুমি চুপ।

প্রণবেশ এবার বলেন, 'মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে তো?'

রুমি উত্তর দেয় না।

ট্রাফিক সিগনালে লাল আলো নিভে গিয়ে সবুজ আলো জ্বলে ওঠে। প্রণবেশ রুমিকে কী বলতে যাচ্ছিলেন, তা আর বলা হয় না। এধারের যে গাড়িগুলো লাইন দিয়ে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিল, উর্ধ্বশ্বাসে তাদের দৌড় শুরু হয়। অগত্যা প্রণবেশকেও স্টার্ট দিতে হল। চৌরঙ্গি ক্রস করে ক্যালকাটা ক্লাবের পাশ দিয়ে সোজা রবীন্দ্র সদনের কাছে এসে মারুতি ওমনিটাকে বাঁ দিকে হরিশ মুখার্জি রোডে নিয়ে এলেন তিনি। রাস্তাটা মোটমুটি ফাঁকাই পাওয়া গেল। মিনিট চারেকের ভেতর তাঁরা অনুরাধাদের বাড়ির কাছে পৌঁছে গেলেন।

কুড়ি বছর বাদে এ রাস্তায় এলেন প্রণবেশ। চারপাশ অনেক বদলে গেছে। পুরনো বাড়িটাড়ি ভেঙে নতুন নতুন হাই-রাইজ উঠেছে। তবে অনুরাধাদের বাড়িটা প্রায় একই রকম থেকে গেছে।

আশপাশের পরিবর্তন লক্ষ করছিলেন না প্রণবেশ। গাড়িটা ফুটপাথের ধার ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে একটু আগে যা বলতে চেয়েছিলেন, নরম, স্নিগ্ধ স্বরে এখন তা বললেন, 'এতদিন বাদে দেখা হল। তোমাকে বকাবকি করে আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে।'

রুমি কিছু বলল না, প্রণবেশের দিকে তাকালও না। ও ওধারের দরজা খুলে, ফুটপাথে নেমে ঘাড় গোঁজ করে বাড়ির দিকে চলে গেল।

ভেতরে ভেতরে একটু থমকে গেলেন প্রণবেশ। তারপর বললেন, 'খুব শিগগিরই তোমার সঙ্গে আবার দেখা করব।'

প্রণবেশ যখন কেয়াতলায় ফিরলেন, প্রায় চারটে বাজে। তেতলায় এসে শুধু জুতোটা খুলে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। পোশাক পালটানোর ইচ্ছাই হল না।

আসলে ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছিলেন তিন। প্রায় দু ঘণ্টার মতো একটা প্রচণ্ড একগুঁয়ে, বেয়াড়া, বেপরোয়া মেয়ের সঙ্গে নানা রণকৌশল ছকে যুদ্ধ চালাতে হয়েছে। রুমি যেভাবে নিজেকে ধ্বংস করে চলেছে সেখান থেকে তাকে ফেরানো সম্ভব হবে কিনা, সে সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত নন। ইচ্ছামতো চলাফেরা, মাকে দুঃখ দেওয়া, মাতাল ড্রাগ-অ্যাডিক্টদের সঙ্গে মেশা—এগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন ঠিকই কিন্তু রুমি তা মানবে কিনা কে জানে। তার মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছিল, এসব আদৌ পছন্দ করেনি। এমনকি, তিনি যে তাকে জোর করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছেন তাতেও সে ভীষণ অসন্তুষ্ট। এই মেয়েকে কীভাবে শোধরানো যাবে, কে জানে।

এতকাল ওদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। রুমির মুখ তাঁর স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। ওর জন্য কোনওদিন দুর্ভাবনায় পড়তে হবে, কুড়ি বছরের মধ্যে

একবারও প্রণবেশের মনে হয়নি। অনুরাধা যখন বম্বেতে ফোন করলেন তখন ভেবেছিলেন মা বলেই সমস্যাটাকে খুব বড় করে দেখছে। তাঁর ধারণা ছিল, রুমির সঙ্গে দেখা করে বোঝালে সে বুঝবে। কিন্তু আজ দু ঘণ্টা একসঙ্গে কাটানোর পর মনে হয়েছে ব্যাপারটা তত সহজ নয়। বহুকালের জমা অভিমান, ক্রোধ, অসন্তোষ একাকার হয়ে মেয়েটাকে এমন অস্বাভাবিক জেদি আর হঠকারী করে তুলেছে। সমস্যাটা অনেক গভীরে পৌঁছে গেছে। যদি অনেকদিন কাছাকাছি থাকা যেত ওকে ফেরানো অসম্ভব হত না। রুমির প্রয়োজন হল মমতা, সর্বক্ষণের সঙ্গ আর সহানুভূতি। সেই সঙ্গে কড়া শাসনও। কিন্তু কলকাতায় ক'দিন আর তাঁর পক্ষে থাকা সম্ভব? স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, সংসার, বিশাল বিজনেস, সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত ব্যস্ততা—সব মিলিয়ে আরব সাগরের পারের সেই শহরটা তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। সে সব ফেলে রুমির জন্য কতটুকু সময় এখানে এসে দেওয়া যায়? কী যে করবেন, ভেবে পান না প্রণবেশ। তা ছাড়া জানাজানির ভয়টাও রয়েছে। অমলার কানে এসব গেলে আর পরিণতি কী হতে পারে সে ব্যাপারে তাঁর পরিষ্কার ধারণা আছে।

সন্তোষ ঘরে এসে ঢোকে। প্রণবেশ যখন বাড়ি এলেন তখন সে একতলায় ছিল। ভেবেছিল হাত-মুখ ধুয়ে বাইরের পোশাক পালটে তাঁর টেবলে বসতে মিনিট পনের কুড়ি লাগবে। তারপর সে আসবে। সেইমতো সময় হিসেব করেই এসেছে। কিন্তু প্রণবেশকে শুয়ে থাকতে দেখে রীতিমত অবাক হয়ে যায়। আস্তে আস্তে ডাকে, 'দাদা—দাদা—'

প্রণবেশের চোখের ওপর আড়াআড়ি একটা হাত চাপা ছিল। আস্তে আস্তে হাতটা সরিয়ে তাকালেন। বলেন, 'কী বলছ?'

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় একটু গড়ালেও বিকেলে কখনও প্রণবেশকে শুতে দেখেনি সন্তোষ। সে বলে, 'শরীর কি খারাপ হয়েছে?'

ধীরে ধীরে উঠে বসেন প্রণবেশ। একটু হেসে বলেন, 'না না, কিছু হয়নি। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেছি তো, আলস্য লাগছিল। তাই শুয়ে ছিলাম।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করেন, 'আমার ফোন টোন এসেছিল?'

'হ্যাঁ। একটাই এসেছে।'

'কার ফোন?'

'একজন মেয়েছেলে। নাম আর ফোন নম্বর লিখে টেবলের ওপর চাপা দিয়ে রেখেছি।'

সন্তোষ কাজ-চলা গোছের লেখাপড়া জানে। কেউ ফোন করলে নাম ঠিকানা

টিকানা লিখে রাখে। বাংলায় মোটামুটি গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারে। সামান্য কিছু ইংরেজিও জানে।

কে ফোনটা করতে পারে? অমলা কি? কিন্তু তিনি তো সকালেই একবার করেছেন। আবার রাতেও তাঁর সঙ্গে কথা হবে। তবে কে হতে পারে? সন্তোষ আর দু-একটা অফিসের কিছু লোকজন বাদ দিয়ে এই শহরে প্রণবেশের আসার খবর মাত্র দু'জন জানে। অনুবাধা আর রুমি। যে অফিস দুটো জানে, তাদের ডিরেক্টরদের সঙ্গে আজই কথা হয়েছে। ওঁদের ফোন করার সম্ভাবনা কম। রুমিকে কিছুক্ষণ আগে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে এসেছেন। যত এমার্জেন্সিই হোক, সে মরে গেলেও নিজের থেকে তাঁকে ফোন করবে না। তা হলে? বাকি থাকলেন অনুরাধা। নিশ্চয়ই তিনি করেছেন।

প্রণবেশ বললেন, 'কফি নিয়ে এসো—'

'এক্ষুনি আনছি—' ব্যস্তভাবে চলে যায় সন্তোষ।

বিছানা থেকে নেমে হল-ঘরে তাঁর টেবলে গিয়ে বসেন প্রণবেশ। টেলিফোনের পাশে এক টুকরো কাগজ পেপার-ওয়েট চাপা দেওয়া রয়েছে। কাগজটা তুলে নিতেই গোটা গোটা হরফে একটা নাম চোখে পড়ল—এ. মজুমদার। তার তলায় ফোন নম্বর। এ. মজুমদার কে হতে পারে? অনুরাধা তো মুখার্জি। তা ছাড়া যে ফোন নম্বরটা বযেছে সেটা ওদেব বাড়ির নয়।

কিছুটা সংশয়ের মধ্যে বোতাম টিপে টিপে নম্বরটা ধরে ফেলেন প্রণবেশ। 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে পরিচিত একটি কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'এ. মজুমদার স্পিকিং—'

প্রণবেশ বলেন, 'তুমি আমাকে দারুণ একটা ধাধায় ফেলে দিয়েছিলে। এ. মজুমদার কে, বুঝতে পারছিলাম না।'

টেলিফোনের ওধার থেকে অনুরাধা চাপা, বিব্রত স্বরে বলেন, 'বিয়ের পব মজুমদার হয়েছিলাম তো। ওটাই থেকে গেছে—'

প্রণবেশ চমকে ওঠেন। পরক্ষণে টেব পান বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যচ্ছে। যার সঙ্গে চিরদিনের মতো সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে তার পদবিটা এখনও আঁকড়ে ধরে আছেন অনুরাধা। কুড়ি বছর পর এই প্রথম প্রণবেশ সেটা জানতে পারলেন। কাঁপা, অস্পষ্ট গলায় শুধু বলেন, 'ও—'

অনেকটা সময় চুপচাপ।

তারপর প্রণবেশ জিজ্ঞেস করেন, 'এই ফোন নাম্বারটা কোথাকার?'

'আমার অফিস—গোল্ডেন এন্টারপ্রাইজ-এর।'

'আমার কেন যেন মনে হয়েছিল, তুমি আজ অফিসে যাবে না।'

অনুরাধা বলেন, 'একটা আর্জেন্ট কাজ ছিল। সে জন্যে না এসে উপায় ছিল না।' একটু থেমে ফোনে প্রায় মুখ লাগিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'রুমির সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

প্রণবেশ বলেন, 'হয়েছে।'

অনুরাধা চুপ করে থাকেন।

কেন তিনি ফোন করেছিলেন, বুঝতে অসুবিধা হয় না প্রণবেশের। রুমির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর কী কী ঘটেছে, এর ফলে মেয়ের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছে, জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন তিনি।

সব বলে গেলেন প্রণবেশ, খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দিলেন না।

সমস্ত শোনার পর ওধার থেকে প্রথমে জোরে শ্বাস টানার আওয়াজ ভেসে আসে। তারপর অনুরাধার মৃদু কণ্ঠস্বর, 'কী মনে হল, মেয়েটাকে ফেরানো যাবে?'

প্রণবেশ প্রাক্তন স্ত্রীর ব্যাকুলতা টের পাচ্ছিলেন। অনুরাধা যে ধরনের নরম মেয়ে, মানসিক চাপ একটু বেশি হলেই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবেন। ভরসা দেওয়ার সুরে বলেন, 'যাবে। তবে—'

'তবে কী?'

'ধৈর্যের দরকার। রুমির সঙ্গে থেকে ওর প্রবলেমটা সিমপ্যাথিটিকালি বুঝতে হবে। সেই সঙ্গে কড়া শাসনও দরকার—'

অনুরাধা বলেন, 'কিন্তু আমি—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে প্রণবেশ বলেন, 'তোমাব একার পক্ষে খুব বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। আমাকেই যা করার করতে হবে।'

'কী করতে চাও?'

আগে প্রণবেশ ভাবেননি। হঠাৎ তাঁর মাথায় কিছু একটা উপায় এসে যায়। বলেন, 'ঠিক করেছি, রোজ ছুটির পর রুমিকে ইউনিভার্সিটি থেকে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে টুরিয়ে তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দেব। আপাতত, ওর রি-অ্যাকশন কী হয় দেখি। তারপর অন্য কিছু চিন্তা করা যাবে।'

অনুরাধা বলেন, 'তোমার কোম্পানি পেলে নিশ্চয়ই কাজ হবে। কিন্তু—'

'কী?'

'তুমি আর ক'দিন কলকাতায় থাকতে পারবে? তারপর মেয়েটাকে নিয়ে আমি যে কী করব!'

বারো শ মাইল দূরের এক শহর যা কুড়ি বছর ধরে তাঁকে নতুন সংসার, নতুন স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, অজস্র টাকা, খ্যাতি এবং বিপুল সাফল্যের ফাঁদ পেতে আটকে

রেখেছে তার কথা ক্ষণিকের জন্য মনে থাকে না প্রণবেশের। গভীর গলায় বলেন, 'যতদিন দরকার আমি এখানে থেকে যাব।'

অনুরাধা বলেন, 'তুমি আমাকে বাঁচালে!' প্রাক্তন স্বামীর প্রতি তাঁর আস্থা, বিশ্বাস এবং নির্ভরতা এখনও কতটা অটুট সেটা তাঁর কণ্ঠস্বরে বোঝা যাচ্ছিল।

প্রণবেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে জিজ্ঞেস করেন, 'অফিস থেকে কয়েকদিন ছুটি নিতে পারবে?'

'পারব। অনেক আর্নড লিভ পাওনা রয়েছে। ক'দিনের জন্যে নিতে বলছ?'

'ধর দিন পনেরো। কাল থেকেই নিতে হবে।'

অনুরাধা বলেন, 'ঠিক আছে। আজই অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি।' একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করেন, 'ছুটি নিতে বলছ কেন? কোনও দরকার আছে?'

প্রণবেশ বলেন, 'হ্যাঁ। বাইরে আমি ওকে কোম্পানি দেব। বাড়িতে যতটা পাবো তুমি ওর কাছে কাছে থাকবে। যদি কিছু গোলমাল দেখ, আমাকে ফোন করো।'

'আচ্ছা—'

'রোজ ওর ক্লাস কখন শুরু হয়ে ক'টায় ছুটি হয়, জানো?'

'না। জিজ্ঞেস করলে রেগে যায়। তবে—'

'কী?'

'রোজকার রুটিন তো একরকম থাকে না। কোনওদিন দশটায় ক্লাস শুরু হয়, কোনওদিন বারোটায়। ছুটিও আলাদা আলাদা সময়ে—'

'ঠিক আছে। ও ইউনিভার্সিটিতে বেরুলেই আমাকে জানিয়ে দিও। তারপব যা করার আমি করব।'

'আচ্ছা।'

প্রণবেশ বলেন, 'যে বদ ছোকরাগুলোর সঙ্গে রুমি মেশে তাদের ঠিকানা কি ফোন নম্বর দিতে পার?'

অনুরাধা বলেন, 'পারি। ওর একটা ছোট ডায়েবি হঠাৎ আমার হাতে পড়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে ওগুলো ছিল। লুকিয়ে লিখে নিয়েছি।'

হালকা গলায় প্রণবেশ বলেন, 'মেয়ের ওপর গোয়েন্দাগিরির জন্যে?'

অনুরাধা বলেন, ইচ্ছে তো ছিল। আমি কেমন মানুষ তুমি তো জানোই—বড্ড ভীতু। কিছুই করতে না পেরে তবেই না তোমাকে বম্বেতে ফোন করেছিলাম।'

প্রণবেশ জানতে চান, 'আজ অফিস ছুটির পর সোজা বাড়ি যাচ্ছ তো?'

'তা ছাড়া আর কোথায় যাব? ওই মেয়ের জন্যে কোথাও কি যাওয়ার উপায় আছে? যেখানেই যাই সবাই ওর কথা জিজ্ঞেস করে। ভয়ে কারও মুখোমুখি হতে

চাই না। অফিসে না এলে ভাত জুটবে না, তাই আসা—'

অনুরাধার গলার স্বরে বিষাদ এবং চাপা একটা কষ্ট বেরিয়ে এসে প্রণবেশের মধ্যে যেন চারিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর সংকট এবং অসহায়তা অনুভব করতে পারছিলেন তিনি। অনেকক্ষণ নৈঃশব্দের পর বললেন, 'বাড়ি গিয়ে আমাকে ফোন নাম্বারগুলো গোপনে জানিয়ে দিও।' একটু থেমে বললেন, 'আর মেয়েটার রি-অ্যাকশান লক্ষ করো।'

অনুরাধা জিজ্ঞেস করেন, 'কিসের রি-অ্যাকশান?'

প্রণবেশ বলেন, 'এই যে আমার সঙ্গে আজ এতক্ষণ কাটালো, শুধু ভাল কথাই তো বলি নি, বেয়াড়াপনার জন্যে বকাঝকাও যথেষ্ট করেছি। তাই—'

'ভালই করেছ। ওটা খুবই দরকার। ঠিক আছে, লক্ষ করব।'

প্রণবেশ আর কিছু বললেন না। ফোন নামিয়ে রেখে পেছনের কাচের দেওয়ালের ওধারে লেকের দিকে অন্যমনস্কর মতো তাকালেন। আজ মেঘ টেঘ নেই। যতদূর তাকানো যায় নীলাকাশ পালিশ-করা আয়নাব মতো ঝকঝক করছে। কানায় কানায় ভরা লেকের জল, ঘন সবুজ গাছপালা, মানুষজন এবং ছুটন্ত গাড়ির সারি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বজবজ লাইনেব একটা ইলেকট্রিক ট্রেন ঝড় তুলে বালিগঞ্জের দিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ধীরে ধীবে জুহু বীচের সেই হোটেল কমপ্লেক্সের ড্রয়িংটা বার করে তার মধ্যে ডুবে গেলেন প্রণবেশ।

তারপর কখন সন্ধে নেমে গেছে, তার ভেতর সন্তোষ কখন দু'বার কফি দিয়ে হল-ঘরেব সবগুলো আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে টের পাওয়া যায়নি।

একসময় অনুরাধার ফোন এল। তিনি সেই বজ্জাত পাঁচ যুবকের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার জানিযে দিলেন, প্রণবেশ টুকে নিলেন। তারপব জিজ্ঞেস করেন, 'রুমি কী কবছে?'

অনুবাধা বলেন, 'গুম হয়ে ওর ঘরে বসে আছে।'

'আমার কথা কিছু বলেছে?'

'বলে আবার নি? আমি অফিস থেকে ফিরতেই চোটপাট শুরু করে দিল। তোমাব খবরদারি সহ্য করবে না। তার যা ইচ্ছা তাই করবে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাবে। যার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই সে মাতব্বরি করতে আসে কী কারণে? এই সব বলছিল।'

'বলুক। ভেতবকার রাগ, ক্ষোভ, অভিমান যা জমে আছে, বেরিয়ে যাক। তুমি কিন্তু রাগারাগি করো না।'

অনুরাধা বলেন, 'সে শক্তি বা সাহস কি আমার আছে? সবই মুখ বুজে সয়ে যাই। তুমি তো একসময় কত কিছু—' বলতে বলতে থমকে যান। হঠাৎ যেন মনে পড়ে নিজের অধিকারের সীমা তিনি অনেকটাই পেরিয়ে গেছেন। তারপর অসীম সঙ্কোচ কিংবা নিজের ভেতরকার কোনও ত্রাসে কিনা কে জানে, ছটফট করতে করতে বলেন, 'এখন ছাড়ি—'

লাইন কেটে দেওয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপরও অনেকক্ষণ ফোন হাতে নিয়ে বসে রইলেন প্রণবেশ।

।। সাত ।।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে মুখটুখ ধুয়ে, শেভ করে স্নান সেরে, টেবলে বসে কাজ শুরু করে দিয়েছেন প্রণবেশ। এর মধ্যে অবশ্য বেড-টি খাওয়া হয়ে গেছে।

এখন সাড়ে সাতটার মতো বাজে। আধঘন্টা বাদে এক কাপ কফি দিয়ে যাবে সন্তোষ। তাবও কিছুক্ষণ পর আসবে ব্রেকফাস্ট।

প্রণবেশ ঠিক করে ফেলেছেন রোজ রুমির ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত একটানা কাজ করে দিন দশেকের ভেতর হোটেল কমপ্লেক্সের ড্রয়িংটা শেষ করে বম্বেতে পাঠিয়ে দেবেন। যদি বোঝা যায়, আঁকাটা ওই সময়ের ভেতর কমপ্লিট করতে পারছেন না. কয়েক রাত জাগতে হতে পারে। মোট কথা, দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত সময়টা মোটামুটি তিনি রুমির জন্য আলাদা করে রাখবেন। এখানে রুমির ব্যাপারটা বাদ দিলে তাঁর হাতে একটানা অফুরন্ত সময়। বম্বেতে অফিসে গেলেই সহকর্মীদেব সঙ্গে পর পর কনফারেন্স, নানা লোকের ফোন. বিভিন্ন পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ—এসব তো করতেই হয়। অমলা ব্যবসার ব্যাপারটা দেখাশোনা করলেও ফাইনাল ডিলটা তিনিই করেন। এ সবের পব কাজের সময় খুব বেশি পাওয়া যায় না। কিন্তু কলকাতায় সে সমস্যা নেই, বিশেষ করে এবার। কেননা তাঁর আসার খবর কাউকেই জানানো হয় নি। ফলে হোটেল কমপ্লেক্সের কাজটা, আশা করা যায়, তাড়াতাড়িই শেষ করে ফেলা যাবে।

সাড়ে আটটায় ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসে সন্তোষ। খাওয়া শুরু করতে যাবেন, রুটিনমাফিক বম্বে থেকে অমলার ফোন এল। মিনিটখানেক ছকে-বাঁধা প্রশ্নোত্তর চলল। 'তুমি কেমন আছ?' 'অনিয়ম করবে না', 'রিচ খাবার খাবে না', 'ছেলেমেয়ে ভাল আছে, ঠিকমতো পড়াশোনা করছে', 'অফিসের কোনও প্রবলেম নেই'—ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রায় একই প্রশ্ন এবং একই উত্তর কলকাতায় আসার পর থেকে রোজ

দু'বেলা চলছে। যতদিন প্রণবেশ এখানে আছে—চলতে থাকবে।

অমলার কথার ফাঁকে প্রণবেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার উইকনেসটা কেটেছে?'

অমলা বলেন, 'কেটেছে। ডাক্তার বলেছেন এখন অফিসে যেতে পারি। ঠিক করেছি আজ থেকেই যাব। একটু পরে মহেশের সঙ্গে বেরুব।'

'বেশি স্ট্রেন করো না।'

'না না, আপাতত দু-চারদিন বিকেল হলেই চলে আসব। এখন রাখছি। রাত্তিরে আবার কথা হবে।'

'ঠিক আছে।'

লাইনটা কেটে দিতে গিয়ে হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় চেঁচিয়ে ওঠেন অমলা, 'না না, ছেড়ো না।'

একটু অবাক হয়ে প্রণবেশ বলেন, 'কী হল?'

'একটু কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

'কী কথা?'

'তুমি কি এবার কলকাতায় গিয়ে আত্মীয়স্বজন কারও সঙ্গে যোগাযোগ কর নি?'

হঠাৎ পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা ঝাঁকুনি লাগে প্রণবেশের। খুব সতর্কভাবে তিনি বলেন, 'হঠাৎ এ কথা জানতে চাইছ?'

অমলা বুঝিয়ে দেন, কাল রাতে প্রণবেশের সঙ্গে কথা হওয়ার পর তাঁর পিসতুতো বোন টুলু বম্বেতে ফোন করেছিল। তাঁদের খবর নেবার পর লাইনটা প্রণবেশকে দিতে বলল। অমলা তখন তাকে বলেন, প্রণবেশ বম্বেতে নেই। কোথায় গেছেন সেটা অবশ্য টুলু জানতে চায়নি।

দম বন্ধ করে শুনছিলেন প্রণবেশ। আস্তে নিশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'কলকাতার কথা যে বলনি, সেটা আমার পক্ষে বাঁচোয়া।'

অমলা বলেন, 'তার মানে তুমি চাও না, কলকাতায় তোমাকে কেউ ডিসটার্ব করুক।'

'রাইট।'

'সেটা গেস করেই কলকাতার খবরটা টুলুকে দিইনি।'

আসলে অমলার সঙ্গে প্রণবেশের খুড়তুতো জেঠতুতো পিসতুতো মামাতো ভাইবোনদের সম্পর্কটা খুব ভাল। মাঝে মাঝেই তারা ওঁকে ফোন করে। কোনওরকমে যদি ওদের কেউ টের পায় তিনি কলকাতায় এসেছেন, ঝাঁকে ঝাঁকে সবাই এসে হানা দিতে থাকবে। যে উদ্দেশ্যে এতদূর ছুটে আসা, সেটা পুরোপুরি

নষ্ট হয়ে যাবে। তখন আক্ষেপের শেষ থাকবে না।

প্রণবেশ বলেছেন, 'খুব ভাল করেছ। আর কেউ যদি ফোন করে, আমার কথা জানিও না। আমি নিরিবিলিতে এখানে কাজ করতে চাই। সব কমপ্লিট করার পর আমি নিজেই ওদেব ফোন করে ডাকিয়ে আনব।'

'আচ্ছা।'

স্ত্রীর সঙ্গে মিথ্যাচারের জন্য খারাপ লাগছিল প্রণবেশের। কিন্তু এ ছাড়া কী-ই বা করার আছে? মনের গোপন আলোছায়া-ঘেরা অংশে আতিপাঁতি করে খুঁজেও প্রতারণার সামান্য অভিযোগটুকুও পাওয়া গেল না। না, অমলাকে তিনি ঠকাননি।

এরপর টানা দু ঘণ্টা একটানা কাজ করে গেলেন প্রণবেশ। তার মধ্যে আর কোনও ফোন টোন আসেনি। ঠিক সাড়ে দশটায় তিনি নিজেই পর পর কয়েকটা কর্পোরেট অফিস এবং রিয়েল এস্টেট কোম্পানির হেড কোয়ার্টার্সে ফোন করলেন। দুটো কর্পোরেট অফিস জানালো জানুয়ারির শেষ দিকে তাঁরা প্রণবেশের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। কলকাতায় তাদের দুটো হাই-রাইজ বিল্ডিং তৈরির পরিকল্পনা আছে। একটা রিয়েল এস্টেট কোম্পানি জানালো, তিনি এসময় কলকাতায় আসায় তাদের পক্ষে ভালই হয়েছে, নইলে এই মাসেই বম্বে ছুটতে হত। কেননা তারা কলকাতার কাছাকাছি একটা বিশাল আবাসন প্রকল্পে হাত দিয়েছে। তার নক্‌শাটা প্রণবেশকে দিয়ে করাতে চায়। জানতে চায়, কবে তিনি এ বিষয়ে আলোচনার জন্য তাদের অফিসে যেতে পারবেন। প্রণবেশ কয়েক দিন পরের একটা ডেট দেন। অন্য দুটো রিয়েল এস্টেট কোম্পানিও দুটো প্রোজেক্টের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে বলতে চায়। দশদিন পর প্রণবেশ তাদেরও ডেট দিলেন।

সাড়ে এগারোটায় অনুরাধার ফোন এল। তিনি জানিয়ে দিলেন পাঁচ মিনিট আগে রুমি ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছে।

প্রণবেশ বললেন, 'ঠিক আছে।'

একটু চুপ করে থেকে অনুরাধা বলেন, 'আরেকটা খবর দিচ্ছি—'

'কী?'

'কাল রতে, ন'টায় রুমির একটা ফোন এসেছিল; দূর থেকে শুনলাম দু-তিনবার ও গুরনাম গুরনাম বলল। মনে হয় সেই পাঞ্জাবি ছেলেটা।'

'কী বলছিল স্কাউন্ড্রেলটা?'

'ছেলেটার কথা তো শুনতে পাইনি। তবে রুমি যা উত্তর দিচ্ছিল তা থেকে আন্দাজ করলাম সন্ধের পর ওর কোথাও গিয়ে গুরনাম আর কয়েকজনের সঙ্গে

দেখা করার কথা ছিল। যায়নি বলে ছেলেটা খুব সম্ভব খোঁজ নিচ্ছিল।'

'গুরনাম ছাড়া আর কয়েক জনের কথা যে বললে তারা কারা?'

'কারা আবার? ওদের দলের সেই বদমাশগুলো। এদের কথা তো তোমাকে বলেছি।'

একটু ভেবে প্রণবেশ জিজ্ঞেস করেন, 'কেন রুমি কাল গুরনামদের আড্ডায় যায়নি তার কারণটা বলেছে?'

অনুরাধা বলেন, 'তা শুনিনি। তবে আজ নাকি বিকেলে ওরা মিট করবে।'

'খবরটা দিয়ে ভাল করলে। কী করে ও মিট করে, সেটা আমি দেখছি।' বলতে বলতে মুখ শক্ত হয়ে ওঠে প্রণবেশের। তাঁর সংশয়টাই ঠিক। কাল অত বোঝানো এবং কড়াভাবে সাবধান করে দেওয়ার পরও রুমি তা সহজে মেনে নেবে না।

অনুরাধা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কী করতে চাও তুমি?'

প্রণবেশ বললেন, 'যা করলে মেয়েকে নিয়ে তোমার আর আমার দুশ্চিন্তা চিরকালের মতো কেটে যাবে তাই করব।'

অনুরাধা এবার আর কিছু বলেন না।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে, একটা বড় পার্সে বেশ কিছু টাকা পুরে দেড়টায় ইউনিভার্সিটিতে চলে এলেন প্রণবেশ। কমপাউন্ডের একধারে, গেটের কাছাকাছি মারুতি ওমনিটাকে পার্ক করে হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দেখেন ক্লাস চলছে। সেই বেয়ারাটার কাছে খবর নিয়ে জানলেন, রুমি ইউনিভার্সিটিতে এসেছে এবং ক্লাস করছে। আরও জানা গেল, এর পর একটানা আরও দুটো ক্লাস আছে। ছুটি হবে তিনটেয়।

রুমি যদি সবগুলো ক্লাস না করে আগেই বেরিয়ে যায়, তাকে যেতে হবে সামনের গেট দিয়ে অর্থাৎ যেখানে প্রণবেশের গাড়িটা পার্ক করা রয়েছে। এ ছাড়া ইউনিভার্সিটির বাইরে যাওয়ার আব কোনও রাস্তা নেই।

হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে নেমে এসে নিজের গাড়িতে বসে থাকেন প্রণবেশ। যতক্ষণ না রুমি আসছে এখানেই অপেক্ষা করবেন। বাড়ি থেকে আসার সময় আগাথা ক্রিস্টির একটা ক্রাইম স্টোরির বই নিয়ে এসেছিলেন। তখন ধারণা ছিল না এখানে কতক্ষণ কাটাতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ থাকতে হতে পারে সেটা আন্দাজ করেই বইটা এনেছিলেন। মুখ বুজে চুপচাপ বসে থাকার চাইতে বই নাড়াচাড়া করলে একঘেয়েমিটা অন্তত কাটবে।

ক্রাইম স্টোরির পাতা উল্টে যাচ্ছিলেন ঠিকই, কিন্তু প্রণবেশের চোখ বার বার

চলে যাচ্ছিল হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের দিকে। অন্যমনস্কতার কারণে নাম-করা লেখিকার জগদ্বিখ্যাত রহস্য কাহিনীটির একটি বর্ণও তাঁর মাথায় ঢুকছিল না।

বসে থাকতে থাকতে একটা কথা ভেবে মজাও লাগছে প্রণবেশের। তাঁর মতো একজন সফল আর্কিটেক্ট, যাঁর প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান, তিনি কিনা একটি মেয়ের জন্য সব কাজ ফেলে ঘন্টার পর ঘন্টা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন। তাঁর বন্ধুবান্ধব বা চেনাজানা লোকজন এখানে, এভাবে তাঁকে দেখলে একেবারে হাঁ হয়ে যেত। কিন্তু তারা তো জানে না, তিনি শুধু সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন করছেন, তার বেশি কিছু নয়। আরও একটা কথা মনে পড়তে মজাই লাগল। রুমির মতো একদা তার মা অর্থাৎ অনুরাধার জন্যও তিনি বেঙ্গলি ডিপার্টমেন্টের সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিয়েছেন।

তিনটে বেজে যখন দশ, সেই সময় দেখা গেল, হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে ছেলেমেয়েরা পাঁচ সাতজনের একেকটা দলে হইচই করতে করতে বেরিয়ে আসছে। রুমিকেও দেখা গেল। তবে সে কোনও দলে নেই। আলাদাভাবে একা একা, বেশ ব্যস্তভাবেই ইউনিভার্সিটির মেইন গেটের দিকে চলেছে।

গাড়ি থেকে নেমে লম্বা লম্বা পা ফেলে রুমির সামনে চলে আসেন প্রণবেশ। তাঁকে আজও এখানে দেখবে, ভাবতে পারেনি রুমি। কিছুক্ষণ হতবাক দাঁড়িয়ে থাকে সে, তারপর বিমূঢ়ের মতো বলে, 'আপনি!'

হেসে হেসে প্রণবেশ বলেন, 'হ্যাঁ। তোমার জন্যে সেই দেড়টা থেকে অপেক্ষা করছি।'

কপাল কুঁচকে যায় রুমির। বলে, 'কালই তো আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আজ আবার কী দরকার?'

'তোমাকে রোজই তো দেখতে ইচ্ছে করে।'

'কুড়ি বছর পর এই সব সেন্টিমেন্টাল কথা বলে কী লাভ? দিজ আর অল মিনিংলেস টু মি।'

'তুমি বড় হয়েছ। কেন এতদিন তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারিনি, সেটা তোমার অজানা নয়।'

রুমি কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রণবেশ বলেন, 'কাল তুমি অনেক রাগারাগি করেছ, আমিও হয়তো তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিনি। নিশ্চয় দু'জনেই খুব কষ্ট পেয়েছি। লেট আস ফরগেট দ্যাট। আজ থেকে যুদ্ধ নয়, সন্ধি।'

রুমি সন্দিগ্ধভাবে প্রণবেশকে লক্ষ করতে থাকে। কাল যাঁকে শেষ দিকে অত্যন্ত কঠোর মনে হয়েছিল, আজ শুরু থেকেই তিনি আর্দ্র,কোমল স্বরে কথা বলছেন।

লোকটার কৌশল ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সে বলে, 'আমার কাছে আপনি কী চান বলুন তো?'

হাসিমুখে প্রণবেশ বলেন, 'চাই তো অনেক কিছুই। এসো—'

'মানে?'

'মানেটা হল আমার সঙ্গে তুমি যাবে।'

রুমি হঠাৎ রেগে যায়। তীব্র গলায় বলে, 'আপনি আমাকে জোর করে নিয়ে যাবেন নাকি?'

প্রণবেশ অবাক হওয়ার ভাব করেন। বলেন, 'আবার রাগ করে! জোর তো আমি করিনি। আদর করে নিয়ে যেতে চাইছি।'

আজ প্রথম থেকেই তাঁর ভঙ্গিটা রক্ষণাত্মক। কেউ খেপে গিয়ে কড়া কথা বললে বা উত্তেজিত হয়ে কিছু করে বসলে, গলার স্বর চড়িয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া করা যায়। এ ধরনের লোকদের টিট করার কায়দা রুমির জানা আছে। কিন্তু যিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন কণ্ঠস্বরকে কোনওভাবেই উঁচুতে তুলবেন না আর মুখে স্নিগ্ধ হাসিটি সারাক্ষণ ধরে রাখবেন তাঁর বিরুদ্ধে কী-ই বা করা যায়? রাগারাগি করে লাভ নেই। কেননা প্রণবেশ যেন স্থিরই করে রেখেছেন কোনও কিছুই আজ গায়ে মাখবেন না। আরেকটা কাজ করা যায়, তাঁকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিজের ইচ্ছামতো চলে যাওয়া কিন্তু সেটাও পারা যাচ্ছে না। রুমি চুপ করে থাকে।

প্রণবেশ ঘড়ি দেখে বলেন, 'আমরা পনের মিনিট সময় এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নষ্ট করলাম। এতক্ষণে কতদূর যাওয়া যেত বল তো? প্লিজ এসো—'

এই মানুষটির মধ্যে প্রবল এক ব্যক্তিত্ব যে রয়েছে সেটা কালই টের পেয়েছিল রুমি। এঁর ইচ্ছা বা অনুরোধকে বেশিক্ষণ প্রতিরোধ করার শক্তি তার নেই। নিঃশব্দে গাড়িতে উঠে বলে, 'পাঁচটায় আমাকে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

প্রণবেশও উঠে পড়েছিলেন। 'সে দেখা যাবে'খন—' বলে গাড়িটাকে ইউনিভার্সিটি কম্পাউণ্ডের ভেতর থেকে বাইরের বড় রাস্তায় নিয়ে আসেন।

খানিকটা যাওয়ার পর প্রণবেশ লক্ষ করেন, অসন্তুষ্ট রুষ্ট মুখে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে রুমি। খুব আস্তে তিনি তাকে ডাকেন।

রুমি কিছু বলে না। একবার প্রণবেশকে দেখে পরক্ষণে ফের উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

প্রণবেশের ওপর পুরনো দিনের স্মৃতি যেন ভর করতে শুরু করে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে?'

রুমি সাড়া দেয় না।

প্রণবেশ বলেন, 'তুমি বেড়াতে খুব ভালবাসতে। বাড়িতে একেবারেই থাকতে চাইতে না। ছুটির দিনে তো বটেই, অন্য উইক-ডে গুলোতেও এই আজকের মতো তোমাকে নিয়ে গাড়ি করে বেরিয়ে পড়তাম। তখন আমাদের একটা অস্টিন ছিল—'এরপর আশ্চর্য এক ঘোরের মধ্যে যেন বহুকাল আগের টুকরো টুকরো, অসংখ্য ঘটনার বিবরণ দিয়ে যান। রুমিকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে অনেকদূর চলে যেতেন। একবার ব্যান্ডেল চার্চ পর্যন্ত গিয়েছিলেন।...ছেলেবেলায় ভাষণ চঞ্চল আর জেদি ছিল রুমি। তার জেদ ছিল অনেকটা প্রণবেশেরই মতো। কোনও কিছুর জন্য বায়না ধরলে সেটা তার চাই-ই চাই। না পেলে হাতের সামনে যা পেত ভেঙে ফেলত। একবার কী জন্যে যেন পাঁচ ছ'টা কাচের গেলাস ভেঙে ফেলেছিল।... রোজ সকালে জেগে ওঠার পর মাথার কাছে একটা চকোলেট তার চাই। নইলে কেঁদে, চেঁচিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিত। তাই আগের দিন রাতে সে ঘুমিয়ে পড়লে অনুরাধা বা প্রণবেশ তার বালিশের পাশে চকোলেট রেখে দিতেন।...এমনিতে অস্টিন চড়ে বেড়াতে ভালবাসত কিন্তু স্কুল যাওয়ার সময় রিকশা চাই।...

রুমিকে কুড়ি বছর আগের সেই দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে মাঝে মাঝে তার দিকে তাকাচ্ছিলেন প্রণবেশ। সে কিছুই বলছে না, চুপচাপ বসে আছে। তবে সেই অসন্তুষ্ট ভাবটা আর নেই, মুখটা ক্রমশ অনেক নরম হয়ে আসছে।

হেসে হেসে প্রণবেশ বলেন, 'ছোটবেলার কথা কিছু মনে পড়ছে?'

রুমি উত্তর দেয় না।

প্রণবেশ তার স্মৃতিতে উসকে দেওয়ার জন্যই হয়তো বলেন, 'তখন তোমার ভীষণ রাগ ছিল। একবার খেপে গিয়ে আমার বাঁ হাতে কামড় বসিয়ে মাংস তুলে ফেলেছিলে। এখনও তার দাগ আছে। এই দেখ—'বলে শুধু ডান হাতে স্টিয়ারিং ধরে বাঁ হাতটা তুলে দেখান। সত্যিই কবজির কাছে ইঞ্চিদেড়েক কালো একটা দাগ রয়েছে, ক্ষত শুকিয়ে যাওয়ার পার যেমনটা হয় ঠিক তেমনি।

বুঝিবা নিজের অজান্তে এক পলক দেখেই চোখ ফিরিয়ে নেয় রুমি। তার মুখে হাসির ক্ষীণ একটু আভাস দেখা দিয়েই কি মিলিয়ে যায়? বোঝা গেল না।

গাড়ি চালাতে চালাতে প্রণবেশ অনবরত কথা বলে যাচ্ছিলেন ঠিকই, তবে এই ঘোরাঘুরিটা নিছক উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ নয়। তাঁর মাথায় নির্দিষ্ট একটা গন্তব্য ছিল। সেখানে অর্থাৎ ক্যামাক স্ট্রিটের কাছে একটা এয়ার-কন্ডিশানড সুপার মার্কেটের ভেতর এসে পার্কিং জোনে গাড়িটা থেকে নামতে নামতে বলেন, 'নামো—'

বেশ অবাক হয়েই গিয়েছিল রুমি। জিজ্ঞেস করে, 'এখানে কী?'

'নামোই না' আমি ক'টা জিনিস কিনব। তুমি পছন্দ করে দেবে।'

'আপনি কিনবেন আর আমি পছন্দ করব! ভেরি স্ট্রেঞ্জ।'

প্রণবেশ বলেন, 'লক্ষ্মী মেয়ে, আর কথা বলে না। নেমে এসো। প্লিজ—'

কী ভেবে দরজা খুলে নেমে পড়ে রুমি। গাড়িটা লক করে তাকে নিয়ে মার্কেটের ভেতর চলে আসেন প্রণবেশ। প্রথমে একটা জুয়েলারি শো-রুম থেকে হীরের লকেটওলা সুন্দর চেইন হার কেনেন। তারপর দোকানে দোকানে ঘুরে মেয়েদের রিস্টওয়াচ, প্রচুর সালোয়ার কামিজের দামী পিস, শাড়ি, জিনসের ট্রাউজার্স, মেয়েদের শার্ট এবং কসমেটিকস। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সবগুলোই রুমিকে পছন্দ করে দিতে হয়।

একটা হালকা রঙের ছোট ছোট নকশাওলা মাইশোর সিল্কের শাড়ি ভাল লেগে গিয়েছিল প্রণবেশের। খুব ইচ্ছা হয়েছিল অনুরাধার জন্য কিনে নেবেন কিন্তু পরক্ষণে সম্পর্কের প্রশ্নটা তাঁকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। কোন অধিকারে তিনি বিবাহবিচ্ছিন্ন স্ত্রীকে শাড়ি উপহার দেবেন? অনুরাধা যে ধরনের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মহিলা, তিনি কোনওমতেই তা নেবেন না। শাড়িটা শেষ পর্যন্ত আর কেনা হল না।

দশ-বারোটা সুদৃশ্য প্যাকেট, কসমেটিকস বক্স, ঘড়ি আর গয়না ইত্যাদি নিয়ে প্রণবেশরা যখন ফের মারুতি ওমনিতে এসে ওঠেন, পাঁচটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। এতক্ষণ একটা বিস্ময়ের মধ্যে ছিল রুমি, সেই সঙ্গে ছিল অপার কৌতূহল। কেনাকাটার ব্যাপারে প্রণবেশের কাছে তার পছন্দ এত মূল্যবান কেন সেটা বুঝে উঠতে পারছিল না। হঠাৎ খানিক দূরে উঁচু টাওয়ার ক্লকে নজর পড়তেই সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। গুরনামদের বলেছিল, পাঁচটায় তাদের সঙ্গে দেখা করবে। সেটা জানতে পারলে প্রণবেশ নিশ্চয়ই রেগে উঠবেন। সে স্থির করে ফেলে রাস্তায় সুবিধামতো কোনও একটা জায়গায় নেমে ট্যাক্সি বা অটো টটো ধরে গুরনামদের কাছে চলে যাবে।

সুপার মার্কেট থেকে বেরিয়ে এ গলি সে গলি দিয়ে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটে চলে আসেন প্রণবেশ, সেখান থেকে দু মিনিটের ভেতর চৌরঙ্গি। সোজা দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে তারিফের সুরে প্রণবেশ বলেন, 'তোমার সিলেকশান চমৎকার। যা যা বেছে দিয়েছ তার চেয়ে ভাল জিনিস ওই মার্কেটে আর ছিল না।'

আচমকা রুমির মনে হয়, বম্বেতে প্রণবেশের যে মেয়ে আছে তার জন্য ওই সব দামী দামী পোশাক, হার টার কিনেছেন তিনি। সে বলে, 'আপনার মেয়ের পছন্দ হবে তো?'

গভীর চোখে রুমির দিকে তাকিয়ে প্রণবেশ বলেন, 'আমার তো সেই রকমই ধারণা।'

রুমি বলে, 'না হলে আবার ওগুলো বদলাতে হবে। তাতে—'

বলতে বলতে তার মনে হয়, একটু যেন বেশিই কথা বলে ফেলেছে। প্রণবেশকে বদলাতে হোক বা না হোক সে জন্য তার মাথাব্যথা কিসের। সে এবার নিজেকে নিস্পৃহ রাখতে চেষ্টা করে।

প্রণবেশের মুখে প্রায়-অদৃশ্য একটু হাসি ফুটে ওঠে। তিনি ষড়যন্ত্রকারীর মতো ফিস ফিস করে বলেন, 'আই অ্যাম সিওর—বদলাতে হবে না।'

রুমি আর কোনও প্রশ্ন করে না।

একটা ট্রাফিক সিগন্যালে এসে মারুতি ওমনি আটকে গিয়েছিল। এতক্ষণে কলকাতার এই বিজনেস ডিস্ট্রিক্টে ছুটি হয়ে গেছে। আড়াআড়ি রাস্তাটা দিয়ে গাড়ির স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

রুমি কিছুক্ষণ ধাবমান ট্যাক্সি, মিনি, প্রাইভেট কারের দিকে অনামনস্কর মতো তাকিয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'একটা কথা বলব?'

একটু চমকে মুখ ফেরান প্রণবেশ। বলেন, 'হ্যাঁ—বল।'

'এই যে আপনি আমাকে নিয়ে দু'দিন এত ঘোরাঘুরি করছেন, আপনার ছেলেমেয়ে স্ত্রী জানতে পারলে তার রেজাল্ট কী হতে পারে বলে মনে করেন?'

প্রণবেশ প্রথমটা হকচকিয়ে যান। তারপর বলেন, 'আমি অন্যায় কিছু করছি না। আমি আমার মেয়েকে নিয়ে একটু ঘুরতে পারি না?'

'আপনার মেয়ে!'

'আমার পাশে এই মুহূর্তে যে বসে আছে আর প্রতিটি কথায় রেগে রেগে উঠছে সে কে? তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অস্বীকার করতে পার?'

চমকে ওঠে রুমি। বলে, 'ওটা আমার কথার উত্তর হল না। আপনার স্ত্রী ছেলেমেয়ে জেনে ফেললে তার ফল কী হবে সেটা কিন্তু এখনও আমাকে বলেন নি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর খানিকটা বেপরোয়া ভঙ্গিতেই যেন প্রণবেশ বলেন, 'যদি জানতে পারে তখন দেখা যাবে।'

'তার মানে লুকিয়ে লুকিয়ে আপনি মা আর আমার সঙ্গে দেখা করতেই থাকবেন?' প্রশ্নটা করে রুমি স্থির দৃষ্টিতে প্রণবেশের চোখের দিকে তাকায়।

প্রণবেশের শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে শিহরণ খেলে যায়। রুমির সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল নিজেকে ক্ষয় করা ছাড়া অন্য কোনও দিকে তার লক্ষ্য নেই। প্রবল হঠকারিতা ছাড়া সে আর কিছুই বোঝে না। এখন দেখা যাচ্ছে আত্মহননকারী মেয়েটার নজর বহুদূর পর্যন্ত ছড়ানো। অবাক বিস্ময়ে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার

মায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়, কে বললে?'

'সেটা স্বাভাবিক কিনা চিন্তা করে দেখুন। কেউ না বললে আমি বুঝতে পারব না, এটা আপনি ভাবলেন কী করে? আমাকে এতটা স্টুপিড মনে করার কারণ নেই।'

রুমির কাছে ধরা পড়ে কিছুক্ষণ বিহ্বলের মতো বসে থাকেন প্রণবেশ। পলকের জন্য একটা অপরাধবোধ ভেতরে ভেতরে তাঁকে বিপর্যস্ত করে দেয়। উদ্‌ভ্রান্ত মেয়েকে ফেরানোব জন্য প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলাটা হয়তো মেনে নেওয়া যায় কিন্তু তাঁর সঙ্গে গোপনে দেখা করাটা সামাজিক বা নৈতিক দিক থেকে কতটা গর্হিত আচরণ সেটা ভাবার চেষ্টা করেন। পরক্ষণে আত্মরক্ষার জন্য যে কৈফিয়ৎটা তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন তা মনে পড়ে যায়। বলেন, 'অনেক অপ্রিয় ব্যাপার অ্যাভয়েড করাব জন্যে মাঝে মাঝে গোপনতার আশ্রয় নিতে হয়ে রুমি। তোমার বয়েস তো কম. যখন অভিজ্ঞতা বাড়বে তখন সেটা বুঝতে পারবে। একটা বিষয়ে তোমাকে অ্যাসিওর করতে পারি—'

'কী?' রুমির চোখেমুখে ঔৎসুক্য ফুটে বেরোয়।

প্রণবেশ বলেন, 'আমি কারও সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করছি না।'

হাসির একটা ভঙ্গি কবে রুমি। বলে, 'যে যেমন কাজই করুক নিজের মতো তার একটা লজিক তৈরি করে রাখে।'

রুমি উত্তর দেয় না।

প্রণবেশ বলেন, 'আমার লজিকটা কি তোমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না?'

রুমি এবারও চুপ।

প্রণবেশ এবাব বলেন, 'লুকিয়ে চুরিয়ে কারও ভালর জন্যে কিছু করলে, তাতে অন্যের ক্ষতি যদি না হয, সেটা অন্যায় কিছু নয়। মানুষের জীবন এখন বড় জটিল ব্যাপাব রুমি, ভীষণ কমপ্লিকেটেড। সব সময সবাইকে সমস্ত কিছু জানিয়ে চলা যায় না। তাতে জটিলতা, অশান্তি আরও বেড়ে যায়।' বলতে বলতে তাঁর মনে হয় কথাগুলো অনেকটা ক্লাস লেকচারের মতো হয়ে গেল কিন্তু এ ছাড়া আর কী-ই বলা যেত!

মিনিট পাঁচেক আটকে থাকার পব সিগন্যালে সবুজ আলো জ্বলে ওঠে। প্রণবেশ গাড়িটা এলগিন রোডেব ক্রসিং পার করে ডান দিকের একটা রাস্তায় নিয়ে আসেন।

রুমি চকিত হয়ে বলেন, 'গাড়ি থামান—গাড়ি থামান—'

মারুতি ওমনির থামার কোনও লক্ষণ নেই। সেটা হরিশ মুখার্জি রোডের কাছাকাছি চলে এসেছে।

রুমি গলা উঁচুতে তুলে বলে, তখন বললাম না, আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট

আছে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমাকে এখানে নামিয়ে দিন।'

রাস্তার বাঁক ঘুরে হরিশ মুখার্জি রোডে এসে গম্ভীর ভারী গলায় প্রণবেশ বলেন, 'কালই তো তোমাকে বলে দিয়েছি, ইউনিভার্সিটি ছুটি হলে সোজা বাড়ি চলে আসবে। অন্য কোথাও যাওয়া চলবে না।'

এতক্ষণ যে শান্ত, স্নেহপ্রবণ প্রণবেশকে দেখা যাচ্ছিল তিনি মুহূর্তে আগাগোড়া বদলে গেছেন। তবে কালকের মতো কঠোর বা রূঢ় নন। তাঁর চোখেমুখে কণ্ঠস্বরে এমন এক দৃঢ়তা—যা ঠিক বোঝানো যায় না তবে অনুভব করা যায়—ফুটে উঠেছে। রুমি ভেতরে ভেতরে ধাক্কা খায়। কিন্তু তার স্বভাবে যে ঔদ্ধত্য বা একগুঁয়েমি রয়েছে সেটা সহজে ঘাড় নোয়াতে জানে না।

রুমি বলে, 'আপনি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিলেও পরে বেরিয়ে যেতে পারি। মা অফিসে ছুটি নিয়েছে। কিন্তু আমাকে আটকে রাখতে পারবে না।'

'তুমি বেরুবে না। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে বুঝতে পারবে এভাবে বেরুনোটা ঠিক নয়। আমার আর তোমার মায়ের ওপর রাগ করে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করার মানে হয় না।'

'এই ধরনের কথা কালও বলেছেন।'

'যতবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে ততবার বলব।'

রুমি গুম হয়ে বসে থাকে। কিছুক্ষণ পর আবার বলে, 'এভাবে বুঝি আমার ওপর দয়িত্ব পালন করতে চান?'

ব্যথিতভাবে প্রণবেশ বলেন, 'এমন কথা আগেও বোধহয় তুমি আমাকে বলেছ।'

'হয়তো বলেছি, মনে নেই। তবে যতবার দেখা হবে ততবারই তো বলা উচিত।' বলতে বলতে প্রণবেশের দিকে ঝোঁকে রুমি, 'শুনেছি আপনি কান্ট্রির একজন বিজিয়েস্ট আর্কিটেক্ট। কতদিন কলকাতায় বসে থেকে আমার ওপর পাহারাদারি করবেন?'

মেয়েটা ক্রমশ আক্রমণাত্মক হতে শুরু করেছে। প্রণবেশ জানেন তিনি অধৈর্য হয়ে উঠলে হিতাহিতজ্ঞানশূন্যের মতো কিছু একটা কাণ্ড করে বসবেন। হেসে হেসে হালকা গলায় বলেন, 'যতদিন দরকার করব।' রুমি উত্তেজিতভাবে কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে তো জেন্টলম্যানস এগ্রিমেন্ট হয়ে গেছে—আর যুদ্ধ নয়, সন্ধি—আ পারফেক্ট ট্রুস। শ্বেত পতাকা তুলে দিলে কেউ আর বন্দুকের ট্রিগার টেপে না, কি তলোয়ারের কোপ বসায় না, অস্ত্র নামিয়ে রাখে।'

নাটকীয় সুরে যেভাবে প্রণবেশ বললেন তার মধ্যে দারুণ একটা মজার ব্যাপার ছিল। নিজের অজান্তে হেসে ফেলে রুমি।

পলকহীন মেয়ের দিকে তাকিয়ে প্রণবেশ বলেন, 'দ্যাটস লাইক আ গুড গার্ল। তোমার মুখে এই হাসিটাই আমি দেখতে চেয়েছিলাম।'

আস্তে আস্তে চোখ দুটো ফিরিয়ে নেয় রুমি।

একসময় গাড়িটা অনুরাধাদের বাড়ির সামনে পৌঁছে যায়।

দরজা খুলে নামতে যাচ্ছিল রুমি, ব্যাক সিটে জিনস টিনসের প্যাকেট, কসমেটিকস আর ঘড়ি গয়নার বাক্স দেখিয়ে প্রণবেশ বলেন, 'ব্যাকডোরটা খুলে ওগুলো কিন্তু নিয়ে যাবে। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি তোমাকে সাহায্য করছি।'

রুমি ফুটপাথের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে যায়। বলে, 'তার মানে?'

প্রণবেশ বলেন, 'মানে আবার কী? নাও—'

রুমি বলে, 'আমি নেবো কেন? ওগুলো তো আপনার মেয়ের জন্যে কিনেছেন।'

'হ্যাঁ, মেয়েব জন্যেই তো কিনেছি—'বলতে বলতে প্রণবেশের সারা মুখে স্নিগ্ধ, মালিন্যহীন হাসি ফুটে ওঠে।

প্রণবেশ কীসের ইঙ্গিত দিয়েছেন, মুহূর্তে রুমির কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। আশ্চর্য, এটা অনেক আগেই তার বোঝা উচিত ছিল। এই যে ইউনিভার্সিটি থেকে তাকে গাড়িতে তুলে সুপাব মার্কেটে নিয়ে যাওয়া, তাকে নিয়ে শাড়ি হার ঘড়ি টড়ি পছন্দ করানো—এসবের পেছনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল প্রণবেশেব। আর সে কিনা ভেবেছে ওগুলো কেনা হয়েছে তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের মেয়েটির জন্য। তার মনে হয় প্রণবেশ তাঁকে ধোঁকা দিয়েছেন। এই চাতুরি তাঁর মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দেয়। তীব্র, চাপা গলায় রুমি বলে, 'আগে কিন্তু একবারও বলেন নি, কেন আমাকে শপিং সেন্টারে নিয়ে যাচ্ছেন। জানলে কিছুতেই যেতাম না। এই ট্রিকটা আমার সঙ্গে না করলেই পারতেন।'

'ট্রিক!'

'নয়তো কী? আপনার কি ধারণা ক'টা জিনস কি শাড়ি টাড়ি দিয়ে কুড়ি বছরের কমপেনসেসান হয়ে যায়?'

বিব্রতভাবে প্রণবেশ বলেন, 'জানি যায় না। আমি শুধু তোমাকে একটু খুশি করতে চেয়েছিলাম। আর—'

রুমি বলে, 'আপনার কোনও কিছুই আমার দরকার নেই।' বলে গাড়ি থেকে নেমে বড় বড় পা ফেলে কালকের মতো বাড়ির ভেতরে চলে যায়। পেছনে ফিরে একবারও তাকায় না।

বিষণ্ণ, মলিন মুখে অনেকক্ষণ বসে থাকেন প্রণবেশ। তারপর ক্লান্তভাবে গাড়িতে স্টার্ট দেন।

।। আট ।।

কেয়াতলায় ফিরে এসে হল-ঘরে নিজস্ব টেবলটার সামনে গিয়ে প্রণবেশ বসেন ঠিকই, কিন্তু আজ আর কাজে মন বসে না। রুমিকে তিনি বলেছেন, তাকে শোধরানোর জন্য যতদিন দরকার কলকাতায় থেকে যাবেন কিন্তু সেটা ছিল আবেগের কথা। হয়তো তাঁর সঙ্গে চাপা রাগ বা জেদও মেশানো ছিল। এটা তো ঠিক, অনন্তকাল তাঁর পক্ষে এখানে পড়ে থাকা সম্ভব নয়। আবার রুমির দায়িত্ব যখন নিয়েই ফেলেছেন, হুট করে তা ফেলে চলেও যাওয়া যায় না। তিনি স্থির করলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রুমিকে শোধরানোর কাজটা তাঁকে শেষ করতে হবে। কিন্তু কীভাবে? রুমি যে ধরনের একরোখা মেয়ে তাতে তাকে খুব সহজে পালটানো যাবে বলে মনে হয় না, যদি না খারাপ সঙ্গে মেশাটা তার বন্ধ করা যায়। ইউনিভার্সিটি ছাড়া বাইরে তার ছোটাছুটিটা থামানো প্রয়োজন। সে জন্য ড্রাগ-অ্যাডিক্ট, বাজে, বদমাশ ছোকরাগুলোকে শায়েস্তা করতে হবে। একবার ওদের কাছ থেকে রুমিকে সরিয়ে আনতে পারলে সমস্যার অনেকটাই কেটে যাবে। তারপর ওর যত জমানো ক্ষোভ, দুঃখ বা অভিমান ধীরে ধীরে জুড়িয়ে ফেলা অসম্ভব হবে না।

প্রণবেশ ভেবে রেখেছিলেন কলকাতায় এসে অনুবাধা, রুমি আর দু-একটা অফিস ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে যোগাযোগ করবেন না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে অসময়ে তাঁর এখানে ছুটে আসা, গোপনে তা সেরে নিঃশব্দে বম্বে ফিরে যাবেন। কিন্তু সেটা বুঝিবা আর সম্ভব হল না। শয়তান ছোকরাগুলো সহজে রুমিকে ছাড়বে না. তাদের কাছ থেকে ওকে সরাতে হলে পুলিশের সাহায্য চাই। লালবাজারে তাঁর একজন বন্ধু বড় অফিসার। নাম শুভঙ্কর ব্যানার্জি। প্রণবেশ কলকাতায় এলেই অন্য সব আত্মীয়স্বজনের মতো তিনিও এ বাড়িতে ছুটে আসেন। একদিন ওঁদের কোয়ার্টারে গিয়ে প্রণবেশকে লাঞ্চ বা ডিনার খেয়ে আসতে হয়।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত লালবাজারে শুভঙ্করকে ফোন করলেন প্রণবেশ। তাঁকে পাওয়াও গেল।

রীতিমত অবাক হয়ে শুভঙ্কর প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন, 'আরে তুই! কোত্থেকে ফোন করছিস—বম্বে?'

প্রণবেশ বলেন, 'না, কেয়াতলা থেকে।'

'আশ্চর্য, এ সময়ে তো তুই কলকাতায় আসিস না। কবে এলি?'

'দিন চারেক হল।'

'স্ট্রেঞ্জ! চারদিন তুই কলকাতায় আছিস, আর আজ আমাকে ফোন করার কথা মনে হল?'

একটু চুপ করে থাকেন প্রণবেশ। তারপর বলেন, 'অনুরাধার ফোন পেয়ে একটা জরুরি কাজে হঠাৎ আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। ভেবেছিলাম, গোপনে কাজটা সেরে বম্বে ফিরে যাব। কিন্তু—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে শুভঙ্কর বলে ওঠেন, 'অনুরাধা—অনুরাধা—মানে তোর আগের বউ?'

'হ্যাঁ।'

প্রথমটা চমকে ওঠেন শুভঙ্কর। তারপর বেশ মজার গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'কী ব্যাপার রে, ওল্ড ফ্লেম অর্থাৎ পুরাতনী শিখা আবার নতুন করে জ্বলে উঠল নাকি?'

মুখ লাল হয়ে ওঠে প্রণবেশের। বিব্রতভাবে তিনি বলেন, 'যা, কী যে বলিস! আই অ্যাম আ ম্যারেড ম্যান নাউ। এই স্ত্রীর ছেলেমেয়ে হয়েছে। আর বয়েসও তো কম হল না—'

আগের মতোই রগড়ের ভঙ্গিতে শুভঙ্কর বলেন, 'প্রেম কি আর বয়েস ফয়েস মানে? প্রাক্তন পুরনো স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া চালানোর মতো দারুণ ব্যাপার তোর মতো ক'জনের হয় জানি না। রিয়েলি তুই ভাগ্যবান। গাছেরও খাচ্ছিস, তলারও—'

এবার প্রায় ধমকে ওঠেন প্রণবেশ, 'আমার সব কথা শুনবি, না ইয়ার্কি মেবে যাবি?'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে থতিয়ে যান শুভঙ্কর। বলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধরে নিচ্ছি পুরনো স্ত্রীর প্রতি তোর এতটুকু উইকনেস নেই। তুই একবারে বিশুদ্ধ তুলসীপাতা। কী বলবি বল—'

'প্রথমে আমি যে কলকাতায় এসেছি সে খবরটা অন্য বন্ধুবান্ধব বা আমার আত্মীয়স্বজন যাদের তুই চিনিস, কাউকেই দিবি না।'

'অল রাইট, দেব না।'

'প্রমিস?'

'প্রমিস।'

'এবার শোন অনুরাধা কেন আমাকে ডেকে এনেছে।'

কলকাতায় আসার কারণটা শুভঙ্করকে জানিয়ে দিয়ে প্রণবেশ বলেন, 'এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস, ব্যাপারটা ভীষণ সিরিয়াস। মেয়েটাকে যেভাবেই হোক ফেরানো দরকার।'

শুভঙ্কর যেন চমকে ওঠেন। বলেন, 'সত্যিই সিরিয়াস কেস। ডিভোর্স টিভোর্সের মতো ব্যাপারগুলো ছেলেমেয়েদের যে কত ক্ষতি করে দেয়—' তাঁর কণ্ঠস্বরে খানিক আগের সেই হালকা মজার সুরটা নেই। একটু ভেবে বলেন, 'এ নিয়ে আমি

কি কিছু করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। তোর হেল্প খুব দরকার। সেই জন্যেই ফোন করেছি।'

'বল কী করতে হবে—'

'আমি নিজে ওই ছোকরাগুলোর সঙ্গে আগে কথা বলব। রুমির সঙ্গে যাতে মেলামেশাটা বন্ধ করে, সেটা বোঝাতে চেষ্টা করব। কাজ না হলে তোকে ইন্টারফেয়ার করতে হবে।'

'তুই ছোকরাদের নাম বলেছিস। ওদের ঠিকানাগুলো জানিস?'

'জানি। অনুরাধা দিয়েছে।'

'বলে যা। আমি টুকে নিচ্ছি। লালবাজারে এনে স্লাইট রগড়ানি দিলে স্রেফ পেচ্ছাপ করে ফেলবে। একদিনে বদমাইসি ছুটিয়ে দেবো।'

অনুরাধা গুরনামদের যে নাম, ঠিকানা আর ফোন নাম্বার দিয়েছিলেন সেগুলো একটা নোটবুকে টুকে রেখেছেন প্রণবেশ। শুভঙ্করকে সে সব জানিয়ে বললেন, 'এখনই তুই কিছু করিস না কিন্তু। আগে আমি একটু দেখে নেই।'

'ঠিক আছে, তুই বলার পর যা করার করব।'

'আরেকটা কথা—'

'কী?'

'যদি তোকে কিছু করতে হয় সব সিক্রেটলি। বাইরে জানাজানি না হয়।'

'সে তোকে বলতে হবে না। তুই ফেমাস লোক। স্ক্যান্ডালের গন্ধ পেলে মিডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে খবরটা বম্বেতে তোর নতুন বউ-এর কাছে চলে যাবে। ভীষণ এম্বারাসিং অবস্থায় পড়ে যাবি তুই। আবার যাতে উটকো প্রবলেমে জড়িয়ে না যাস, সেদিকে আমি নজর রাখব।'

কৃতজ্ঞ সুরে প্রণবেশ বলেন, 'আমাকে বাঁচালি ভাই।'

শুভঙ্কর বলেন, 'বাঁচাব তো নিশ্চয়ই। তবে আমার একটা শর্ত আছে।'

'কী শর্ত?'

'সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে বম্বে যাওয়ার আগে আমাদের এখানে একদিন এসে খাবি। নইলে মনীষা আমাকে নির্ঘাত খুন করে ফেলবে।'

মনীষা শুভঙ্করের স্ত্রী। প্রণবেশ আঁতকে ওঠেন, 'তুই কি মনীষাকে আমার আসার খবরটা দিবি?'

শুভঙ্কর হেসে হেসে বলেন, 'দিতে তো হবেই। ওর একটা ইন্সটিংকটিভ ক্ষমতা আছে। আমার মুখ দেখে কার সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাকে কী বললাম, সব টের পেয়ে যায়।'

'ইয়ার্কি মারার জায়গা পাও না। তুই নিজেই জানিয়ে দিবি উল্লুক।'

নিপাট ভালমানুষের গলায় শুভঙ্কর বলেন, 'তুই নিজেই বল স্ত্রীর কাছে কিছু লুকিয়ে রাখা কি ভাল?'

প্রণবেশ চমকে ওঠেন। কিছু ভেবে কথাগুলো বলেনি শুভঙ্কর, এর ভেতর কোনও রকম ইঙ্গিত বা খোঁচাও ছিল না। তবু ভেতরে ভেতরে একটা ধাক্কা লাগে। শুভঙ্কর স্ত্রীর কাছে কিছুই গোপন রাখতে চান না। ওঁদের সম্পর্কটা খুবই স্বচ্ছ আর পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আর প্রণবেশ কিনা অমলাকে ঘুণাক্ষরেও কিছু না জানিয়ে কলকাতায় চলে এসেছেন। এই গোপনতা কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে থাকা উচিত? প্রশ্নটা আগেব অনেক বারের মতো এবারও তাঁর সামনে বিরাট আকারে দেখা দেয়। অবশ্য নিজের তৈরি কৈফিয়ৎটি মজুদই আছে। স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা তিনি করছেন না। সন্তানের কল্যাণের জন্য কোনও কিছুই অপরাধ নয়।

প্রণবেশ চিন্তিতভাবে বলেন, 'কিন্তু আমার কথা মনীষা যদি কাউকে বলে ফেলে?'

শুভঙ্কর বলেন, 'ইমপসিবল। আমার মুখ ফসকে তবু কিছু বেরুতে পারে কিন্তু ও না চাইলে ওব পেট থেকে কথা বার করতে পারে, পৃথিবীতে এমন কেউ এখনও জন্মায়নি।'

প্রণবেশ ভেবেছিলেন আজ আর কাজ টাজ করবেন না। কিন্তু শুভঙ্করকে ফোন কবাব পর খুব সম্ভব নিজেব অজান্তেই জুহুর হোটেল কমপ্লেক্সের ড্রয়িংটা টেনে নিয়ে আঁকতে শুরু করেছিলেন। তারপর আর কোনও দিকে লক্ষ্য ছিল না তাঁর। এর মধ্যে দু'বার কফি দিয়ে গেছে সন্তোষ। বম্বে থেকে অমলাও অন্য দিনের মতো ফোন করেছেন। রোজ তাঁর সঙ্গে যে ধরনের কথাবার্তা হয় আজও তাই হয়েছে। বম্বের অফিসের কাজ যান্ত্রিক নিয়মে চলছে, ছেলেমেয়েরা ভাল আছে, ইত্যাদি।

সাড়ে আটটায় অনুরাধা ফোন কবলেন। চাপা গলায় বললেন, 'বিকেলে তুমি বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে যাওয়ার পর রুমি আর বেরোয় নি।'

একটু অবাক হয়েই প্রণবেশ জিজ্ঞেস করেন, 'আমি যে তোমাদের বাড়ির কাছে এসেছিলাম, তুমি জানলে কী করে? রুমি বলছে?'

'না।'

'তাহলে?'

'নিজের চোখে দেখলাম তো। আমি তখন দোতলায় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

প্রণবেশ বললেন, 'ও।' রুমি তো বটেই. তাঁর জন্যও অনুরাধা অপেক্ষা করছিলেন কিনা সেটা আর জিজ্ঞেস করা হয় না।

একটু চুপচাপ।

তারপর প্রণবেশ ফের বলেন, 'আজ রুমি চেঁচামেচি রাগারাগি কিছু করেছে?'

অনুরাধা বলেন, 'না। নিজের ঘরে গুম মেরে বসে ছিল। তবে—'

'কী?'

'কিছুক্ষণ আগে গলা নামিয়ে কাকে যেন ফোন করেছে। একবার গুরনামের নামটা বোধহয় শুনলাম।'

'তুমি ওকে কিছু বলেছ?'

'না।'

প্রণবেশ বলেন, 'ঠিক আছে।'

অনুরাধা ভয়ে ভয়ে এবার জিজ্ঞেস করেন, 'রুমির সঙ্গে অনেকক্ষণ তো ছিলে। কী মনে হল—ওকে শোধরানো যাবে?'

প্রণবেশ বলেন, 'ওয়ার্ল্ডে ইমপসিবল বলে কিছু নেই। তবে বেয়াড়া ঘোড়াকে বাগে আনতে খানিকটা সময় তো লাগবেই। এ নিয়ে তুমি বেশি চিন্তা টিন্তা করো না।' আজ রুমিকে সঙ্গে করে এয়ার-কন্ডিশানড মার্কেটে গিয়ে যে সালোয়ার-কামিজ, জিনস, কসমেটিকস বা দামী হার টার কিনেছিলেন আর সেগুলো যে রুমি নেয় নি সেটা জানাতে গিয়েও জানালেন না।

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় অনুরাধা বলেন, 'কাল আর পরশু তুমি ইউনিভার্সিটিতে যেও না। দু'দিন রুমিদের ছুটি আছে।'

প্রণবেশ বলেন, 'ঠিক আছে তবে ও যদি বাড়ি থেকে এই দু'দিন বেরোয় আমাকে তক্ষুনি ফোন করো। আর কোথায় যাবে সেটা জানতে চেষ্টা করবে।'

'আচ্ছা।'

প্রণবেশ বললেন, 'এবার তা হলে ছাড়ি?'

অনুরোধ বলেন, 'না।'

'আর কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ।' বলেও অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন অনুরাধা।

অপেক্ষা করার পর প্রণবেশ বলেন, 'কী হল—বল—'

অনুরাধা বলেন, 'তুমি আমাদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত রুমিকে নিয়ে এলে—'

প্রণবেশ বললেন, 'কালও তো এসেছিলাম।'

'কাল আমি সেই সময়টা অফিসে ছিলাম।' অনুরাধা বলতে থাকেন, 'আজ

ভেবেছিলাম—ভেবেছিলাম—' বলতে বলতে থেমে গেলেন।

খুবই কৌতূহল বোধ করছিলেন প্রণবেশ। বললেন, 'কী ভেবেছিলে অনু?'

গলার স্বর অনেক নামিয়ে দ্বিধান্বিতভাবে অনুরাধা বলেন, 'তুমি বাড়ির ভেতরে আসবে।'

উত্তর দিতে একটু সময় লাগে প্রণবেশের। তার মধ্যেই লাইনটা ছেড়ে দিয়েছেন অনুরাধা।

।। নয় ।।

এরপর দুটো দিন কেয়াতলার বাড়ি থেকে বেরুলেন না প্রণবেশ। জুহুর হোটেল কমপ্লেক্সের নক্শাটা নিয়েই মগ্ন হয়ে রইলেন। তার ফাঁকে ফাঁকে বম্বে থেকে রুটিন অনুযায়ী ফোন আসতে লাগল। অনুরাধাও বার তিনেক করে ফোনে কথা বললেন। মোটামুটি তিনি খানিকটা টেনসন-মুক্ত। রুমি বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে না, তবে এন্তার একে তাকে ফোন করে যাচ্ছে। প্রণবেশ বলেছেন, যত ইচ্ছা ফোন করুক। লেখাপড়ার ব্যাপার ছাড়া বাড়ি থেকে না বেরুলেই ভাল।

এর মধ্যে প্রাক্তন এবং এখনকার দুই স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথন এবং জুহুর হোটেলের নক্শা ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকে প্রণবেশ এখানকার দু-একটা অফিসে ফোন করে কাজের কিছু কথা বলেছেন। একটা বিরাট রিয়েল এস্টেট কোম্পানি যারা ইস্ট ক্যালকাটায় বিশাল হাউসিং কমপ্লেক্স করতে চায়, দিন দুই পরে তাদের অফিসে প্রণবেশকে ডেকেছে। ওদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাঁর সঙ্গে এই কমপ্লেক্সটার নক্শার বিষয়ে আলোচনা করতে চান। ওঁদের ইচ্ছা সেদিনই তিনি সাইটটা দেখে আসেন। দু দিন পর রুমির ইউনিভার্সিটি খুলে যাবে। সেখানে প্রণবেশকে যেতেই হবে। তাই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা দশটায় রাখলেন। ওখানকার কাজ সেরে একটা নাগাদ ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছে যাবেন। তখন গেলেও রুমিকে ধরে ফেলতে পারবেন।

মাঝখানের এই দুটো দিন মোটামুটি নির্বিঘ্নেই কেটে গেছে। দুশ্চিন্তা বা মানসিক চাপ বাড়তে পারে এমন বড় রকমের কোনও ঘটনাই ঘটে নি।

দু'দিন পর আজ বাড়ি থেকে বেরুলেন প্রণবেশ। সেই রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, যার নাম 'নিউ হরাইজন প্রোপার্টিজ', সেটার হেড কোয়ার্টার ক্যামাক স্ট্রিটের ষোলতলা একটা বাড়ির সাতটা ফ্লোর জুড়ে। কাঁটায় কাঁটায় দশটায় সেখানে পৌঁছে গেলেন তিনি। সবারই সময় যথেষ্ট মূল্যবান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর গর্গ সাহেবের সঙ্গে আলোচনার টেবলে বসে যান প্রণবেশ। গর্গ সাহেব ছাড়াও

কোম্পানির আরও দু'জন ডিরেক্টর, জেনারেল ম্যানেজার, কনস্ট্রাকশন উইং-এর চিফ ইঞ্জিনিয়ারও এই মিটিংয়ে হাজির আছেন।

গর্গ সাহেবের বয়স ষাট পেরিয়েছে। টকটকে রং। দারুণ সুপুরুষ। পরনে নিখুঁত সাফারি স্যুট। চুল বেশির ভাগটাই সাদা হয়ে গেছে। সেই চুল চমৎকার ব্যাক ব্রাশ করা। চেহারায় গাম্ভীর্য এবং মর্যাদাবোধের ছাপ থাকলেও তিনি খুবই বিনয়ী। কফি, কেক, সন্দেশ আর কাজু বাদাম দিয়ে আপ্যায়নের ফাঁকে বললেন, 'আপনি ফেমাস আর্কিটেক্ট, সারা দেশ আপনার নাম জানে। আমাদের কোম্পানির ইচ্ছা, আপনার তৈরি মডেলে আমাদের একটা হাউসিং কমপ্লেক্স কলকাতায় হোক।'

গর্গ সাহেবের কণ্ঠস্বর মৃদু হলেও বেশ ভরাট। তাঁর সৌজন্যবোধে খুশি হলেন প্রণবেশ। বিনীতভাবে বললেন, 'আপনাদের কাজটা করতে পারলে পার্সোনালি আই উড ফিল প্রিভিলেজড।'

'সেটা আমরাও বলতে পারি।'

'ধন্যবাদ।'

'এবার তা হলে কাজের ব্যাপারটা ডিটেলে আমরা ডিসকাস করতে পারি।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

গর্গ সাহেব জানালেন ইস্ট ক্যালকাটায় নতুন যে মেগাপলিস হতে চলেছে তার গায়ে 'নিউ হরাইজন প্রোপার্টিজ'-এর পঞ্চাশ একর জমি রয়েছে। সেখানে তাঁরা একটা টাউনশিপ গড়ে তুলতে চান। টাউনশিপটার দুটো অংশ। একদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতার কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু বাড়ি তৈরি হবে। আরেক দিকের টার্গেট হল হাই ইনকাম গ্রুপ। কলকাতায় যে অবিশ্বাস্য দ্রুত হারে মানুষ বাড়ছে, সেই অনুপাতে জায়গা কম, তাই স্কাই ইজ দা লিমিট। হাই-রাইজ ছাড়া বাসস্থান সমস্যার সমাধানের কোনও উপায় নেই। গর্গ সাহেবরা যে টাউনশিপের পরিকল্পনা করেছেন সেখানে থাকবে কুড়িটা মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিং। এ ছাড়া প্লাজা, ব্যাঙ্ক, সুইমিং পুল, পার্ক, নিজস্ব জেনারেটর, হেলথ সেন্টার, পোস্ট অফিস, কমিউনিটি হল, ছোট স্টেডিয়াম, ইত্যাদি। তবে ফাঁকা জায়গা থাকবে বেশি, সেখানে থাকবে প্রচুর গাছপালা, লতা, নানা ধরনের অর্কিড। সবরকম দূষণমুক্ত, চোখজুড়ানো শ্যামলিমার মধ্যে এই টাউনশিপ হবে একটা মডেল শহর।

গর্গ সাহেবকে নানা খুঁটিনাটি তথ্য জুগিয়ে সাহায্য করতে লাগলেন কোম্পানির অন্য দুই ডিরেক্টর—হরিকিষণ গোয়েঙ্কা আর জগদীশ পাটনিয়া এবং ওঁদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার সুশোভন ব্যানার্জি। শুধু তাই নয়, যে জায়গাটায় কমপ্লেক্স গড়ে উঠবে সেখানকার একটা ম্যাপও প্রণবেশকে দেখানো হল।

প্রণবেশ বললেন, 'ম্যাপ থেকে ক্লিয়ার কোনও ধারণা করা যাবে না। সাইটে যাওয়া দরকার।'

গর্গ সাহেব বললেন, 'সে কথা তো আমরা আগেই আপনাকে জানিয়েছি। আজই মিস্টার ব্যানার্জি আপনাকে সাইটটা দেখিয়ে আনবেন। মোটামুটি আমাদের প্রাথমিক কথা হয়েই গেছে, আপনার অসুবিধে না হলে এখনই বেরিয়ে পড়তে পারেন।'

রুমির চিন্তাটা প্রণবেশের মাথায় ছিল। দ্রুত তিনি ঘড়ি দেখলেন, এখন এগারটা বেজে সাতচল্লিশ। জিজ্ঞেস করেন, 'সাইটটা এখান থেকে কত দূরে?'

'কুড়ি কিলোমিটারের মতো—'

প্রণবেশ মনে মনে সময়ের হিসেব করে নিলেন। যেতে আসতে কুড়ি কুড়ি মোট চল্লিশ কিলোমিটার, তার ওপর ঘুরে ঘুরে পঞ্চাশ একরের বিশাল সাইট দেখা। এতে কম করে ঘন্টা তিনেক লেগে যাবে। সব মিলিয়ে তিনটের আগে ফিরে আসা সম্ভব হবে না। অথচ একটায় তাঁকে রুমির ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছুতে হবে। এই হাউসিং কমপ্লেক্সের কাজটার চেয়ে এই মুহূর্তে সেটা কম জরুরি নয়।

প্রণবেশ বললেন, 'ক্ষমা করবেন। আজ আমার অন্য একটা আর্জেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমি এখন বেশ কয়েক দিন কলকাতায় আছি। নেক্সট উইকে আপনাদের সাইটটা দেখে আসব।'

'বেশ। তাই হবে।'

'আরেকটা কথা—'

'বলুন।'

'আপনাদের হাউসিং কমপ্লেক্সের নক্‌শাটা কবে দিতে হবে?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ল্যান্ড ডেভলপমেন্ট হয়ে গেছে। বহু টাকা ইনভেস্ট করে ফেলেছি। বুঝতেই পারছেন কমপ্লেক্স তৈরি করতে যত দেরি হবে আর্থিক দিক থেকে ততই আমাদের ক্ষতি।'

একটু চিন্তা করে প্রণবেশ বলেন, 'আমার হাতে অনেকগুলো কাজ রয়েছে। সেগুলো শেষ করতে অনেক সময় লেগে যাবে। তবু তার মধ্যে আপনাদের ডিজাইনটা করব। মাস ছয়েক সময় পাওয়া গেলে ভাল হয়।'

গর্গ সাহেব বলেন, 'ডিজাইন পাওয়ার পর যদি নেসেসারি কোনও চেঞ্জ করতে হয় সেটা করা, তারপর কর্পোরেশন থেকে প্ল্যান স্যাংসান করানো—এমনি অনেক কাজ রয়েছে। এসব করতে করতে মিনিমাম বছর খানেক লেগে যাবে। তাই চাইছিলাম অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল ডিজাইনটা করে ফেলা –'

'আপনাদের কথা আমার মনে থাকবে।'

গর্গ সাহেবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচে এসে গাড়িতে উঠতে যাবেন, কে যেন ডেকে ওঠে, 'ফুলদা—ফুলদা'—'

চকিতে প্রণবেশ এধারে ওধারে তাকাতেই রাস্তার ওদিকের ফুটপাথে অরুণাভকে দেখতে পান। অরুণাভ সম্পর্কে তাঁর ভগ্নিপতি। তাঁর ছোটমামার মেজ মেয়ে ডলির সঙ্গে বছর চারেক আগে ওর বিয়ে হয়েছে। বয়স চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ, মাঝারি হাইটের স্বাস্থ্যবান শ্যামবর্ণ ছেলেটি খুব হাসিখুশি, আমুদে। প্রণবেশের বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে। কলকাতায় আসার পর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিত লোকজনদের যখন তিনি এড়াতে চাইছেন তখন ভরদুপুরে অরুণাভ এই ক্যামাক স্ট্রিটে কোত্থেকে যে মাটি ফুঁড়ে উঠে এল, কে জানে।

প্রণবেশ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। অরুণাভ তাঁকে আচমকা দেখতে পেয়ে যতটা অবাক, তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি। এক দৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে এপারে চলে আসে। বলে, 'ফুলদা, আপনি এখানে!' খুড়তুতো জেঠতুতো, মামাতো ইত্যাদি ছোট ভাইবোনেরা প্রণবেশকে এই নামেই ডেকে থাকে। ওদের সুবাদে ওদের স্ত্রী বা স্বামীরাও তাই ডাকে।

প্রণবেশ এতটাই হকচকিয়ে গিয়েছিলেন যে উত্তর দিতে খানিকটা সময় লাগে। তারপর দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে হেসে বলেন, 'হ্যাঁ, একটা আর্জেন্ট কাজে হঠাৎ কলকাতায় আসতে হল।' নিউ হরাইজন প্রোপার্টিজ-এর বাড়িটা দেখিয়ে বলেন, 'এই অফিসে দরকার ছিল। তারপর বল কেমন আছ?'

'ভাল।'

'ডলি?'

'মাঝখানে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। নার্সিং হোমে দিন পনের ওকে থাকতে হয়েছে। এখন ঠিক আছে।'

খুব বেশি কথা বাড়াতে চাইছিলেন না প্রণবেশ। প্রথমত এখন হাতে যথেষ্ট সময় নেই। তাছাড়া অরুণাভর কোন প্রশ্নের কী জবাব দেবেন, তাতে হয়তো সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠবে। উচিত ছিল ডলির কী ধরনের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, নার্সিং হোমে ক'দিন সে থেকেছে, আঘাত পেয়ে থাকলে সেটা কতখানি মারাত্মক—ইত্যাদি ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া। কিন্তু প্রণবেশ কোনও প্রশ্নই করলেন না।

অরুণাভ ফের বলে, 'আপনাকে এখানে দেখব ভাবতে পারি নি।' তারপর খানিক দূরে একটা রাস্তা দেখিয়ে বলে, 'ওখানে, মোড় ঘুরলেই আমার অফিস। প্লিজ একটু দাঁড়ান ফুলদা। আমি ডিপার্টমেন্টাল হেডকে বলে হাফ-ডে ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে

আসি।'

তার উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার। বুঝতে পেরেও প্রণবেশ জিজ্ঞেস করেন, 'ছুটি নেবে কেন?'

'বা রে, কতদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা হেল। আপনাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ডলিকে দারুণ একটা সারপ্রাইজ দেব।'

'আমি তো তোমার সঙ্গে এখন যেতে পারব না ভাই।'

'কেন?'

অরুণাভর সঙ্গে কথা বলতে বলতে অদৃশ্য কোনও কম্পিউটারের মতো প্রণবেশের মস্তিষ্কে চিন্তার কাজ চলছিল। অরুণাভ যখন তাঁকে দেখে ফেলেছে তখন ডলির কানে খবরটা পৌঁছে যাবে। ডলির আবার পেটে কোনও কথা থাকে না। ফলে আজ সন্ধের মধ্যে সারা কলকাতার সমস্ত আত্মীয়স্বজন জেনে যাবে তিনি কলকাতায় এসেছেন। অরুণাভকে বলাও চলবে না তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথাটা যেন চারদিকে চাউর হয়ে না যায়। বললে তার কৌতূহল হাজার গুণ বেড়ে যাবে। তাই এখন যেটা দরকার তা হল কৌশল। খুব সতর্কভাবে অরুণাভকে এড়িয়ে যেতে হবে।

প্রণবেশ বলেন, 'তোমার সঙ্গে যেতে পারলে খুব ভাল লাগত। অনেকদিন ডলিকে দেখি না। কিন্তু আজই বিকেলের ফ্লাইটে আমাকে বম্বে ফিরে যেতে হচ্ছে।'

অরুণাভকে একটু হতাশই দেখায়। সে বলে, 'আজই চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ। বললাম না একটা বিশেষ জরুরি কাজে কলকাতায এসেছিলাম। সেটা এইমাত্র শেষ কবলাম। মাস দুই বাদে আবাব তো আসছি, তখন অবশ্যই তোমাদেব বাড়ি যাব।'

'কথা দিলেন কিন্তু--'

'নিশ্চযই।'

'তখন কিন্তু বলতে পারবেন না, ভীষণ ব্যস্ত ভাই, এবারটা থাক। তা হলে ভীষণ দুঃখ পাব।'

'আরে না না, কথা যখন দিয়েছি তখন যাবই। ডলিকে বলে দিও কিছু যেন মনে না করে। প্লিজ—' বলে প্রণবেশ একবার ভাবলেন, তিনি সত্যি সত্যিই বম্বে চলে গেছেন কিনা জানার জন্য অরুণাভরা যদি কেয়াতলায় ফোন করে বসে কিংবা ওখানে গিয়ে হাজির হয় তা হলে তিনি স্রেফ অথৈ জলে ডুবে যাবেন। অরুণাভ আর সময় পেল না, ঠিক এখনই অফিস থেকে বেরিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটে আসার কী দরকার ছিল তার? তিনি বলতে যাচ্ছিলেন সে বা ডলি যেন কেয়াতলায় ফোন না করে, করলে তাকে পাবে না, কিন্তু তক্ষুনি খেয়াল হল আগ বাড়িয়ে এসব বলতে গেলে ওদের

সন্দেহ হবে। তাই এই ব্যাপারটা আর নাড়াচাড়া না করাই ভাল। তারপরও যদি অরুণাভ আর ডলি কেয়াতলায় হানা দেয় তখন দেখা যাবে। আত্মরক্ষার জন্য একটা বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ত নিশ্চয়ই তৈরি করতে পারবেন।

প্রণবেশ বললেন, 'চলি অরুণাভ। বাড়ি ফিরে জিনিসপত্র গোছগাছ করে এয়ারপোর্টে দৌড়ুতে হবে।'

অরুণাভ বলে, 'আচ্ছা—'

ক্যামাক স্ট্রিট থেকে সোজা ইউনিভার্সিটিতে চলে এলেন প্রণবেশ। তেতলায় হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে এখন অফ-পিরিয়ড চলছে। ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, রুমি আসে নি। দুটো পিরিয়ড এর ভেতর হয়ে গেছে। আধ ঘন্টা পর আরেকটা শুরু হবে। সেটাই আজকের শেষ ক্লাস। রুমি শেষের ক্লাসটা করার জন্য আসবে কিনা কেউ বলতে পারল না।

তবু আধ ঘন্টা অপেক্ষা করলেন প্রণবেশ। শেষ ক্লাসটা বসার পরও যখন রুমি এল না তখন সোজা কেয়াতলায় ফিরে এলেন।

দুটো বেজে গিয়েছিল। খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড। সন্তোষকে খেতে দিতে বলে প্রণবেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কেউ ফোন টোন করেছিল?'

সন্তোষ জানালো, একজন মহিলা বার তিনেক ফোনে প্রণবেশকে চেয়েছিলেন।

প্রণবেশ বলেন, 'কে, বৌদি?'

'বোম্বাই-এর বৌদির গলা আমি চিনি না? তিনি নয়। এই মেয়েছেলেটাকে বার বার শুধোলাম, নাম বললে না।' সন্তোষের কথাবার্তায় অনেক নাগরিক পালিশ পড়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে দু-একটা গেঁয়ো শব্দ তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। যেমন এই মুহূর্তে মহিলার বদলে 'মেয়েছেলে' বলল।

প্রণবেশ আন্দাজ করলেন, অনুরাধাই এই তিনবার ফোন করেছেন। তিনি কলকাতায় আসার পর অনুরাধা রোজই ফোন করেন। প্রতিবার তিনিই ওটা ধরেছেন। একবার কি সন্তোষ ধরেছিল? প্রণবেশ মনে করতে পারলেন না। সন্তোষ ধরে থাকলে অনুরাধার কণ্ঠস্বর তার মনে নেই।

প্রণবেশ বললেন, 'ঠিক আছে।'

সন্তোষ হল-ঘরের টেবলে ভাত মাছ ডাল তরতারি সাজিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল একধারে। প্রণবেশের আর যদি কিছু দরকার হয় সেজন্য সে এভাবে রোজই অপেক্ষা করে।

প্রণবেশ হাতমুখ ধুয়ে খেতে শুরু করেন। খাওয়া যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় অনুরাধার ফোন এল। নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি

আগেও ফোন করেছিলে?'

অনুরাধা বলেন, 'তিন বার। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

ক্যামাক স্ট্রিটের জরুরি মিটিং সেরে রুমির জন্য ইউনিভার্সিটিতে প্রায় পৌনে দু'ঘণ্টা বসে ছিলেন, এ সব জানিয়ে প্রণবেশ বলেন, 'কী ব্যাপার, রুমিকে আজ ইউনিভার্সিটিতে দেখলাম না তো।'

'সেটা বলার জন্যে তোমাকে বার বার ফোন করেছি। ও আজ বাড়ি থেকে বেরোয় নি।'

'কেন, শরীর খারাপ নাকি?'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল ঠিক আছে, কিছুই হয়নি। ইউনিভার্সিটিতে গেলি না কেন জানতে চাইলে খেপে উঠল। বলল, ফেউয়ের মতো একটা লোককে পেছনে লাগিযে রেখেছ। গেলেই চোখে পড়ে গেটের কাছে গাড়ির ভেতর বসে নজর রাখছে। সারাক্ষণ যেখানে একজন পাহারাদার থাকছে সেখানে যেতে ইচ্ছে করে? তোমরা ভেবেছ কী?'

রেগে উঠতে গিয়েও হেসে ফেলেন প্রণবেশ। বলেন, 'আমার জন্যেই তা হলে ইউনিভার্সিটি যায় নি?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'আমি যতদিন কলকাতায় আছি ও কি ক্লাস করবে না?'

'রাগটা পডলে করবে। কতক্ষণ আর বাড়িতে বসে থাকবে?'

একটু ভেবে প্রণবেশ জিজ্ঞেস করেন, 'রুমি এখন কী করছে?'

অনুরাধা বললেন, 'ওর ঘরে বসে মিউজিক সিস্টেমে পপ গান শুনছে।'

'শুনুক।'

'এখন ছাড়ছি—'

কী মনে পড়তে ভীষণ ব্যস্তভাবে প্রণবেশ বলে, 'ওয়েট ওযেট, এক মিনিট। আজ একটা দারুণ ব্যাপার হয়েছে।'

'কী ব্যাপার?' অনুবাধার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল তিনি রীতিমত কৌতূহলী হযে উঠেছেন।

অরুণাভর সঙ্গে আচমকা দেখা হওয়ার কথা জানিয়ে প্রণবেশ বললেন, 'ভীষণ বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম—' বলে হাসতে লাগলেন।

অনুরাধাও হেসে হেসে বললেন, 'যাক, বিপদটা যে কেটে গেছে তাই যথেষ্ট।'

'পুরোপুরি যে কেটেছে তা এক্ষুনি বলা যাচ্ছে না। ক'দিন খুব সাবধানে থাকতে হবে।'

।। দশ ।।

খাওয়া দাওয়ার পর আজ আর শুলেন না প্রণবেশ। টেবলের পেছন দিকে রিভলভিং চেয়ারে বসে মাথাটা পছনে হেলিয়ে চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর জুহুর হোটেল কমপ্লেক্সের ড্রইংটা নিয়ে বসলেন। রুমির মতো ওটাও তাঁর মাথায় ফিক্সেশানের মতো আটকে আছে। এই কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই।

কাজের ফাঁকে কখন সন্ধে নেমে গেছে, কখন সন্তোষ লাইট জ্বালিয়ে বার কয়েক কফি টফি দিয়েছে এবং দৈনন্দিন কর্মসূচি অনুযায়ী বম্বে থেকে অমলার ফোন এসেছে এবং তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন, প্রণবেশের খেয়াল ছিল না।

এর মধ্যে অনুরাধার সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নি। আবছাভাবে প্রণবেশের মনে হচ্ছিল, যাক, রুমির সমস্যাটার তা হলে সুরাহা হতে শুরু করেছে। সে যখন তিনটে দিন বাড়ি থেকে বেরোয় নি তখন আশা করা যায় ক্রমশ বশ মানবে। তার উগ্র বেপরোয়া ভাবটা ধীরে ধীরে কেটে যাবে।

কিন্তু ঠিক আটটায় আবার অনুরাধার ফোন এল। আতঙ্কগ্রস্তের মতো তিনি বললেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে। গুরনামরা গাড়ি নিয়ে এসেছিল খানিক আগে। রুমি যেতে চায় নি কিন্তু ওরা জোর করে নিয়ে গেল। আমি আটকানোর চেষ্টা করেছিলাম, পারি নি।'

এরকম একটা খারাপ খবরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না প্রণবেশ। ভয়ানক চমকে ওঠেন তিনি। রুদ্ধশ্বাসে বলেন, 'কী বলছ তুমি!'

'তুমি ওকে বারণ করার পর খুব চোটপাট করত ঠিকই কিন্তু ভেতরে ভেতরে বোধ হয় খানিকটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মাঝখানে দু'দিন ওকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিলে। ওই বদ ছোকরাগুলো ফোন করত, তবু ও বেরোয় নি। কিন্তু আজ—' বলতে বলতে কান্নায় প্রায় ভেঙে পড়েন অনুরাধা।

প্রণবেশেরও ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। কিন্তু সেটা টের পেলে অনুরাধা আরও ঘাবড়ে যাবেন। তাঁকে ভরসা দেওয়ার জন্য বললেন, 'কেঁদো না অনু, আমি দেখছি ব্যাপারটা।'

দুর্ভাবনার মধ্যেও মাথায় আগুন ধরে গিয়েছিল প্রণবেশের। ছোকরাগুলোর এত স্পর্ধা, এত সাহস যে রুমিকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়! লাইন কেটে দিয়ে লালবাজারে শুভঙ্করকে ফোন করলেন তিনি, 'ভাই, আবার তোকে বিরক্ত করছি।'

শুভঙ্কর বলেন, 'বিরক্ত আবার কী? কী হয়েছে বল—'

অনুরাধার কাছে যা শুনেছেন সব জানিয়ে দিয়ে প্রণবেশ বলেন, 'বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটা ফ্ল্যাটে ওই স্কাউড্রেলগুলো হুল্লোড় করে। আমি সেই ঠিকানাটা জানি। প্রথমে আমি ওই পাঞ্জাবি ছোকরাটার বাড়ি যাব। মনে হচ্ছে, বাড়ির লোকেদের প্রেট করলে ওরা কোথায় আছে জানা যাবে। না পাওয়া গেলে এক এক করে অন্য হারামজাদাগুলোর বাড়ি যাব। যেভাবে হোক, রুমিকে খুঁজে বার করতেই হবে।'

'নিশ্চয়ই। তুই আমাকে ছোকরাগুলোর বাড়ির অ্যাড্রেস আর ফোন নাম্বার দিয়েছিস। আমিও ফোন করে দেখি। পুলিশের হুমকিতে আশা করি কাজ হবে। না হলে প্রত্যেকটা বাড়িতে পুলিশ-ভ্যান পাঠিয়ে ওদের বাবাদের তুলে আনব।'

'সে তুই যা ভাল বুঝিস, করিস। আমিও ওদের খবর পেলে ফোন করে তোকে জানিয়ে দেব।'

'আচ্ছা—'

'আরেকটা কথা—'

'বল—'

'মনে আছে তো যা কিছু করার গোপনে করতে হবে।'

'নিশ্চিন্ত থাক। রুমির নামে যাতে স্ক্যান্ডাল না রটে সেটা আমি দেখব।'

ফোন নামিয়ে দ্রুত উঠে পড়েন প্রণবেশ। রাত্তিরে কখন ফিরবেন ঠিক নেই, সন্তোষকে সেটা জানিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যান।

।। এগার ।।

এলগিন রোডে বিশাল হাই-রাইজের গোটা একটা ফ্লোর নিয়ে গুরনামদের ফ্ল্যাট। কম করে চার হাজার স্কোয়ার ফিট তো হবেই। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে ওদের মোটর পার্টস আর অ্যাকসেসরিজের বিরাট ব্যবসা। কী বিপুল পরিমাণ টাকা যে ওদের সেটা ফ্ল্যাটের দামী দামী ক্যাবিনেট, পর্দা, কার্পেট, এয়ারকুলার ইত্যাদি দেখলে টের পাওয়া যায়। টিভি, স্টিরিও সিস্টেম, টেপ রেকর্ডার, ফোন বা ভিসিআর—কোনওটাই দিশি নয়—হংকং, দুবাই, ফ্রাঙ্কফুর্ট বা টোকিও থেকে আনা হয়েছে।

গুরনামের বাবা হরনাম সিংকে তাঁদের ফ্ল্যাটেই পাওয়া গেল। ষাটের কাছাকাছি বয়স। চেহারা বেশ ভারী, চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র মানুষ। নিজের পরিচয় দেওয়ার পর খবর না দিয়ে হঠাৎ এই অসময়ে আসার কারণটা জানান প্রণবেশ।

হরনাম সিং হাতজোড় করে অত্যন্ত লজ্জিতভাবে বলেন, 'ছেলেটা একেবারে

জাহান্নামে গেছে। আমাদের মান-সম্মান আর রইল না। ওর জন্যে কারও কাছে মুখ দেখাতে পারি না।'

এমন বাবার ওরকম ছেলে কী করে হয় ভেবে উঠতে পারছিলেন না প্রণবেশ। যে ক্রোধ এবং উত্তেজনা মাথায় নিয়ে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, হরনামের কথায় তা অনেকখানি জুড়িয়ে যায়। বলেন, 'বুঝতেই পারছেন, একটা মেয়ের নামে কুৎসা রটলে তার ভবিষ্যৎ কী হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই। আমাদের সোসাইটি ভীষণ ক্রুয়েল। স্ক্যান্ডাল মেয়েদের জীবন নষ্ট করে দেয়।'

'আমি আমার মেয়েকে এখনই ফেরত চাই।'

হরনাম সিং হাতজোড় করেই ছিলেন। কয়েক পলক প্রণবেশের দিকে তিনি তাকিয়ে থাকেন। তারপব বলেন, 'আপনার কি ধারণা আমার ছেলে আপনার মেয়েকে এখানে নিয়ে আসবে আর সেই ইতরামিকে আমি প্রশ্রয় দেব?'

হরনামের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে ভেতরে ভেতরে বেশ সঙ্কোচ বোধ করেন প্রণবেশ। বলেন, 'না না, তা আমি বলিনি। ব্যাপারটা ওভাবে নেবেন না। আপনার ছেলেকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে সেটাই জানতে এসেছি।'

একটু চিন্তা করে হরনাম বলেন, 'ঠিক অ্যাড্রেসটা দিতে পারব না, তবে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার অফিসটা ছাড়িয়ে অ্যাটলান্টা বলে একটা আঠারতলা বাড়ি আছে। তার ফিফথ ফ্লোরে সন্ধের পর বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে নাকি ওরা আড্ডা দেয়। এটা আমার অনুমান। তবে আমি নিজে কখনও ওখানে যাই নি।'

'ধন্যবাদ। একটা কথা পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি, আপনার ছেলের বিরুদ্ধে আমি কিন্তু কড়া স্টেপ নেবো।'

'আই উড বি এক্সট্রিমলি হ্যাপি। আপনার যা ভাল মনে হয় করুন, আমার আপত্তি নেই। ওব একটা বড় রকম ধাক্কা খাওয়া দবকার। ওর নামে কমপ্লেন শুনে শুনে আমরা পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

পয়সাওলা পরিবারের ছেলেমেয়েরা জাহান্নামে যায় তাদের মা-বাবাদের প্রশ্রয়ে। কিন্তু হরনাম সিং এদের থেকে আলাদা। কেয়াতলা থেকে বেরুবার সময় অসহ্য ক্রোধে স্নায়ুমন্ডলী যেন ছিঁড়ে পড়ছিল প্রণবেশের। ভেবেছিলেন গুরনামদের বাড়ি গিয়ে হাতের কাছে যা পাবেন ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলবেন কিন্তু আদ্যোপান্ত ভদ্রলোক এই মানুষটির সঙ্গে কথা বলে তাঁর শ্রদ্ধাই হতে থাকে।

হরনাম হাতজোড় করে এবার বলেন, 'দয়া করে একটা কথা বলব যদি কিছু

মনে না করেন—'

একটু অবাক হয়ে প্রণবেশ বলেন, 'না না, মনে করব না। আপনি বলুন—'

হরনাম বলেন, 'আপনাকে দেখে তো মনে হয় খুব রেসপেক্টেড ফ্যামিলির মানুষ। আপনার মেয়ে কীভাবে একটা লোফার স্কাউন্ড্রেলের পাল্লায় পড়ল, ভেবে পাচ্ছি না। তার রুচি বা পছন্দ আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল।'

প্রণবেশ খুবই অস্বস্তি বোধ করেন। তাঁর আর অনুরাধার বিবাহ বিচ্ছেদ যে রুমির অধঃপাতের একটা বড় কারণ সেটা তো এই শিখ ভদ্রলোককে বলা যায় না। হরনামের চোখের দিকে তাকাতে পারছিলেন না তিনি। মুখ নামিয়ে কোনওরকমে বলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আচ্ছা চলি—' বলে দ্রুত বেরিয়ে পড়েন।

হরনাম সিংদের ফ্ল্যাট থেকে নিচে নেমে একটা আই এস ডি/এস টি ডি বুথ থেকে লালবাজারে শুভঙ্করকে ফোন করলেন প্রণবেশ। অ্যাটালান্টার নাম করে বললেন, 'মনে হচ্ছে, ওখানে ওদের পাওয়া যেতে পারে।'

শুভঙ্কর জানালেন, অন্য ছেলেগুলোর বাড়িতে এর মধ্যে তিনি ফোন করেছেন কিন্তু তারা কিংবা রুমি এখন কোথায় আছে বাড়ির লোকেরা জানাতে পারেনি। ওদের ভয় দেখানো হয়েছিল কিন্তু সবাই বলেছে শুভঙ্করর| ইচ্ছা করলে তাদের বাড়ি গিয়ে সার্চ করে দেখতে পারেন। শুনে শুভঙ্করের মনে হয়েছে ওরা সত্যি কথাই বলেছে। তবে আটলান্টায় রুমিকে না পাওয়া গেলে ওই সব জায়গায় পুলিশ পাঠানো হবে। ছোকরাগুলোর মা-বাবাদের লালবাজারে তুলে আনবেন। ওঁদের চাপ দিলে, আশা করা যায়, ছেলেদের হদিস পাওয়া যেতে পারে। একটি ছেলেকেও ধরতে পারলে রুমিকে খুঁজে বার করতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। তার আগে আটলান্টার খোঁজটা নেওয়া দরকার।

প্রণবেশ বলেন, 'আমি আটলান্টায় যাচ্ছি। দেখি ওখানে রুমিকে পাওয়া কিনা।'

শুভঙ্কর বলেন, 'ছোকরাগুলো তো বেপরোয়া, নোটোরিয়াস টাইপের—'

'হ্যাঁ, সেই রকমই শুনেছি।'

একটু চিন্তা করে শুভঙ্কর বলেন, 'আচ্ছা যা, আমিও ওখানে যাচ্ছি। আমি পৌঁছুনোর আগে ওদের দেখা পেলে যা করার ট্যাক্টফুলি করবি।'

শুভঙ্করের দুর্ভাবনার কারণটা বোঝা যাচ্ছিল। উত্তেজনার মাথায় এমন কিছু ঘটতে পারে যাতে প্রণবেশের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। কেননা যে ছোকরা রুমিকে তুলে নিয়ে গেছে সে খুব সহজে তাকে ছেড়ে দেবে না। গুরনাম সম্বন্ধে যেটুকু জানা গেছে তাতে মনে হয় সে যা খুশি করে বসতে পারে। তাই শুভঙ্কর নিজেই

আটলান্টায় যেতে চাইছেন। যত বড় ক্রিমিনালই হোক, পুলিশ দেখলে তার শিরদাঁড়ায় কাঁপুনি ধরে যায়। প্রণবেশ বললেন, 'ঠিক আছে, আয়।'

কয়েক মিনিটের ভেতর আটলান্টার বাইরে ফুটপাথ ঘেঁষে নিজের মারুতি ওমনিটা লক করে রেখে দারোয়ান আর লিফটম্যানদের জিজ্ঞেস করে করে ফিফথ ফ্লোরে একটা ফ্ল্যাটের সামনে চলে এলেন প্রণবেশ। ফ্ল্যাটের বাইরের দিকের দরজাটা বন্ধ রয়েছে। ভেতরে চড়া সুরে ওয়েস্টার্ন পপ মিউজিকের সঙ্গে হই হই করে উদ্দাম গান আর নাচ চলছে। সেই সঙ্গে হাততালি, হাসি আর চিৎকার।

প্রণবেশের মনে হল, সঠিক জায়গাতেই পৌঁছে গেছেন। দু-চার মুহূর্ত তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর ডোর-বেল টিপলেন। ভেতরে টুং টাং করে আওয়াজ হল। পরক্ষণে নাচগানের শব্দ থেমে গেল, তবে মিউজিকটা চলতেই লাগল। ভেতর থেকে জড়ানো কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'হু ইজ দেয়ার?'

প্রণবেশ গম্ভীর গলায় ইংরেজিতে বললেন, 'দরজা খোল—'

একপাল্লার দরজাটা আধাআধি খুলতেই আট দশটা ছেলেমেয়েকে দেখা গেল। তাদের কারও কারও চোখ ঢুলু ঢুলু, আরক্ত। একটি মধ্যবয়সী লোক অসময়ে এসে ডোর-বেল বাজানোয় তারা যে অত্যন্ত বিরক্ত সেটা ওদের কোঁচকানো চোখ আর ভ্রূ দেখে আন্দাজ করা যায়। তবে সবচেয়ে বেশি করে যাকে চোখে পড়ে সে সাতাশ আটাশ বছরের একটি যুবক। টান টান চেহারা তার, তবে নেশার ঘোরে পা টলছে। দাড়ি এবং পাগড়ি দেখে শনাক্ত করা যায় সে-ই গুরনাম।

ঘরের ভেতরটা সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। সিগারেট ছাড়াও আরেকটা কটু, পোড়া পোড়া গন্ধও নাকে এসে লাগছে। সেটা খুব সম্ভব গাঁজার।

মুখ বাড়িয়ে এতগুলো ছেলেমেয়ের ভেতর রুমিকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন না প্রণবেশ। তবে সে যে এখানে আছে সে সম্বন্ধে তিনি শতকরা একশ ভাগ নিশ্চিত।

গুরুনাম এলোমেলো পা ফেলে এগিয়ে আসে। জিজ্ঞেস করে, 'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট হিয়ার?'

শব্দগুলো কেটে কেটে এমন দুর্বিনীত ভঙ্গিতে ছোকরা উচ্চারণ করে যে সব রক্ত মাথায় উঠে আসে প্রণবেশের। চোয়াল শক্ত হয়ে যায় তাঁর। বলেন, 'রুমি কোথায়?' বলতে বলতেই ঘরের এক কোণে রুমিকে দেখতে পান তিনি। বলেন, 'চলে এসো—'

রুমি প্রণবেশকে এখানে আশা করেনি। হঠাৎ সে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। নিঃশব্দে, সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে, অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতো পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে।

গুরনাম রাস্তা আটকে বলে, 'রুমি যাবে না। হু আর ইউ ওল্ড বাগার?'

'আমি যেই হই, রাস্তা ছাড়—'

'নেভার।'

'স্কাউন্ড্রেল এতবড় তোমার সাহস, রুমিকে বাড়ি থেকে জোর করে এই হেল-এ নিয়ে এসেছ? চাবকে তোমাকে আমি সিধে করে ছাড়ব।' বলে এক ধাক্কায় গুরনামকে মেঝেতে ছিটকে ফেলে দিয়ে রুমির একটা হাত ধরে টানতে টানতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যান।

একজন প্রৌঢ়ের শরীরে এতটা শক্তি থাকতে পারে, গুরনাম ভাবেনি। মেঝেতে পড়ার কারণে তার কাঁধ থেঁতলে গিয়েছিল। স্প্রিংয়ের মতো লাফ দিয়ে উঠে পড়ে সে। তার ওপর কোনও অদৃশ্য হত্যাকারী যেন হঠাৎ ভর করে বসে। দৌড়ে বাইরের প্যাসেজে এসে কুৎসিত গালাগালি দিতে দিতে পেছন থেকে প্রণবেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। টাল সামলাতে না পেরে খাড়া সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে নামতে থাকেন প্রণবেশ। অন্য ছেলেমেয়েগুলো এতক্ষণ সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো চুপচাপ বসে বা দাঁড়িয়ে ছিল। এবার তারা উত্তেজিত দুর্বোধ্য কণ্ঠস্বরে হল্লা করতে করতে দরজার দিকে দৌড়ে আসতে থাকে, আর চেতনার শেষ অন্তরীপটা ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার আগে প্রণবেশের কানে রুমির আর্ত চিৎকার ভেসে আসে। টের পান, সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে সে নিচে নেমে আসছে।

।। বার ।।

প্রণবেশের জ্ঞান ফিরল সূর্যোদয়ের ঠিক পরে পরে। নরম আলোয় এখন চাবদিক ভরে গেছে। বাইরের গাছপালার মাথা থেকে পাখিদের ডাক ভেসে আসছে।

আস্তে আস্তে চোখ মেললেন প্রণবেশ। আবছাভাবে মনে হল, তাঁকে ঘিরে কয়েকটি মুখ। পৃথিবীর নানান ব্যস্ততার টুকরো টুকরো শব্দও শুনতে পাচ্ছেন। পবক্ষণে অনুভব করলেন, সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। আবার চোখ বুজলেন তিনি। এবাব বেশ কিছুক্ষণ বাদে যখন তাকালেন সব কিছু স্পষ্ট হয়ে গেছে।

প্রণবেশ দেখতে পেলেন, কেয়াতলায় নিজের বেডরুমের বিশাল খাটে তিনি শুয়ে আছেন। যে মুখগুলো তাঁর দিকে ঝুঁকে রয়েছে কোনওদিন তারা এ বাড়িতে আসতে পারে, এ ছিল একেবারেই অভাবনীয়। মনে হল অলীক, অবিশ্বাস্য কোনও স্বপ্নের ঘোরে তিনি তাদেব দেখছেন। তাঁর বিহুল চোখের দৃষ্টি একবার অনুরাধা, পরক্ষণে রুমির মুখের দিকে ঘোরাফেরা করতে থাকে। এই ঘরে শুভঙ্করও রয়েছেন। একপলক তাঁকেও দেখে নিলেন। সবারই চোখমুখে প্রবল উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা আর রাত জাগার ছাপ।

অনুরাধা ধরা ধরা. ভারী গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'এখন কেমন লাগছে?'

প্রণবেশ বলেন, 'সারা গায়ে ভীষণ ব্যথা। কিন্তু তোমরা?'

অনুরাধা কী উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই শুভঙ্কর বলে ওঠেন, 'কাল রাতের ঘটনা কিছু মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ, অল্প অল্প—' ধীরে ধীরে দুর্বল স্বরে প্রণবেশ বলেন, 'বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে পাঞ্জাবি ছোকরাটা আমার ওপব ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমি গড়াতে গড়াতে সিঁড়ি দিয়ে যখন নিচে এসে পড়ছি সেই সময় রুমির চিৎকার শুনতে পেলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই। সব অন্ধকার হয়ে গেল।'

শুভঙ্কর বলেন, 'তুই যখন নিচে পড়ে গেলি তখন আমি ওখানে পৌঁছে গেছি।' এরপর তিনি যা বললেন তা এইরকম। অত উঁচু থেকে পড়ার কারণে মাথা, কপাল ফেটে যায়। কাঁধ, বুক, পেট আর হাতে প্রচণ্ড চোট লাগে। হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে নিয়ে গেলে জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, খবরের কাগজের লোকেরা এসে ছেঁকে ধরত, আজ সকালে এ নিয়ে 'সেনসেশনাল' রিপোর্ট বেরুত মর্নিং এডিশানের কাগজগুলোতে। ফলে প্রণবেশের আত্মীয়স্বজনেরা আজ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জেনে যেত। ঝাঁকে ঝাঁকে তারা আজ সকাল থেকে এবাড়িতে হানা দিত। এবং এদেরই কেউ বম্বেতে অমলার ঘুম ভাঙিয়ে খবরটা সাতকাহন করে জানিয়েও দিত। এ সব অস্বস্তিকর ব্যাপার এড়াবার জন্য শুভঙ্কর তাঁকে সোজা কেয়াতলায় নিয়ে এসে নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এক ডাক্তারকে ডাকিয়ে আনায়। এক্স-রে করে দেখা যায়, শরীরের হাড়-টাড় কিছুই ভাঙেনি। ইসিজিও করা হয়েছিল। হার্ট নরম্যাল। তবে মাথা থেকে পা পর্যন্ত নানা জায়গায় কেটে, ছড়ে রক্তপাত হয়েছে প্রচুর। তাই স্টিচ এবং ব্যান্ডেজ করে দু-তিনটে ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়।

এদিকে প্রণবেশকে গুরনাম আক্রমণ করায় একেবারে ভেঙে পড়েছে রুমি। তার ধারণা তার জন্যই এরকম জঘন্য আঘাত পেতে হল প্রণবেশকে। তাঁকে যখন এ বাড়িতে নিয়ে আসা হয় তখন সে-ও চলে আসে। এসেই উদ্‌ভ্রান্তের মতো অনুরাধাকে ফোন করে দেয়। তক্ষুনি তিনিও চলে আসেন। তীব্র অপরাধবোধে সারারাত প্রণবেশের বিছানার একধারে বসে কেঁদেছে রুমি। আর অস্থির উদ্বিগ্ন মুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকেছেন অনুরাধা।

এর মধ্যে আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে। প্রণবেশকে নিয়ে কেয়াতলায় আসার আগে সঙ্গের অন্য পুলিশ অফিসার এবং আর্মড কনস্টেবলদের শুভঙ্কর বলে এসেছিলেন গুরনাম আর তার সঙ্গী ছোকরাদের ভ্যানে তুলে লালবাজারে নিয়ে যেতে। তা ছাড়া তাদের অভিভাবকদের ডাকিয়ে এনে কেয়াতলায় শুভঙ্করকে যেন ফোন করা হয়।

প্রণবেশের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে করতে ফোন এসেছিল। তিনি ঘন্টা দুয়েকের জন্য লালবাজারে গিয়ে গুরনামদের শাসানি দিয়ে বলেছেন, এরপর রুমির ব্যাপারে কোনওরকম বজ্জাতির চেষ্টা করলে তার পরিণাম গুরুতর হবে। তাদের কাছ থেকে মুচলেকা লিখিয়ে তো নেওয়া হয়ই, অভিভাবকদেরও এ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়। এ সব করতে মাঝরাত হয়ে যায়। তারপর আবার কেয়াতলায় ফিরে আসেন তিনি। বাকি রাতটা এখানেই কাটিয়ে দিয়েছেন দু'টি কারণে। প্রথমত, প্রণবেশের জ্ঞান ফেরার জন্য অপেক্ষা করা। দ্বিতীয়ত, হুট করে কোনও কারণে যদি বম্বে থেকে অমলা ফোন করে বসেন, অনুরাধা বা রুমি ধরলে নতুন ধরনের বিপজ্জনক একটা সমস্যা দেখা দেবে। সেটা সামাল দেবার জন্য তাঁর না এসে উপায় ছিল না। অমলা তাঁকে খুব ভাল করেই চেনেন। কলকাতায় এলে তিনি প্রণবেশের সঙ্গে একবার অন্তত তাঁদের বাড়ি যাবেনই। অমলার ফোন এলে যা হোক একটা কিছু বলে তিনি ওঁকে ঠেকাতে পারবেন।

শুভঙ্কর বলেন, 'তোর জ্ঞান ফিরেছে। এখন অমলার ফোন এলে তুই নিজেই কথা বলতে পারবি।'

প্রণবেশ কিছু বলেন না, দু চোখে অসীম কৃতজ্ঞতা নিয়ে তাকিয়ে থাকেন।

শুভঙ্কর আবার বলেন, 'সন্তোষকেও বলে দিয়েছি তোর ইনজুরির খবর যেন অমলাকে না দেয়। অনুরাধা আর রুমি যে এ বাড়িতে এসেছে তাও না জানায়। সন্তোষ যথেষ্ট ইনটেলিজেন্ট, সে নিশ্চয়ই আমার কথা শুনবে। সব দিকেব শান্তি বজায় রাখার জন্যে উল্টোপাল্টা কিছু করবে না।' একটু থেমে আবার বলেন, 'সন্তোষকে তোর আর অনুবাধার ব্যাপারে সাবধান করে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।'

একটা হাত সামান্য তুলে প্রণবেশ বলেন, 'তুই আমাকে বাঁচালি ভাই—'

শুভঙ্কর হেসে হেসে বলেন, 'বন্ধুকে বন্ধু না বাঁচালে কে আর বাঁচাবে বল। আমাকে এখন যেতে হচ্ছে। বিকেলে এসে তোকে দেখে যাব।'

'আচ্ছা—'

শুভঙ্কর চলে যান।

অনুরাধা বলেন, 'এবার আমিও যাই।'

বিষণ্ন সুরে প্রণবেশ বলেন, 'তুমি যাবে?' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ম্লান একটু হাসেন, 'আচ্ছা যাও। তোমাকে থাকতে বলার অধিকার তো আমার নেই।'

মুখ নামিয়ে চাপা গলায় অনুরাধা বলেন, 'বাসি কাপড় টাপড় ছেড়ে, স্নান করে আবার আমি আসছি।'

প্রণবেশের মুখে খুশির আভা ছড়িয়ে পড়ে।

অনুরাধার দেখাদেখি রুমিও উঠে পড়েছিল। সে বলে, 'আমিও যাচ্ছি।'

প্রণবেশ বলেন, 'না, তুমি থাকো।' রুমি যে এ বাড়িতে অনধিকার প্রবেশকারী নয়, মুখে উচ্চারণ না করেও বুঝিয়ে দিলেন। অনুরাধাকে বললেন, 'তুমি আসার সময় রুমির দু-চারটে জিনস টিনস কি সালোয়ার কামিজ নিয়ে এসো। কতকাল ওকে নিজের কাছে পাই নি।' বলতে বলতে চুপ করে যান।

অনুরাধা চলে গেলেন। খাটের কোণে চোখ নামিয়ে নিঃশব্দে বসে রইল রুমি।

অনেকক্ষণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন প্রণবেশ। তারপর স্নিগ্ধ গলায় ডাকেন, 'আমার কাছে এসে বসো।'

আস্তে আস্তে উঠে আসে রুমি। তাকে পাশে বসাতে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পান মেয়েটার চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরছে। শুভঙ্করের কাছে আগেই শুনেছিলেন, সারা রাত ও কেঁদেছে। কাল রাতের একটা ঘটনা তাকে আমূল বদলে দিয়েছে যেন। আশ্চর্য এক আবেগ উথলানো ঢেউয়ের মতো বুকের অতল স্তর থেকে উঠে এসে তাঁর গলা বার বার বুজিয়ে দিচ্ছিল। কিছু বলতে চাইছিলেন তিনি, পারছিলেন না। অনেকক্ষণ পর কণ্ঠস্বরটা মুক্ত করে বললেন, 'কাঁদছ কেন মা?' বলতে বলতে রুমির পিঠে একটা হাত রাখলেন।

তাঁর স্পর্শের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা রুমির কান্নাটাকে আরও উচ্ছ্বসিত করে তোলে। জড়ানো গলায় সে বলে, 'আমার জন্যে আপনার এই অবস্থা। জ্ঞান যদি না ফিরত, তাহলে—' বলতে বলতে সে থেমে যায়।

অনুশোচনায়, সঙ্কোচে একেবারে এতটুকু হয়ে গেছে রুমি। অথচ এই মেয়েটা কাল বিকেল পর্যন্ত কী বেপরোয়া আর হঠকারীই না ছিল! রুমিকে আরও একটু কাছে টেনে নিলে সে বলে, 'বিশ্বাস করুন, কাল আমি ওদের সঙ্গে আটলান্টায় যেতে চাইনি। কিন্তু গুরনামটা—'

'আমি জানি তুমি যেতে চাওনি। ওরাই জোর করে নিয়ে গেছে। তোমার মা আমাকে সব বলেছে। এবার থেকে কেউ তোমাকে ডিসটার্ব করবে না।'

রুমি কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রণবেশ বলেন, 'এখন আর কোনও কথা নয়। সন্তোষকে বল, নতুন ব্রাশ, তোয়ালে টোয়ালে দেবে। আগে মুখটুখ ধুয়ে এসো। তারপর একসঙ্গে চা খাব।'

রুমি বলে, 'কাল ডাক্তার সান্যাল আপনাকে সকালে দুধ দিতে বলেছেন। তারপর ওষুধ খেতে হবে।'

প্রণবেশ বলেন, 'ঠিক আছে। দু'জনেই দুধ খাব।'

'না, আমি চা, আপনি দুধ। কিন্তু আপনার তো মুখ ধোয়া হয়নি।'

'সন্তোষকে বল, ও এখানেই জল পেস্ট টেস্ট এনে দেবে।'

রুমি সন্তোষকে কিছুই বলল না। তার কাছ থেকে সব চেয়ে এনে নিজের হাতে প্রণবেশের মুখ ধুইয়ে দিল। তারপর সে খেল রুটি মাখন ডিম আর কলা। প্রণবেশকে খাওয়াল দুধ, বিস্কুট আর ওষুধ।

খাওয়া হয়ে গেলে প্রণবেশ মেয়ের হাত ধরে বলেন, 'তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব রুমি?'

'কী?' রুমি উৎসুক চোখে তাকায়।

'মা অনেক দুঃখ পেয়েছে। তাকে এবার থেকে সুখী করতে চেষ্টা করো।'

'আর আপনাকে?'

'তোমার মা সুখী হলেই আমি সুখী হব।'

ন'টার সময় স্নান সেরে, শাড়ি জামা টামা পালটে আবার কেয়াতলায় এলেন অনুরাধা। এসেই প্রণবেশের সব দায়িত্ব নিয়ে নিলেন। ডাক্তারের নির্দেশমতো ওষুধ এবং পথ্য খাওয়ানো থেকে গা স্পঞ্জ করে দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত কিছু নিজের হাতে করতে লাগলেন। সন্তোষই রান্না টান্না করল, তবে প্রণবেশের জন্য হালকা করে সুজির পায়েস, নরম টোস্ট আর চিকেন সুপটা তিনিই করলেন। নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে যতই তাঁকে দেখছিলেন প্রণবেশ, গাঢ় বিষাদের সঙ্গে আশ্চর্য এক সুখানুভূতিতে তাঁর মন ভরে যাচ্ছিল।

দুপুরে রুমি যখন বাথরুমে স্নান করছে, অনুরাধাকে ডেকে নিজের কাছে বসিয়ে প্রণবেশ বললেন, 'আমার খুব অপরাধবোধ হচ্ছে অনু—'

অনুরাধা চমকে ওঠেন। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'কিসের অপরাধ?'

প্রণবেশ বলেন, 'আমার যা প্রাপ্য নয়, তোমার কাছ থেকে তা আদায় করে নিচ্ছি।'

তিনি কী ইঙ্গিত দিয়েছেন, অনুরাধা বুঝতে পেরেছেন। তাঁর সমস্ত অস্তিত্বের ভেতর প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো তুমুল কিছু একটা ঘটে যায়। কয়েক পলক স্থির চোখে প্রণবেশের দিকে তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিতে নিতে বলেন, 'তুমি যা বললে সেটা আমিও তো বলতে পারি।'

এরপর নিয়তিতাড়িত দু'টি মানুষের সব কথা যেন ফুরিয়ে যায়। স্তব্ধ হয়ে তাঁরা বসে থাকেন।

।। তের ।।

প্রণবেশ মারাত্মকভাবে আঘাত পাওয়ার পর দিন চারেক কেটে যায়। এর মধ্যে অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি। এখন আর তাঁকে সারাক্ষণ শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয় না, রুমির কাঁধে হাত দিয়ে সকাল বিকেল পায়চারি করে বেড়ান। ডাক্তার সান্যাল মাথা, বুক এবং হাতের মোটা, পুরু ব্যান্ডেজের বদলে ক্ষতস্থানগুলোতে পাতলা পট্টি লাগিয়ে দিয়েছেন।

সেই যে রুমি রক্তাক্ত, বেহুঁশ প্রণবেশকে নিয়ে শুভঙ্করের সঙ্গে এ বাড়িতে এসেছিল, তারপর থেকে এখানেই থেকে গেছে। দু-একবার হরিশ মুখার্জি রোডে যেতে চেয়েছে ঠিকই কিন্তু প্রণবেশ তাকে ছাড়েননি, নিজের কাছে ধরে রেখেছেন। তবে অনুরাধা এ বাড়িতে রাত কাটান না, সকালে ন'টা সাড়ে ন'টায় এসে রাতে আটটা বাজলেই চলে যান। প্রণবেশের যে ধরনের চোট লেগেছিল তাতে এত তাড়াতাড়ি এতটা সুস্থ হওয়ার কথা নয়। সেটা সম্ভব হয়েছে অনুরাধার সেবাযত্নের কারণে।

অমলাকে বিয়ে করে প্রণবেশ খুবই সুখী, পরিতৃপ্ত। এ পক্ষের ছেলেমেয়েরাও এক কথায় চমৎকার। এরা সবাই তাঁর প্রতি অনুগত। কিসে তাঁর আরাম, কিসে স্বাচ্ছন্দ্য—সবদিকে ওদের তীক্ষ্ণ নজর। তবু রুমি আর অনুরাধাকে নিয়ে এ ক'দিনের এই গোপনে আনন্দটুকুর যেন তুলনা নেই। চার দিনের কথা পৃথিবীর কাউকে জানানো যাবে না, পরমাশ্চর্য এই সুখানুভূতি নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রাখতে হবে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে কিংবা রুমির কাঁধে হাত রেখে হল-ঘরে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ হঠাৎ প্রণবেশের চোখে পড়েছে, পলকহীন তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন অনুরাধা। চোখাচোখি হলেই বিব্রতভাবে মুখ নামিয়ে নিয়েছেন। তাঁর মতো অনুরাধাও কি ভেবেছেন, এই ক'টা দিন যেভাবে কেটেছে সারাজীবন এটাই তো কাম্য ছিল। কিন্তু সে কথা আর জিজ্ঞেস করা হয়নি। করলেও হয়তো উত্তর পাওয়া যেত [illegible] এটা বোঝা যাচ্ছিল, বারো শ মাইল দূরে আরবসাগরের পারের সেই শহরটা [illegible], শুভ আর তোড়াকে নিয়ে যেন অনেকটা ঝাপসা হয়ে গেছে।

কেয়াতলার বাড়িতে এলে কিচেনে গিয়ে প্রণবেশের জন্য দু-একটা হালকা ধরনের পদ নিজের হাতে রাঁধেন অনুরাধা। ডাক্তার সান্যাল আপাতত কিছুদিন প্রণবেশকে বেশি তেলঝালমশলাওলা খাবার খেতে বারণ করে দিয়েছেন। পাতলা মাছের ঝোল, শুক্তো বা বড়ি-দেওয়া লাউয়ের তরকারি—এ সবে তাঁর আপত্তি নেই। সন্তোষ আবার এ ধরনের রান্না তেমন একটা পারে না। তাই এই দায়িত্বটা

নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন অনুরাধা। এতে প্রণবেশ কতটা খুশি হয়েছেন সেটা মুখ ফুটে না বললেও তাঁর চোখের ঝকঝকে উজ্জ্বলতাই বুঝিয়ে দিয়েছে।

এ বাড়ির কিচেনটা একতলায়। আজ সকালে কেয়াতলায় এসে বাগান পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই অনুরাধার চোখে পড়ল, দুটো বড় বড় ভারী থলে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকছে সন্তোষ। বোঝা গেল এইমাত্র বাজার করে ফিরে এসেছে সে।

পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকায় সন্তোষ। সে খুবই চালাক চতুর। অনুরাধার সঙ্গে প্রণবেশের সম্পর্কটা কী, এর মধ্যে পরিষ্কার ধরে ফেলেছে। তবে নিজের থেকে কোনওরকম কৌতূহল দেখায় নি বা কাউকে জানায়ও নি। এর জন্য শুভঙ্করের কড়া নিষেধাজ্ঞা তো আছেই। তবু এটা মানতেই হবে নিজের অধিকার আর আগ্রহের সীমা সম্পর্কে সে যথেষ্টই সচেতন।

মাত্র কয়েকটা দিন অনুরাধাকে দেখেছে সন্তোষ কিন্তু তার মধ্যেই তাঁকে ভীষণ ভাল লেগে গেছে। তিনি এবাড়িতে এলে সে খুবই খুশি হয়।

অনুরাধাকে দেখে মুখ হাসিতে ভরে গেল সন্তোষের। বলে, 'বৌদি এসে গেছেন! আজ কিন্তু একটু বেশি করেই বাজার করেছি।'

প্রথম কি দ্বিতীয় দিন থেকে সন্তোষ তাঁকে বৌদি বলছে। এই ডাকটা যাঁর কারণে তাঁর সঙ্গে কবেই তো সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে অনুরাধার। গোড়ার দিকে খানিকটা অস্বস্তি হলেও এখন বেশ ভালই লাগে। হেসে হেসে বললেন, 'কী বাজার করলে, দেখি—'

রান্নাঘরের মাঝখানে দুটো থলে উপুড় করে ঢেলে দিল সন্তোষ। তিন রকমের মাছ—পাবদা, ভেটকি আর রুই। এছাড়া আলু, টমাটো. বেগুন, কড়াইশুঁটি, লাউ, কারিপাতা, অসময়ের ফুলকপি, শশা, বীন, গাজর ইত্যাদি।

অনুরাধা বললেন, 'বাবা, পুরো গড়িয়াহাটা তুলে এনেছ দেখছি।'

'বলুন রান্নাবান্না কী হবে?' যদিও অনুরাধা সামান্য দু-একটা পদ রাঁধেন তবু তাঁকে রোজই এই প্রশ্নটা করে থাকে সে। সন্তোষ কী করে যেন টের পেয়ে গেছে এ বাড়ির সঙ্গে অনুরাধার সম্পর্ক না থাকলেও তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছা বা মতামতের গুরুত্ব এখনও এখানে অনেকখানি।

অনুরাধার কেন যেন আজ ভারি লোভ হল সবগুলো রান্নাই তিনি করবেন। বললেন, 'দাঁড়াও। তোমার দাদার কাছ থেকে জেনে আসি—' বলে সোজা তেতলায় চলে এলেন।

শোওয়ার ঘরে বিছানায় বসে ডিমের পোচ, কলা আর গরম টোস্ট দিয়ে ব্রেকফাস্ট করছিলেন প্রণবেশ। পাশেই ছোট টেবলে ট্রেতে দুধের গেলাস রয়েছে।

এখন সকালের দিকে তাঁকে আর কফি দেওয়া হয় না। শরীর থেকে যা রক্তপাত হয়েছে তাতে দুধ খাওয়াটা পুরোপুরি বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন ডাক্তার সান্যাল। দু বেলা বড় দু গেলাস দুধ। যেহেতু তাঁর প্রচণ্ড কফির নেশা, বিকেলে মাত্র একবার আধ কাপ দেওয়া হয়। প্রণবেশের মুখোমুখি একটা নীচু মোড়ায় বসে রুমিও ব্রেকফাস্ট করছে।

অনুরাধা ঘরে আসতেই উচ্ছ্বাসের সুরে প্রণবেশ বলেন, 'জানো আজ একটা দারুণ ব্যাপার হয়েছে। ইটস আ ডে অফ অল ডেজ।'

বুঝতে না পেরে অনুরাধা জিজ্ঞেস করেন, 'কী হয়েছে?'

'রুমি সন্তোষকে ব্রেকফাস্ট করতে দেয় নি। তাকে বাজারে পাঠিয়ে আমার জন্যে নিজের হাতে পোচ টোস্ট করে এনেছে।' বলতে বলতে আনন্দে, তৃপ্তিতে প্রণবেশের চোখমুখ জ্বল জ্বল করতে থাকে।

শোনার পরও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না অনুরাধা। রুমিকে তিনি খুব ভাল করেই জানেন। বাড়ির সামান্য একটা কাজও সে কখনও করেছে কিনা তাঁর মনে পড়ে না। সেই বেয়াড়া, অবাধ্য, অপদার্থ মেয়ে তাব বাবার জন্য ব্রেকফাস্ট করে দিয়েছে—এমন চমকপ্রদ ঘটনা পৃথিবীতে আগে আব কখনও ঘটেছে কিনা তাঁর জানা নেই। প্রণবেশ হয়তো কোনও ম্যাজিক ট্যাজিক জানেন।

অবাক বিস্ময়ে মেয়ের দিকে তাকান অনুরাধা। রুমি মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখে লাজুক একটু হাসি। রুমিব পরিবর্তনটা খুব ভাল লাগছিল অনুরাধার। এতকাল এই মেয়েকে নিয়ে যে প্রচণ্ড দুর্ভোগ গেছে, যে তীব্র মানসিক চাপ তাঁকে ভেতরে ভেতরে শেষ করে ফেলছিল, সে সব থেকে এখন তিনি অনেকখানি মুক্ত। বহুকাল পর স্বাভাবিকভাবে অনুরাধা শ্বাস নিতে পারছেন যেন। কয়েক পলক রুমিকে দেখার পর প্রণবেশের দিকে চোখ ফেরান তিনি। একটু মজা করার ইচ্ছা হল তাঁর। হেসে হেসে বললেন, 'মেয়ে খাবার তৈরি করে খাওয়াচ্ছে। তোমারই তো সুখের সময়।' প্রণবেশের সঙ্গে যে তাঁর যে আর কোনও সম্পর্ক নেই, এই মুহূর্তে সেটা আর মনে থাকে না।

উত্তর না দিয়ে প্রণবেশ হাসতে থাকেন।

অনুরাধা আগের সুরেই বলেন, 'ভাগ্য বটে তোমার। আমাকে কোনওদিন এক কাপ চা পর্যন্ত করে খাওয়ায় নি।'

প্রণবেশ হালকা গলায় বলেন, 'এবার থেকে খাওয়াবে।' মেয়েকে বললেন, 'কি, মাকে চা-টা করে দেবে তো?'

আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয় রুমি—দেবে।

'ফাইন। মা যাতে সুখী হয়, এবার থেকে সেদিকে লক্ষ রাখবে।' বলতে বলতে কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে প্রণবেশের।

অনুরাধার বুকের ভেতর দিয়ে বিচিত্র এক শিহরণ খেলে যায়। প্রণবেশ তাঁকে সুখী করতে চান কিন্তু সেটা তো আর মুখ ফুটে বলা যায় না, তাই বুঝিবা রুমিকে সেই দায়িত্বটা দিলেন।

একটু চুপচাপ।

তারপর অনুরাধা জিজ্ঞেস করেন, 'সন্তোষ বাজার করে ফিরে এসেছে। আজ কী রান্না হবে?' এই প্রশ্নটা ক'দিন ধরে সন্তোষ তাঁকে করছে আর তিনি করছেন প্রণবেশকে।

প্রণবেশ বললেন, 'আমি কী বলব? রান্নাবান্না তো মেয়েদের এক্সক্লুসিভ ডিপার্টমেন্ট। তুমি যা ঠিক করবে তাই হবে। তবে—'

'তবে কী?'

'রোগীর ডায়েট খেয়ে খেয়ে মুখ একেবারে হেজে গেল।'

প্রণবেশের মনোভাব বুঝতে পারছিলেন অনুরাধা। গলার স্বরটা গম্ভীর করে বলেন, 'ডাক্তার সান্যাল তাই খেতে বলেছেন—'

প্রণবেশ হাতজোড় করে কাঁচুমাচু মুখে বলেন,' 'বলুক গে। প্লিজ, আজ আর ওসব দিও না। স্রেফ মরে যাব। আমার ইচ্ছা, আজ সব রান্না তুমিই কর।' বলতে বলতে অনুরাধার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিলেন তিনি। প্রাক্তন স্ত্রীটির কপাল কুঁচকে গেছে। ঠোঁটদুটি টেপা কিন্তু তাঁর ফাঁক দিয়ে হাসি যেন চলকে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। তাঁর চোখে এই বয়সেও, মেয়েকে নিয়ে প্রচুর দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও, অলৌকিক আলো যেন মাখানো থাকে। সেই চোখ এখন চাপা হাসিতে ঝিকমিক করছে।

প্রণবেশ জানেন না, অনুরাধা আজ ঠিক করে রেখেছেন সব রান্নাই নিজে করবেন। তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা আন্দাজ করে আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলেন, 'বুঝেছি বুঝেছি, শ্রীমতীজির করুণা পাওয়া যাবে।'

'তোমার মতো ধুরন্ধরকে নিয়ে আর পারা যায় না। কী করে কাজ গুছিয়ে নেওয়া যায় সেই আর্টটা খুব ভালই জানা আছে তোমার। আমার এখন আর দাঁড়াবার সময় নেই। অনেক কাজ, নিচে যাচ্ছি।' বলে অনুরাধা ঘর থেকে বেরিয়ে হল-ঘর পার হয়ে সিঁড়ির দিকে চলে যান।

মুখ তুলে অবাক বিস্ময়ে মা আর বাবাকে লক্ষ করছিল রুমি। এই পুরুষ আর নারীটির কথা বলার ভঙ্গি, তাকানো, মজা, চাপা হাসির বিচ্ছুরণ—সব কিছুর ভেতর থেকে যা বেরিয়ে আসছে তা হল অপার ভালবাসা। এমন দু'টি মানুষের কী করে

যে ভুল বোঝাবুঝি হয় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের মতো একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটতে পারে সে ভেবে পাচ্ছিল না। গাঢ় বিষাদে রুমির মন ভরে যাচ্ছিল।

এদিকে নিচে এসে অনুরাধা সন্তোষকে বললেন, 'আজ সব রান্না আমি করব। কাছ থেকে তুমি আমাকে সাহায্য করবে।'

খুব খুশি হয়ে যায় সন্তোষ। বলে, 'নিশ্চয়ই করব বৌদি।'

এ বাড়িতে ক'দিন ধরে রোজ আসছেন অনুরাধা। দু-একটা পদ প্রণবেশের জন্য রাঁধছেন। তাই আটপৌরে একটা প্রিন্টেড শাড়ি আর ব্লাউজ এনে দোতলায় রেখে দিয়েছেন. ওগুলো পরেই রান্নাটা করেন তিনি। তারপর পোশাক পালটে নেন। আসলে রান্নার সময় জামা কাপড়ে তেলের ছিটে, মাছ-ধোয়া জল বা লঙ্কা-হলুদ লেগে যায়। সারা দিন আঁশটে গন্ধওলা নোংরা পোশাক পরে থাকতে গা ঘিন ঘিন করে। বললেন, 'আমি শাড়ি টাড়ি বদলে আসছি। আলু দিয়ে রুই মাছের মাখা মাখা ঝোল, ধনেপাতা বেগুন দিয়ে পাবদার ঝাল আর ভেটকির ফ্রাই হবে। তুমি সাইজ করে ফ্রাইয়ের মতো মাছ কাটতে পার তো?'

'পারি বৌদি।'

'কেটে ফেল।'

দোতলায় গিয়ে রান্নার শাড়ি পরে ফিরে এসে অনুরাধা দেখেন সন্তোষ এর মধ্যে ভেটকির আঁশ এবং ওপরের পাতলা ছাল ছাড়িয়ে ফ্রাইয়ের জন্য মোটামুটি ছ ইঞ্চি লম্বা আর তিন ইঞ্চি চওড়া—এই মাপে পাতলা করে একেকটা টুকরো কেটে কেটে রাখছে। অনুরাধাকে দেখে জিজ্ঞেস করে, 'সাইজ ঠিক আছে বৌদি?'

'হ্যাঁ।' অনুরাধা বলেন, 'আমি আনাজ কেটে নিচ্ছি। মাছ কাটা হলে তুমি মশলা বেটে দেবে।'

সন্তোষ এমনিতে প্যাকেটের গুঁড়ো মশলা দিয়ে রান্না করে কিন্তু অনুরাধা তাতে একেবারেই খুশি নন। তিনি আসার পর থেকে তাকে মশলা বাটতে হচ্ছে। প্যাকেটের হলুদ লঙ্কা টঙ্কা তিনি পছন্দ করেন না। সন্তোষ বলে, 'দেব বৌদি।'

সন্তোষ দারুণ চটপটে. কাজের লোক। প্রথমে মাছ টাছ কেটে, ধুয়ে ফেলল। তারপর ক্ষিপ্র হাতে মশলা বেটে প্লেটে প্লেটে সাজিয়ে দিল।

এর মধ্যে আনাজ কাটা হয়ে গিয়েছিল অনুরাধার। মাছে নুন হলুদ মাখিয়ে দিল সন্তোষ।

অনুরাধা গ্যাস জ্বালিয়ে রান্না চড়িয়ে দিলেন। তার ফরমাস মতো সন্তোষ কখনও সরষের তেলের বোতল. কখনও নুন বা মশলা এগিয়ে দিতে লাগল।

একটা ওভেনে মুগের ডাল বসিয়ে দিলেন অনুরাধা। আরেকটা ওভেনে হালকা

করে পাবদা মাছ ভাজতে ভাজতে সময়ের কী এক উজান টানে কুড়ি বছর আগের দিনগুলোতে ফিরে যেতে থাকেন। তখন কেয়াতলার এই বাড়িতে এভাবেই নিজের হাতে সব কিছু রান্না করতেন। সেইসময় সন্তোষ ছিল না, হাতে হাতে তেল-মশলা জোগাবার জন্য ছিল বেলার মা। এই যে আজ সন্তোষ, প্রণবেশ বা রুমি ছাড়া একটি কাকপক্ষীকেও না জানিয়ে তিনি রাঁধছেন সেটা তো চিরকালই তাঁর করার কথা ছিল। এই রান্নাঘর, সামনের বাগান, একতলা দোতলা তিনতলা এবং ছাদ মিলিয়ে ছোট্ট পৃথিবী, একদা সেটা ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব। কিন্তু আজ আর তিনি এ বাড়ির কেউ নন, সম্পূর্ণ অনধিকার প্রবেশকারী একজন। কথাটা যত ভাবেন, বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যেন চুরমার হয়ে যেতে থাকে। অসহ্য একটা কষ্ট ডেলা পাকিয়ে গলার কাছে আটকে যায়। মনে হয়, সমস্ত অস্তিত্ব ভেঙে চুরে প্রবল কান্না বেরিয়ে আসবে। অনুরাধা জানেন না তাঁর চোখে জল জমেছে কিনা। তবে চারদিকেব দৃশ্যাবলী ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যেতে থাকে।

'বৌদি—' হঠাৎ সন্তোষের ডাক কানে ভেসে আসে।

অনুরাধা চকিত হয়ে ওঠেন। অন্যের চোখে তাঁর দুর্বলতা ধরা পড়ে যাওয়াটা বড়ই লজ্জাকর। সন্তোষকে আড়াল কবে দ্রুত হাতেব পেছন দিক দিয়ে চোখ মুছে আবছা গলায় সাড়া দেন, 'কী বলছ?'

'একটা কথা বলব?'

'বল।'

দ্বিধান্বিতভাবে সন্তোষ এবার বলে, 'অন্য কেউ জানতে পারবে না তো?'

অনুরাধা বলেন, 'আমি আব কাকে বলতে যাব? তুমি বল—'

সন্তোষ বলে, 'বোম্বাইয়ের ওই বৌদি বছরে একবার কলকাতায় আসেন কিন্তু কোনওদিন বান্নাঘরে ঢুকতে দেখি নি। মানুষ তিনি ভাল, তবে আপনার মতো দাদাকে কখনও এত যত্ন করে খাইয়েছেন বলে মনে পড়ছে না।'

অনুরাধা হকচকিয়ে যান। দ্রুত ওভেনের দিকে ঝুঁকে বলেন, 'চুপ কব সন্তোষ। এসব কথা আমার শুনতে নেই।'

সন্তোষ বলে, 'যা সত্যি তা বলব না?'

'না, বলবে না। সত্যি কথা সব সময় বলতে হয় না। অন্যের কানে গেলে আমার মুখ লুকোবার জায়গা থাকবে না।'

'আমি তো অন্য কাউকে বলছি না।'

'আমাকেও আর কখনও বলবে না।'

সন্তোষ কী বোঝে সে-ই জানে। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে অনুরাধাকে কয়েক পলক দেখে

চোখ নামিয়ে নেয়।

অনুরাধা তার দিকে ফিরেও তাকান না।

কিছুক্ষণ বাদে সন্তোষ বলে, 'বৌদি, আমার খুব ইচ্ছে—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায়।

অনুরাধা বলেন, 'কী?'

'দাদা তো কিছুদিন বাদে বোম্বাই ফিরে যাবেন। আমি কিন্তু মাঝে মধ্যে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে যাব। আপনাকে দেখে কী ভাল যে লেগেছে!'

অনুরাধা উত্তর দেন না।

সন্তোষ বলে 'আপনাদের বাড়ির ঠিকানাটা যদি দেন—'

প্রাক্তন স্বামীর কাজের লোক তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে, এটা জানাজানি হলে কী বিপত্তি ঘটবে কে জানে। সবাই হয়তো ধরে নেবে বিশেষ উদ্দেশ্যে অনুরাধা সন্তোষকে নিজেদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন। সন্তোষ যে নিজের ইচ্ছায় যেতে চাইছে সেটা কেউ একবারও ভাববে না। কুড়ি বছর আগে তাঁর জীবনটা একবারে তছনছ হয়ে গিয়েছিল। তারপর সেদিনের সেই তিক্ততা অনেকটাই কেটে গেছে। ভাঙাচোরা, বিক্ষিপ্ত পুরনো জীবনটাকে কিছুটা গুছিয়ে নিয়েছেন তিনি। তখন বয়স ছিল কম, যুঝবার শক্তি ছিল প্রচুর। কিন্তু এই বয়সে স্ক্যান্ডাল রটলে অনুরাধা বাঁচবেন না। যুদ্ধ করার মতো ক্ষমতা তাঁর প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। তবে যে তিনি এ বাড়িতে ছুটে এসেছেন, সে তো আঘাত পেয়ে প্রণবেশের প্রচুর রক্তপাত ঘটেছে বলে। যে কেউ এটুকু করত। রুমি এই ক'দিন আগাগোড়া বদলে গেছে। তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তার জন্য প্রণবেশকে অত্যন্ত প্রয়োজন। দু-একদিনের মধ্যে সেটা তাঁকে বলবেন। সেটুকু হয়ে গেলেই প্রণবেশ হয়তো বম্বেতে ফিরে যাবেন। মেয়ের জন্য কুড়ি বছর পর যে ছিন্ন সম্পর্কটুকু সামান্য একটু জোড়া লেগেছে সেটা আবার ছিঁড়ে যাবে। মহাশূন্যের অচেনা গ্রহের মতো তাঁরা নিজের নিজের কক্ষপথে ফিরে যাবেন। রুমির ব্যাপারে এখন তিনি প্রায় দুর্ভাবনামুক্ত। যেটুকু বাকি আছে তা হয়ে গেলেই এ বাড়ির সঙ্গে আর কোনওভাবেই যোগাযোগ রাখা ঠিক হবে না।

সন্তোষ বলে, 'কী বৌদি, ঠিকানাটা দিলেন না?'

খুব শান্ত গলায় অনুরাধা বলেন, 'কী হবে আমাদের ওখানে গিয়ে?'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন এক দৃঢ়তা ছিল, এ নিয়ে সন্তোষের আর কিছু বলতে সাহস হয় না।

রান্না শেষ হতে হতে দুপুর হয়ে গেল। এতগুলো পদ রাঁধার কারণে হাতে মুখে এবং শাড়িতে তেল-মশলার প্রচুর দাগ লেগেছে। সারা গায়ে মাছের আঁশটে গন্ধ। আজ আর স্নান না করে পারা গেল না। কেয়াতলায় ক'দিন ধরে আসছেন তিনি। রোজই এখানে আসার আগে নিজেদের বাড়িতে স্নান আর খাওয়া চুকিয়ে ফেলেন। কেয়াতলায় বিকেলে এক কাপ চা ছাড়া আর কিছু খান না।

আজ দ্বিতীয় বার স্নানের পর পোশাক বদলে সন্তোষকে দিয়ে খাদ্যবস্তুগুলি তেতলায় নিয়ে এলেন অনুরাধা। চোট লাগার পর প্রণবেশ বিছানায় শুয়ে খেতেন। আজ বললেন, 'আমি এখন সুস্থ। বিছানায় নয়, হল-ঘরের টেবলে বসে খাব।'

প্রণবেশের ইচ্ছামতো হল-ঘরে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হল। তাঁর আর রুমির জন্য দুটো বড় প্লেটে ভাত এবং ছোট আর মাঝারি নানা পাত্রে ডাল, তরকারি, ফ্রাই ইত্যাদি পরিপাটি করে সাজিয়ে দিলেন অনুরাধা। সন্তোষ একধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রণবেশ প্লেটে হাত দেন নি। বললেন, 'আমার একটা রিকোয়েস্ট রাখবে অনু?'

তার চোখের দিকে তাকিয়ে উৎসুক সুরে অনুরাধা বললেন, 'কী রিকোয়েস্ট?'

প্রণবেশ বলেন, 'আজ তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে।'

অনুরাধা চমকে ওঠেন। প্রণবেশ এই যে এত রান্নাবান্না করিয়েছেন তার পেছনে তবে কি তাঁকে খাওযাবার উদ্দেশ্যও ছিল? চোখ নামিয়ে বিব্রতভাবে বলেন, 'আমি খেয়ে এসেছি।'

'জানি, রোজই তুমি খেয়ে আসো। তোমাকে এ ক'দিন খেতে বলতে সাহস হয নি। আজ খুব ইচ্ছে হচ্ছে একসঙ্গে বসে খাই। জীবনে আর কখনও হয়তো এমন সুযোগ আসবে না।' অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে কথাগুলো বলে যান প্রণবেশ। তাঁর খেয়াল থাকে না, এই হল-ঘরে তিনি আর অনুরাধা ছাড়াও আরও দু'জন রয়েছে এবং তাদের কাছে তাঁর ব্যাকুলতাটুকু কীভাবে ধরা পড়ছে।

অনুরাধা উত্তর দেন না। শুধু অনুভব করেন, তাঁর বুকের ভেতর ঝড়ের মতো কিছু যেন ভেঙে পড়েছে।

প্রণবেশ এবার রুমিকে বলেন, 'তোমার মা আমার কথা তো শুনছে না, তুমি একবার বল না—'

রুমি তক্ষুনি বলে, 'খাও না মা। সবাই একসঙ্গে বসে খেলে খুব আনন্দ হবে।'

অনুরাধা বুঝতে পারছিলেন, ওরা বাবা আর মেয়ে তাঁকে আজ ছাড়বে না। নীরবে প্লেটে দু চামচ ভাত, ডাল, ফ্রাই তুলে নিয়ে একটা চেয়ারে বসতে বসতে তাঁর চোখে পড়ে প্রণবেশের মুখ খুশিতে ঝলমল করছে। সন্তোষের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আমি তো খেতে বসে গেলাম। যার যা দরকার, এবার তোমাকেই দিতে

হবে।'

সন্তোষ আগেই লক্ষ করেছিল, এ বাড়িতে চা ছাড়া এ ক'দিন আর কিছু খান নি অনুরাধা। আজ তাঁকে ভাত টাত নিয়ে বসতে দেখে সেও ভীষণ খুশি। প্রবল উৎসাহে বলে ওঠে, 'নিশ্চয়ই দেব বৌদি—'

আজ সকাল থেকে আকাশের নানা কোণে থোকায় থোকায় মেঘ জমতে শুরু করেছে। কাল টিভির খবরে আবহাওয়া দপ্তরের হুঁশিয়ারি বেশ গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হয়েছিল। বঙ্গোপসাগরে নাকি প্রবল নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। আর সেই কারণে আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় কলকাতাসহ গাঙ্গেয় পশ্চিবঙ্গে তুমুল ঝড়বৃষ্টি হবে। এই সতর্কবাণী সে নেহাত কথার কথা নয় সেটা এই দুপুরবেলায় ভাল করেই টের পাওয়া গেল। সকালের সেই মেঘগুলো সারা আকাশ জুড়ে ঘন হয়ে জমাট বেঁধে সূর্যকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছে। কাচের জানালা দিয়ে লেকের দিকের কিছুই এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। যতদূর চোখ যায় সব অন্ধকারে যেন ডুবে গেছে।

সন্তোষ হল-ঘরের আলোগুলো জ্বালিয়ে দিল। প্রণবেশ একবার বাইরে তাকিয়ে উচ্ছ্বাসের সুরে বলেন, 'এক্সেলেন্ট। এই মেঘলা দুপুরে একসঙ্গে বসে খাওয়ার রোমান্সই আলাদা।'

ওঁদের খাওয়ার মধ্যেই মেঘের ডাক শুরু হয়ে যায়। দিগন্ত আড়াআড়ি চিরে বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। সেই সঙ্গে নেমে আসে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। খানিক আগে লেকের দিকটা যেটুকুও বা দেখা যাচ্ছিল, বৃষ্টি নামায় তা আরও ঝাপসা হয়ে গেছে।

বাইরের অঝোর বর্ষণের মধ্যে কুড়ি বছর আগের সুখস্মৃতিতে ডুবে যান প্রণবেশ। তখন রুমি খুবই ছোট, তবু তাকে নিয়ে এই আজকের মতো তাঁরা তিনজনে খেতে বসতেন। মাছের মুড়ো বা তপসে মাছ ভাজা কিংবা মোচার চপ নিজের পাত থেকে অনুরাধার প্লেটে তুলে দিতেন। আজ ভাল করে ভাজা ফ্রাইগুলো তাঁকে দিয়েছেন অনুরাধা। ইচ্ছা হল দুটো ফ্রাই ওঁকে দেন। দিতে গিয়েও থমকে যান প্রণবেশ। না, এখন আর তা সম্ভব নয়। পুরনো দিন তাঁদের জীবনে আর কখনও ফিরে আসবে না।

গভীর বিষাদে মন ভরে যায় প্রণবেশের। তিনি লক্ষ করেন, মুখ নামিয়ে ভাত নাড়াচাড়া করছেন অনুরাধা। কুড়ি বছর আগের সেই সুখদায়ক দিনগুলির স্মৃতি কি তাঁর ওপরও ভর করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার উপায় নেই।

হঠাৎ টেবলের ওপর টেলিফোন বেজে ওঠে। অন্যমনস্কর মতো সেদিকে হাত বাড়াতে গিয়ে থেমে যান অনুরাধা। তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে ফোনটা তুলে নেন

প্রণবেশ। বলেন, 'হ্যালো, কে—অমলা?' কুড়ি বছর আগের স্মৃতির স্বপ্নময়তা থেকে তিনি ফিরে আসেন। কী আশ্চর্য যোগাযোগ, তিনি যখন প্রাক্তন স্ত্রী আর মেয়ের সঙ্গে খেতে বসেছেন সেই সময় কিনা অমলার ফোন এল!

ওধার থেকে অমলার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'হ্যাঁ। কলকাতায় আর কতদিন থাকতে হবে?'

অমলার নাম শুনতেই অনুরাধা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর দিকে এক পলক তাকিয়ে খুবই কষ্ট হতে থাকে প্রণবেশের। বললেন, 'কেন বল তো?'

অমলা বলেন, 'এখানে মিডল-ইস্ট থেকে মেসেজ এসেছে। একটা এয়ালাইনসের হেড অফিস বিল্ডিংয়ের ডিজাইন ওরা আমাদেব দিয়ে করাতে চায়। তুমি ডেট দিলে বম্বে এসে ওদের রিপ্রেজেন্টেটিভ তোমার সঙ্গে দেখা করবে। তুমি বললে সেই তারিখটা ওদের ফ্যাক্স করে জানিয়ে দেব।'

'এখন যাওয়া সম্ভব নয়। একটা বড় কাজের ব্যাপারে কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়েছে। যতক্ষণ না ফাইনাল হচ্ছে আমাকে কলকাতায় থাকতে হবে।' বলতে বলতে চোখের কোণ দিয়ে অদূরবর্তিনী একটি মহিলার দিকে তাকান প্রণবেশ। রুদ্ধশ্বাসে বসে আছেন অনুরাধা। তাঁর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুরাধার বুকের ভেতর থেকে আবদ্ধ বাতাস একটু শব্দ করেই বেরিয়ে আসে। মনে হয় একটা দুর্ভাবনা তাঁব ওপর ভর করেছিল। প্রণবেশ এক্ষুনি চলে যাবেন না, জানাব পর চিন্তাটা অনেকখানি কেটে গেছে। তাঁর সাবা মুখে চাপা আলোর মতো কিছু ফুটে ওঠে।

ওধার থেকে অমলা উত্তর দেওয়ার আগে প্রণবেশ আবার বলে ওঠেন, 'তুমি তো জানোই একটা বড় কাজ, প্রায় সাত আটশ কোটি টাকার প্রোজেক্টের ডিল মুখের কথায় হয়ে যায় না। ডিজাইনের জন্য বেশ কয়েক বার সাইটে গিয়ে খুঁটিনাটি দেখতে হয়, এগ্রিমেন্ট সাইন করার আগে অনেকগুলো লিগ্যাল পয়েন্ট নিয়ে ডিটেলে আলোচনা করতে হয়। এর জন্যে যথেষ্ট সময় লাগে।' একটু থেমে বললেন, 'তুমি তো রোজই ফোন কব। এগ্রিমেন্টটা ফাইনাল হয়ে গেলেই কবে বম্বে ফিরতে পারব, তোমাকে জানিয়ে দেব। এখন ছাড়ছি।'

ফোনটা নামিয়ে রেখে ফের একবার অনুরাধার দিকে তাকান প্রণবেশ। তাঁর ঠোঁটের ফাঁকে হাসির চিকণ একটি রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়।

চোখাচোখি হতে দ্রুত মুখ নামিয়ে নেন অনুরাধা। প্রণবেশ থেকে যাওয়ায় তিনি যে খুশি হয়েছেন সেটা কি প্রাক্তন স্বামীব চোখে ধরা পড়ে গেছে? নইলে তিনি হাসবেন কেন?

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে খাওয়া চলতে থাকে। কেউ একটি কথাও বলেন না।

বাইরে বৃষ্টির তোড় আরও বেড়েছে, সেই সঙ্গে তুমুল ঝড়ো হাওয়া বয়ে চলেছে। উল্টোপাল্টা হাওয়া লেকের দিকের গাছগুলোর ঝুঁটি ধরে এলোপাথাড়ি ঝাঁকিয়ে চলেছে।

।। চোদ্দ ।।

দুপুরে সেই যে দুর্যোগ শুরু হয়েছিল তা এখনও থামে নি। থামার কোনও লক্ষণই নেই।

এখন পাঁচটার মতো বাজে। অন্যদিন এসময় বেশ খানিকটা রোদ থাকে। কিন্তু আজ অসময়ে মধ্যরাত নেমে এসেছে যেন।

খাওয়া দাওয়ার পর সবাই প্রণবেশের বেড-রুমে চলে এসেছিলেন। প্রণবেশ বিছানায় শুয়ে আছেন, তাঁর কাছাকাছি খাটের বাজুতে ঠেসান দিয়ে আধশোয়ার মতো করে রয়েছে রুমি।

অনুরাধা একটু দূরে একটা চেয়ারে বসেছেন। সবাই এলোমেলো গল্প করছিলেন।

এর মধ্যে সন্তোষ কফি, বিস্কুট আর কিছু কাজুবাদাম দিয়ে গিয়েছিল। খেতে খেতে প্রণবেশ বললেন, 'যা বৃষ্টি শুরু হয়েছে, আজ আর থামছে না।'

এই অকালবর্ষার ভাবগতিক দেখে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন অনুরাধা। গল্প করছেন, কফি খাচ্ছেন—সবই ঠিক, কিন্তু বার বার তাঁর চোখ চলে যাচ্ছে জানলার বাইরে। প্রণবেশের বেড-রুমের দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়েও সাদার্ন অ্যাভেনিউ তো বটেই, দূরের লেক এবং রেল লাইনের ওপারের লেক গার্ডেনসের অনেকটাই চোখে পড়ে। সাদার্ন অ্যাভেনিউ সাড়ে তিন চার ঘন্টার একটানা বর্ষণে আড়াই ফুট জলের তলায় ডুবে গেছে। গাড়ি টাড়ি চলছে না। বেশ কিছু প্রাইভেট কার, মাটাডোর ভ্যান কিংবা অটো ইঞ্জিনে জল ঢোকার কারণে বানচাল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কচিৎ দু-একটা বড় ট্রাক বা বাস হেড লাইট জ্বালিয়ে তুমুল ঢেউ তুলে শব্দ করতে করতে বেরিয়ে যাচ্ছে। মানুষজন প্রায় নেই বললেই হয়। যতদূর চোখ যায় সব ফাঁকা।

অনুরাধা একবার উঠে গিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর ফিরে এসে বলেন, 'ভীষণ বিপদে পড়ে গেলাম তো।'

প্রণবেশ জিজ্ঞেস করেন, 'কিসের বিপদ?'

'যেভাবে বৃষ্টি পড়ছে আর রাস্তায় জল জমেছে বাস টাস যাও দু-একটা চলছে, এখনই বন্ধ হয়ে যাবে। বাড়ি ফিরব কী করে?' অনুরাধার চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে প্রচণ্ড উদ্বেগ ফুটে বেরোয়।

তাঁর উৎকণ্ঠার কারণটা বুঝতে পারছিলেন প্রণবেশ। দুর্যোগের জন্য অনুরাধা যদি শেষ পর্যন্ত বেরুতে না পারেন এবং এ বাড়িতেই তাঁকে থেকে যেতে হয়, সেটা তাঁর পক্ষে ভীষণ অস্বস্তিকর। বিবাহবিচ্ছিন্ন প্রাক্তন স্বামীর বাড়িতে রাত কাটানো কোনওভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। সন্তোষ নিশ্চয় চারদিকে চাউর করে বেড়াবে না, তবু নিজের কাছেই তিনি খুব ছোট হয়ে যাবেন। প্রণবেশ অনুরাধার প্রশ্নটার কী উত্তর দেবেন, ভেবে পেলেন না।

অনুরাধা বললেন, 'আমার একটা উপকার করবে?'

প্রণবেশ জিজ্ঞেস করেন, 'কী উপকার?'

'আমাকে হরিশ মুখার্জি রোডে পৌঁছে দেবার একটা ব্যবস্থা করতে পার? মানে সন্তোষ যদি তোমার গাড়িটা বার করে দিয়ে আসে—'

'তুমি কি পাগল হয়েছ! এত জলে বড় বড় বাস টাসই চলতে পারছে না, আমার ছোট গাড়ি রাস্তায় নামলেই ইঞ্জিন ডুবে যাবে।'

'কিন্তু আমাকে বাড়ি ফিরতেই হবে। তোমার একটা ওয়াটার প্রুফ ট্রুফ থাকলে সন্তোষকে দিতে বল—'

প্রণবেশ প্রথমটা হতবাক হয়ে যান। তারপর বলেন, 'তোমার মতলবটা কী বল তো?' ওয়াটার প্রুফ গায়ে দিয়ে কোমর সমান জল ঠেঙিয়ে কেয়াতলা থেকে ভবানীপুরে যেতে চাইছ।'

অনুরাধা বলেন, 'এ ছাড়া আর কোনও উপায়ই তো নেই।'

'মাথাটা তোমার সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে অনু।' বিছানায় সোজা হয়ে উঠে বসে প্রণবেশ বলেন, 'আমি তোমাকে এ অবস্থায় কিছুতেই যেতে দিতে পারি না।' তাঁর বলার ভঙ্গিতে দৃঢ়তা ফুটে বেরোয়।

হকচকিয়ে যান অনুরাধা। মুখ নামিয়ে দ্বিধান্বিত ভাবে বলেন, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আমার এ বাড়িতে বাস্তিবে থাকা উচিত না।'

প্রণবেশ একবার দ্রুত রুমিকে দেখে নেন। ভাবেন মেয়ে বড় হয়েছে এবং তাঁর আর অনুরাধার সম্পর্কটা সে খুব ভাল করেই জানে। তার সামনে খোলামেলা আলোচনা করতে বাধা নেই। তা ছাড়া যে বিষয়ে তারা কথা বলছেন তাতে গোপন বা গ্লানিকর কিছু নেই। প্রণবেশ বলেন, 'তুমি যা বললে সেটা যে আমি ভাবি নি তা নয় কিন্তু ব্যাপারটা অন্যভাবেও তো নিতে পার।'

অনুরাধা মুখ তুলে তাকান।

প্রণবেশ বলেন, 'ধর, কোনও স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ট্রেন ফেল করে আমাদের

রাত কাটাতে হল। তখন তুমি কী করবে? অন্য কোথাও যে পালিয়ে যাবে তারও পথ নেই।' একটু থেমে বলেন, 'নিরুপায় হলে মানুষকে অনেক কিছুই তো মেনে নিতে হয়।'

অনুরাধা উত্তর দেন না।

প্রণবেশ বুঝতে পারছিলেন, অনুরাধার দ্বিধাটা একেবারেই কাটছে না। কয়েক মুহূর্ত তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ঠিক আছে, বৃষ্টি যদি ধরে যায়, তোমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে চেষ্টা করব।'

দুর্যোগ কিন্তু কাটল না। ক্রমশ আরও উদ্দাম হয়ে উঠতে লাগল। সন্ধেবেলার বাংলা খবরে জানানো হল, কুড়ি বছরে এমন বৃষ্টি আর হয় নি। সেদিক থেকে এটা একটা রেকর্ড। সংবাদ পাঠিকা আরও জানালেন, আগামী বার ঘণ্টা এরকম বৃষ্টি ঝরতে থাকবে।

প্রণবেশ বললেন, 'আর কিছু করার নেই অনু। প্রকৃতির ইচ্ছা নয় তুমি এ বাড়ি থেকে আজ চলে যাও। মানুষ তো অনেক কিছুই ভাবে কিন্তু তার শক্তি আর কতটুকু?'

একটু চুপচাপ।

তারপর প্রণবেশ ফের বলেন, 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও কত কিছুই আমাদের মেনে নিতে হয়।' তাঁর কণ্ঠস্বর এবার চাপা শোনায়।

প্রণবেশের কথাগুলোতে অন্য কোনও ইঙ্গিত রয়েছে কী? অনুরাধা এবারও উত্তর দেন না।

প্রণবেশ তাঁর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছিলেন, ওঁর অস্বস্তিটা কাটিয়ে দেওয়া দরকার। একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান তিনি। বলেন, 'দুপুরে তো দারুণ খাওয়ালে। এবেলার মেনু কী হবে?'

চোখ বড় বড় করে অনুরাধা বলেন, 'ও বেলার অনেক খাবার রয়েছে। নতুন মেনু আবার কী?' নিজের অজান্তেই তাঁর আড়ষ্টতা অনেকখানি কেটে যায়।

প্রণবেশ হেসে হেসে বলেন, 'এই বর্ষায় ওসব ভাত, ডাল, মাছের ঝালটাল চলে নাকি?'

অনুরাধা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন, 'কী চলে তা হলে শুনি?'

মুখটা দারুণ কাঁচুমাচু করে প্রণবেশ বলেন, 'রেইনি ডে'র সঙ্গে মুগের ডালের খিচুড়ি, ঘি আর ইলিশমাছ ভাজার একটা স্পিরিচুয়াল সম্পর্ক আছে।' মুখটা রুমির দিকে ফিরিয়ে চোখ টিপে বলেন, 'তাই না রুমি?'

রুমি হেসে হেসে সায় দেয়, 'একজাক্টলি।'

অনুরাধাও হেসে ফেলেন। বলেন, 'বুঝেছি। আমাকে কী করতে হবে সেটাই বল—'

প্রণবেশ বলেন, 'তোমার হাতে ম্যাজিক আছে। একসময় খিচুড়িটা যা রাঁধতে—'

পুরনো দিনের প্রসঙ্গ যাতে না উঠে পড়ে সে জন্য খুবই সতর্ক হয়ে যান অনুরাধা। তরুণী মেয়ের সামনে পরস্পরবিচ্ছিন্ন একটি পুরুষ এবং নারীর আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠা ঠিক হবে না। ব্যস্তভাবে বলে ওঠেন, 'খিচুড়ি না হয় করা গেল কিন্তু ইলিশ মাছ পাব কোথায়? এই বৃষ্টিতে সন্তোষকে তো বাজারে পাঠানো যায় না।'

প্রণবেশ বলেন, 'ক'দিন আগে সন্তোষ ভাল ইলিশ কিনে এনেছিল। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখ, ফ্রিজে দু-চাব টুকরো নিশ্চয়ই আছে।'

অনুরাধা মজার ভঙ্গিতে বললেন, 'এই বয়েসেও তোমার নোলা একই রকম রয়ে গেছে দেখছি।'

'নোলা' শব্দটা অনুরাধার মতো শহুরে, শিক্ষিত মহিলারা উচ্চারণ করেন না। নেহাত রগড় করাব জনাই বলা।

প্রণবেশ বললেন. 'তা যা বলেছ। এই বয়েসেও ওটা আর কনট্রোল করা গেল না।'

সন্তোষ সত্যিই বেশ কয়েক টুকরো ইলিশ মাছ ডিপ ফ্রিজে মজুদ করে রেখেছিল। তা ছাড়া সরু বাসমতি আতপ চাল, ঘি, অসময়ের ফুলকপি আব কড়াইশুঁটিও রয়েছে।

রাত একটু বাড়লে কিচেনে গিয়ে একটা ওভেনে খিচুড়ি চড়িয়ে দিলেন অনুরাধা। অন্য ওভেনটায় আলু. বেগুন আর ইলিশ মাছ ভেজে নিলেন।

রান্না শেষ হতে হতে ন'টা বেজে গেল।

এবেলা আর হল-ঘরে নয়, প্রণবেশের বেড-রুমে ছোট ছোট নিচু ক'টা টি-পয টেবলে প্লেট সাজিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা হল।

এখনও বাইরে অবিশ্রাম বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে। কাচের জানালার বাইরে জনশূন্য নিঝুম রাস্তায় কর্পোরেশনের ঝাপসা আলোগুলোকে অলৌকিক মনে হয়। যেভাবে ঝরে চলেছে, এই বৃষ্টি আদৌ কোনও দিন থামবে কিনা কে জানে, যদিও আবহাওয়া দপ্তর ভরসা দিয়েছে বার ঘণ্টা পর দুর্যোগ কেটে যাবে।

একবার প্রণবেশের দিকে তাকিয়ে চোখ দুটো জানালার বাইরে নিয়ে যান

অনুরাধা। হঠাৎ বুকের ভেতর আশ্চর্য এক আকুলতা বোধ করেন তিনি। বিকেল বেলায় হরিশ মুখার্জি রোডে ফেরার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। ভেবেছিলেন ঘোর অকালবর্ষা মাথায় নিয়েই বেরিয়ে পড়বেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই বৃষ্টি আবহমান কাল চলতেই থাক এবং তাঁরা তিনজন কেয়াতলার এই ঘরটিতে মুখোমুখি বসে থাকুন।

খেতে খেতে একবার দূরমনস্ক অনুরাধার দিকে তাকান প্রণবেশ। আস্তে করে ডাকেন, 'অনু—'

অনুরাধা চমকে মুখ ফেরান।

প্রণবেশ বলেন, 'এই অসময়ের বর্ষায় মুগের ডালের খিচুড়ি. গাওয়া ঘি আর ইলিশ মাছ ভাজার মতো সুখাদ্য পৃথিবীতে আর হয় না। তার ওপর তোমার হাতের জাদু—'

চোখের কোণ দিয়ে প্রণবেশকে বিদ্ধ করতে করতে অনুরাধা বলেন, 'থাক থাক, আমাকে অত তোষামোদ করতে হবে না।'

'যা সত্যি তাই বলছি। সেটাকে তোষামোদ ভাবছ কেন?'

অনুরাধা অস্পষ্ট গলায় কী বলেন, বোঝা যায় না।

প্রণবেশ এবার বলেন, 'কতদিন পর তোমার হাতের খিচুড়ি খেলাম। একেবারে হেভেনলি।'

অনুরাধা উত্তর দিলেন না। তাঁর লাজুক মুখে এক ঝলক রক্তাভা ছড়িয়ে পড়ে।

খাওয়া দাওয়ার পর প্রণবেশের বেড-রুমে বসেই তিনজনে গল্প করতে করতে কিছুক্ষণ টিভি দেখলেন। তারপর রুমিকে নিয়ে পাশের ঘরে শুতে চলে গেলেন অনুরাধা। ওখানেই তাঁদের শোওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুই ঘরের মাঝখানে একটা কাচের দরজা।

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। পৃথিবীকে রসাতলে না পাঠানো পর্যন্ত সেটা থামবে কিনা কে জানে।

শোওয়ার পরও অনেকক্ষণ ঘুম এল না অনুরাধার। কুড়ি বছর বাদে এ বাড়িতে রাত কাটাচ্ছেন তিনি। মনে পড়ছে একসময় মদ্যপান বা অন্য কোনও কারণে প্রণবেশের ওপর খুব রাগ হলে মেয়েকে নিয়ে মাঝখানের দরজা বন্ধ করে এ ঘরে এসে শুয়ে পড়তেন। মধ্যরাতে অনুতপ্ত প্রণবেশ বিছানা থেকে উঠে গিয়ে কাচের দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিতেন। স্বামীর অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী কোনওদিন দরজা খুলতেন অনুরাধা, কোনওদিন খুলতেন না। যেদিন খুলতেন, প্রণবেশ হাজার বার ক্ষমা টমা চেয়ে তাঁকে বুকের ভেতর গভীর আবেগে টেনে নিয়ে ঠোঁটে কপালে

বুকে গলায় চুমোয় চুমোয় ভরে দিতেন। প্রথমটা বাধা দিতেন অনুরাধা, নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করতেন, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে চুরমার হয়ে যেত।

কতকাল বাদে তাঁরা একই বাড়িতে পাশাপাশি ঘরে শুয়েছেন। ঘড়িতে বারোটা বাজল, একটা বাজল কিন্তু ঘুম এল না অনুরাধার। মাঝখানের কাচের দরজায় কুড়ি বছর আগের মতো একটি টোকাও পড়ল না। অনুরাধা বুঝতে পারলেন না, এই টোকাটির জন্য তিনি জেগে আছেন কিনা। কাচের পাল্লায় বিস্মৃত হয়ে আসা একটি করাঘাতের শব্দ না শুনতে পাওয়ায় তাঁর কি কষ্ট বোধ হচ্ছে?

বিছানায় আব শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে না। বাইরে উতরোল বর্ষণ, আরামের যাবতীয় উপকরণ চারপাশে ছড়িয়ে তবু অনুরাধার মনে হল আজ আর ঘুম আসবে না। একবার পাশ ফিরলেন তিনি। রুমি পাতলা চাদরে সাবা গা ঢেকে গাঢ় ঘুমে ডুবে আছে। কয়েক পলক মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি ধীরে ধীরে উঠে পড়েন। তারপর কী ভেবে ডান ধারের অন্য একটা দরজা দিয়ে হল-ঘরে চলে আসেন। ধীরে ধীরে রাস্তাব দিকের দেওয়ালজোড়া জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ান। বাইরে জনবিহীন সিক্ত ঘুমন্ত কলকাতাকে একটা পরিত্যক্ত শহর বলে মনে হচ্ছে।

হল-ঘরেরই কোনও ঘুলঘুলিতে পায়রারা বুঝিবা বাসা বেঁধেছে। মাঝে মাঝে মেয়ে-পায়রার সঙ্গে তার পুরুষ সঙ্গীটির খুনসুটির আওয়াজ ভেসে আসছে। এ ছাড়া এই মধ্যরাতে আর কোথাও কোনও শব্দ নেই।

কতক্ষণ বাইরে তাকিয়ে ছিলেন, খেয়াল নেই অনুরাধার। হঠাৎ কাঁধের ওপর কার যেন হাতের ছোঁয়ায় চমকে ঘুবে দেখেন প্রণবেশ। মুহূর্তে তাঁর বুকের ভেতর থেকে এস্রাজে এলোপাথাড়ি ছড় টানার মতো তুমুল কলরোল উঠে আসতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন যেন আচমকা হাজার গুণ বেড়ে যায়। লজ্জা, ভর, উত্তেজনা এবং এক ধরনের চাপা অসহ্য সুখ—সব মিলিয়ে সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে।

প্রণবেশ বলেন, 'ঘুম আসছিল না বুঝি?'

অনুরাধা আস্তে মাথা নাড়েন, 'হ্যাঁ।'

'আমারও।'

'ভাবলাম হল-ঘরে গিয়ে একটু দাঁড়াই। বেরিয়ে তোমাকে দেখতে পেলাম।'

অনুরাধা উত্তর দিলেন না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর খুব গাঢ় গলায় প্রণবেশ বলেন, 'জানো, ওই ট্র্যাজিক ব্যাপারটার পর মনে হয়েছিল আমি আর বাঁচব না। তোমার জন্যে কী কষ্ট যে হয়েছিল—' বলতে বলতে তাঁর গলা বুজে আসে।

প্রণবেশেব আবেগটা অনুরাধার মধ্যেও ছড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, 'আমিও কি কম কষ্ট পেয়েছি—'

'জীবনটা কী যে হয়ে গেল!'

'হ্যাঁ—'

বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা, ঘুমের গভীরে ডুবে-থাকা শহর, নিঝুম হল-ঘর—সব মিলিয়ে এমন এক ম্যাজিক রয়েছে যা ভালমন্দ, পাপপুণ্য, ন্যায়অন্যায়, অতীত বা ভবিষ্যৎ, সমস্ত কিছু নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কথা বলতে বলতে হঠাৎ অনুরাধা টের পান প্রণবেশের বুকের গভীরে ক্রমশ ডুবে যাচ্ছেন।

প্রণবেশ ডাকেন, 'অনু—' তাঁর কণ্ঠস্বর যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসে।

অনুরাধা আস্তে সাড়া দেন, 'উঁ—'

'তোমাকে এই কুড়িটা বছর এক সেকেন্ডের জন্যেও ভুলতে পারি নি।'

'আমিও—আমিও—' হঠাৎ অবুঝ বালিকার মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন অনুরাধা। কাঁদতেই থাকেন। তার মধ্যেই বুঝতে পারেন প্রণবেশের একটা হাত অনুরাধার পিঠে অপার মমতায় নেমে এসেছে। আরেক হাতে নিবিড়ভাবে তাঁকে জঁড়িয়ে নিয়ে মুখটা তাঁর ঠোটের ওপর নামিয়ে আনেন।

কতকাল পর প্রণবেশ তাঁকে চুমু খাচ্ছেন! তাঁর উত্তপ্ত জিভ ধীরে ধীরে তাঁর মুখের ভেতর ঢুকে যায়। পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় শরীর হঠাৎ আশ্চর্য এক সুখে শিহরিত হতে থাকে।

তারপর কখন যে প্রণবেশ তাঁকে জানালার কাছ থেকে অদম্য আকর্ষণে নিজের বেড-রুমের কাছে নিয়ে এসেছেন, খেয়াল নেই। আচ্ছন্নের মতো তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলছিলেন অনুরাধা। প্রণবেশের শে'ওয়ার ঘরে প্রায় চলেই এসেছিলেন, সেই সময় আচমকা সমস্ত চরাচরকে হতচকিত করে বাইরে কোথাও বাজ পড়ে। পলকে ঘোরটা যেন কেটে যায় অনুরাধার। প্রণবেশের বুকের ভেতর থেকে নিজেকে মুক্ত করে দৌড়ে পাশের ঘরের দিকে চলে যান তিনি।

চমকে প্রণবেশ ব্যাকুল স্বরে ডাকেন, 'অনু—অনু—'

'না—না—' অনুরাধা উদ্‌ভ্রান্তের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে রুমির পাশে শুয়ে পড়েন। খানিক আগে প্রণবেশের বুকের ওপর মুখ রেখে ফুঁপিয়ে উঠেছিলেন। সেই কান্নাটাই অদম্য উচ্ছ্বাসে হৃৎপিণ্ড চুরমার করে

অন্যভাবে বেরিয়ে আসতে থাকে।

পরদিন সকালে সবার যখন ঘুম ভাঙে বৃষ্টি ধরে গেছে। মেঘ কেটে গিয়ে রোদের দু-চারটে ফ্যাকাসে রেখা আকাশ থেকে নেমে এসেছে।

মুখ টুখ ধুয়ে চা খেতে খেতে প্রণবেশ বা অনুরাধা সঙ্কোচে, লজ্জায় কেউ কারও দিকে তাকাতে পারছিলেন না। পরে ধীরে ধীরে সব স্বাভাবিক হয়ে আসে। কাল রাতে অন্তহীন দুর্যোগে নিঝুম অন্ধকারে কী ঘটেছিল তাঁরা কেউ আর মনে করে রাখতে চান না।

।। পনের।।

আরও সাতদিন পর বিকেলবেলায় হল-ঘরে বসে কফি খাচ্ছিলেন প্রণবেশ আর অনুরাধা। প্রণবেশ এখন পুরোপুরি সুস্থ। রুমি বাড়িতে নেই। প্রণবেশ আঘাতের ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠার পর থেকে সে ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করতে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরই সে ফিরে আসবে। ঠিক হয়েছে, যে ক'দিন প্রণবেশ কলকাতায় আছেন, রুমি কেয়াতলাতেই থাকবে। এখান থেকেই ক্লাস করবে।

অনুরাধা অবশ্য দুর্যোগের রাতটা কাটিয়ে পরদিন হরিশ মুখার্জি রোডে চলে গিয়েছিলেন। এখনও তাঁর ছুটি চলছে। রোজই সকালে উঠে আগের মতো স্নান-খাওয়া চুকিয়ে কেয়াতলায় চলে আসেন। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়।

কফি শেষ হয়ে এসেছিল। হঠাৎ বম্বে থেকে অমলাব ফোন এল। তিনি বললেন, দু-একদিনের ভেতর প্রণবেশকে অতি অবশ্যই বম্বে ফিরে যেতে হবে। কেননা মিডল ইস্টের এক রাজধানী শহরে সেখানকার মৃত সুলতানের বিশাল স্মৃতিস্তম্ভ বসানো হবে। ওরা চান প্রণবেশ এর নক্‌শাটা করে দিক। এ নিয়ে আলোচনার জন্য দু'জন প্রতিনিধিকে পাঠানো হয়েছে। তাঁরা বম্বেতে অপেক্ষা করছেন। কলকাতায় যত কাজই থাক, সব ফেলে তাঁকে বম্বে যেতেই হবে। তেমন দরকার হলে মিডল-ইস্টের লোকেদের সঙ্গে দেখা করে দু-একদিন পর আবার কলকাতায় চলে আসতে পারেন।

অনুরাধাকে সব জানিয়ে প্রণবেশ ম্লান হাসেন। বলেন, 'এবার আর কলকাতায় থাকা হচ্ছে না। আমাকে ফিবতে হবে।'

অনুরাধা উত্তর দেন না। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর জিজ্ঞেস করেন, 'কবে যেতে যাও?'

প্রণবেশ বলেন, 'আজ আব হবে না। যদি কাল যাই?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে অনুরাধা বলেন, 'পরশু কি তার পরের দিন গেলে কি অসুবিধা হবে?'

প্রণবেশের হঠাৎ মনে হয় কুড়ি বছর পর জীবনে যে দুর্লভ, গোপন সুখটুকু এসেছে তার আয়ু কি আরেকটু দীর্ঘ করতে চাইছেন অনুরাধা? গাঢ় গলায় বলেন, 'কেন বল তো?'

অনুরাধা যে উত্তরটা দিলেন তাতে প্রণবেশের প্রত্যাশা যেন একটু ধাক্কা খায়। তিনি বলেন, 'রুমির জন্যে একটা ছেলের কথা বলেছিলাম, মনে আছে? মানে যাকে আমি পছন্দ করে রেখেছি—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—'

'কাল তোমাকে নিয়ে ওদের বাড়ি যেতে চাই। তুমি যদি বিয়ের ব্যাপারে একটু কথা বল ভাল হয়। ছেলের মা-বাবা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন।'

'তোমার আমার সম্পর্কটা ওঁরা জানেন?'

'জানেন। আমার এক বন্ধুর থ্রুতে সম্বন্ধটা এসেছে। সে ওঁদের বলেছে।'

'কোনও অসুবিধা হবে না তো?'

'বুঝতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, কাল আর পরশু দু'দিন আমি কলকাতায় থেকে যাচ্ছি। কবে গেলে ওঁদের অসুবিধা হবে না?'

'আমি এক্ষুনি ফোন করে জেনে নিচ্ছি।'

হঠাৎ কী মনে পড়তে প্রণবেশ বলে ওঠেন, 'কিন্তু—'

'কী?' অনুরাধা তাঁর মুখের দিকে তাকান।

'রুমির এ বিয়েতে আপত্তি নেই তো?'

'ঠিক জানি না। তবে তুমি বললে মনে হয় রাজি হয়ে যাবে।'

প্রণবেশ বুঝতে পারছিলেন, রুমির যে পরিবর্তনটা হয়েছে সেটাকে কাজে লাগাতে চান অনুরাধা। তিনি চলে গেলে ফের যদি মেয়েটা গোলমাল করে সেই কারণে বিয়ের জন্য এতটা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তিনি।

প্রণবেশ বলেন, 'ঠিক আছে, রুমিকে আমি বোঝাব।'

।। ষোল ।।

রুমিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কালই রাজি করিয়েছিলেন প্রণবেশ। তবে তার ইচ্ছা বিয়েটা এম. এ পরীক্ষার পর হোক। এতে অনুরাধার আপত্তি নেই। মেয়ের মতামত প্রণবেশের কাছে জেনে নিয়ে কালই ছেলের বাবা সুখময় বসুকে ফোন করেছেন তিনি। সুখময় আজ সন্ধেয় ওঁদের বাড়ি যেতে বলেছেন।

সুখময় বসুদের বাড়িটা লেকের কাছে সর্দার শঙ্কর রোডে। সাড়ে ছ'টা নাগাদ অনুরাধাকে তাঁর মারুতি ওমনিতে তুলে সেখানে পৌঁছে গেলেন প্রণবেশ। বাগান দিয়ে ঘেরা দোতলা বাড়িটা খুবই ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন।

সুখময়রা প্রণবেশদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের দোতলায় দারুণ সাজানো গোছানো ড্রইংরুমে এনে বসানো হল।

সুখময় একটা মাঝারি কোম্পানির সেক্রেটারি ছিলেন। বছরখানেক হল রিটায়ার করেছেন। ওঁর স্ত্রী মণিকা কলেজে ফিলজফি পড়ান। তাঁদের এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ে বড়, বিয়ে হওয়ার পর স্বামীর সঙ্গে কানাডায় চলে গেছে। ছেলে ছোট, নাম সুব্রত। বছর দুই আগে চাটার্ড অ্যাকাউনটেন্সি পাস করার পর একটা নাম-করা মাল্টি-ন্যাশনাল ফার্মে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে জুনিয়র অফিসার হিসেবে জয়েন করেছে।

সুখময়, মণিকা এবং সুব্রতর সঙ্গে আলাপ হল। তিনজনই খুব হাসিখুশি আর আন্তরিক। সুব্রতকে দেখে একটু বেশি ভাল লাগল। দারুণ সুপুরুষ আর স্মার্ট।

চা মিষ্টি মিষ্টি খাওয়া হলে প্রণবেশ হেসে হেসে বললেন, 'এবার ফরমাল আলোচনাটা শুরু করা যাক। আমাদের মেয়ে রুমিকে আপনারা পুত্রবধূ করে নিলে নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করব।'

হাতজোড় করে সুখময় বলেন, 'এসব বলবেন না। আপনার মতো বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা হলে আমরা কি খুশি যে হব, বলে বোঝাতে পারব না।'

'অজস্র ধন্যবাদ। আপনারা কি রুমিকে দেখেছেন?'

'না। অনুরাধা দেবী তার ফোটো দেখিয়েছেন। একেবারে ওঁরই জেরক্স কপি।' বলে হাসতে লাগলেন সুখময়। চোখের একটা মজাদার ভঙ্গি করে বললেন, 'ছবি দেখে আমার ছেলেও কিঞ্চিৎ কাত হয়েছে। মনে হয় তারও বেশ পছন্দ।'

সবাই হেসে ওঠেন। হাসাহাসির তোড়টা একটু কমলে প্রণবেশ এবার বলেন, 'এবার অন্য একটা কথা—'

'বলুন'—

‘অনুরাধা আর আমার এখন রিলেশানটা কী, নিশ্চয়ই আপনারা শুনেছেন।’

ড্রইং রুমটা হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যায়।

প্রণবেশ আবার বলেন, ‘তবে আমাদের মধ্যে কোনওরকম তিক্ততা আর নেই। উই আর গুড ফ্রেন্ডস নাউ। মেয়ের ব্যাপারে আমাদের জয়েন্ট রেসপনসিবিলিটি। বুঝতেই পারছেন, তাকে আমরা সুখী দেখতে চাই। তার জন্যেই আমাদের একসঙ্গে আসতে হয়েছে।’

সুখময় যে বড় মাপের উদার মানুষ সেটা এবার তাঁর কথা শুনেই বোঝা গেল, ‘দেখুন মিস্টার মজুমদার, মানুষের জীবনে নানা কারণে কত ট্র্যাজেডি ঘটে যায়। সেদিকে আঙুল উঁচিয়ে অশান্তি বাড়ানোর মতো সময় বা মানসিকতা কোনওটাই আমাদের নেই।’

কৃতজ্ঞ প্রণবেশ সুখময়ের দু-হাত জড়িয়ে ধরে গভীর স্বরে বলেন, ‘আপনার মতো মানুষ জীবনে খুব বেশি দেখিনি।’

সুখময় স্নিগ্ধ একটু হাসেন।

প্রণবেশ বলেন, ‘কাল আমি বম্বে চলে যাচ্ছি। শীগগিরই ফিরে এসে অন্য কথাবার্তা হবে। এর মধ্যে একদিন দয়া করে রুমিকে যদি দেখে আসেন—’

‘নিশ্চয়ই।’

‘কবে যেতে পারবেন, অনুরাধা জেনে নেবে। আমি অবশ্য তখন থাকতে পারব না।’

‘ঠিক আছে।’

‘আরেকটা আর্জি আছে আপনাদের কাছে—’

‘কী?’

‘মেয়ের খুব ইচ্ছা এম. এ’টা করার পর বিয়ে হোক।’

‘নিশ্চয়ই। কোনও তাড়া নেই।’

পরদিন সন্ধের ফ্লাইটে বম্বের টিকেট পাওয়া গেল। প্রণবেশকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবার জন্য সঙ্গে গেলেন অনুরাধা আর রুমি।

আজ আর নিজে ড্রাইভ করছেন না প্রণবেশ, সন্তোষ গাড়ি চালাচ্ছে। এয়ারপোর্টে প্রণবেশকে নামিয়ে সে হরিশ মুখার্জি রোডে অনুরাধাদের পৌঁছে দিয়ে কেয়াতলায় ফিরে যাবে।

ফ্রন্ট সিটে সন্তোষের পাশে বসেছেন প্রণবেশ। ব্যাক সিটে বসেছেন অনুরাধা আর রুমি। গাড়িতে ওঠার পর থেকে সমানে কেঁদে চলেছে রুমি। অনুরাধার মুখ স্পষ্ট

দেখা যাচ্ছে না, জানালার বাইরে তিনি তাকিয়ে আছেন।

এয়ারপোর্টে এসে গাড়ি থেকে নেমে ডোমেস্টিক উইংয়ের কাছে চলে আসেন ওঁরা। রুমির কান্না এখনও থামেনি। তাঁর মাথায় একটা হাত রেখে ধরা গলায় প্রণবেশ বলেন, 'কেঁদো না—'

এই প্রথম রুমি বলল, 'বাবা—'

মেয়েকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে প্রণবেশ বলেন, 'আবার তো আমি দু'মাস পরেই আসছি। ভাল থেকো—' তারপর অনুরাধার কাছে গিয়ে বললেন, 'যাচ্ছি। কোনও দরকার হলে ফোন করো।'

অনুরাধা উত্তর দিলেন না।

উড়ানের সময় হয়ে গিয়েছিল। প্রণবেশ এবার ডোমেস্টিক উইং-এর বিশাল কাচের দরজা দিয়ে ভেতরেব এনক্লোজারে চলে যান। সামনের দিকে পা ফেলতে গিয়ে একবার ঘুরে দাঁড়ান। কাচের ওধারে রুমি তো কাঁদছিলই। তার পাশে দাঁড়ানো একটি নারীর করুণ, বিষণ্ন মুখচ্ছবি তাঁর বুকেব ভেতরটা তোলপাড় করে দিতে থাকে।